শ্রীঅবিনাশ সাহা

পরিবেশক

ভারতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

কবিপক্ষ ১৩৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রকাশক

আর, সাহা

প্রকাশ মহল

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী

গণেশ বসু

মুদ্রাকর

শ্রীসন্তোষ কুমার ধর

ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

পাকিস্তানের পরিবেশক

নওরোজ কিতাবিস্তান

৪৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

দাম ছ'টাকা

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। দিন দিন ভয়াল হয়ে উঠছে পদ্মা। এক পারে দাঁড়ালে আর-এক পার দেখা যায় না। যেন আকাশ গঙ্গাই স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে দিগন্তে নেমে আসছে।

দীনু অন্তরে কেঁপে ওঠে। মাঠ ভর্তি ধান পাট। গোটা বছরের মুখের গ্রাস ঐ শস্য ভাণ্ডার। বুকের রক্ত আর হাতের শেষ সম্বল পণ করে সমস্ত ঋতু চাষ আবাদ করেছে। মহাজনের কাছে ঋণও হয়েছে কিছু। চড়া সুদ। একমাত্র ভরসা ঐ ধান আর পাট। মা লক্ষ্মীর কৃপায় ফলন বেশ ভালই হয়েছে। সামনের আর দুটো মাস ওতরালেই ভর্তি হবে লক্ষ্মী-গোলা, হাঁড়ি—কলসী—জালা। লক্ষ্মী-গোলার ধানে পূজো হবে লক্ষ্মীদেবীর। আত্মীয়স্বজন আসবে। যাত্রাগান, কবিগানে মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়ি। শুরু হবে বছরের আনন্দ উৎসব। তারপর ধর্মমাস কার্তিক মাসে আবার অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, মণ মণ চালের মহোৎসব। নিমন্ত্রণ যাবে আশ-পাশের সমস্ত গাঁয়ে। দলে দলে আসবেন অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়ারা। প্রহরে প্রহরে গান করবেন, দু'বাহু তুলে নাচবেন, পাতজুড়ে পরিবেশিত হবে সুগন্ধি অন্নের মহাপ্রসাদ।···মোড়ল দীনু অন্যান্য বছরের মতো এবারও স্বপ্ন দেখে। বেশ একটু রং চড়িয়েই দেখে। অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপান্ন প্রহর নাম-যজ্ঞ হবে এবার। ওর ঠাকুরদার আমলে একবার হয়েছিল। দশ গাঁয়ের লোক এখনো তার সুখ্যাতি করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এবারও তাই হবে···

আষাঢ়ে পদ্মা আরো ফুলে ওঠে। নাগিনীর জিভের মতোই লক লক করছে অনন্ত জলরাশি। দিন রাত ফোঁস-ফোঁসানীর বিরাম নেই। বছর কয়েক ওপারের চরই ভাঙছিল। কিন্তু এবারের দৃষ্টি যেন কাশীপুরের দিকেই। জল যতো বাড়ছে চাপ চাপ জমি হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তীর থেকে। যেন হাঁ করে ব্যাঙ্ গিলছে নাগিনী।

নদীর উচ্ছলতায় ভাবনা বেড়ে যায় দীনুর। পদ্মার পারের চাষী মাত্রই জানে, রাক্ষুসীর ভাঙন কি সর্বনেশে। রাতারাতি গ্রামকে গ্রাম সাফ। ছোট-বেলায় একবার ভীষণ ফাঁড়া গেছে ওর। সেও ছিল আষাঢ় মাস। ঘুট্‌ঘুটে

অমাবস্যার অন্ধকার। পদ্মা ওদের বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে। ঘরে গরম বলে সকলেই ওরা নৌকোর ওপর শুয়েছে। স্রোতের তোড়ে মাদল বাজছে পদ্মার বুকে। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে যে যার মতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হয়তো সুখের স্বপ্নই দেখতে থাকে। হঠাৎ বিকট শব্দে দুপুর রাত্রে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মানুষ সব একসঙ্গে আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। গম্ গম্ শব্দ উঠছে মাটির ভেতর থেকে। ভূমিকম্পই যেন হচ্ছে পাতালে। ঘরদোর, গাছপালা, ঝন্ ঝন্ মড়্মড়্ শব্দে ভেঙে পড়ছে। মাটি ফেটে চৌচির। মাইল খানেক জুড়ে বিরাট এক চাপ তলিয়ে যাচ্ছে, রূপকথার গল্পই যেন। মর্তের সকল মানুষ একযোগে দল বেঁধে যেন পাতালে প্রবেশ করছে···

জীবনের মায়ায় সব ফেলে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। ভয়ে থর থর করে কাঁপতে থাকে ওরা নৌকোর ওপর। দীনুর বাবা বিপিন লাফ দিয়ে মাটিতে পড়তে যায়। দাদু রজনীনাথ পাশেই দাঁড়িয়েছিল, খপ্ করে চেপে ধরে জোয়ান ছেলের হাত। ওতো মাটি নয়, ফুটো কলসী—এক্ষুনি তলিয়ে যাবে। জমি-জিরাত, গরু বাছুর, তৈজস সব যাক। জীবনে বাঁচলে সব হবে আবার। তাই বলে জেনেশুনে ধনের সঙ্গে প্রাণ দেবে নাকি মানুষ! রজনীনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে নৌকোর কাছি খোলে। এক্ষুনি গিয়ে মাঝ নদীতে পৌঁছোনো চাই। নয়তো আবর্তের টানে নৌকো-সুদ্ধ গিলে ফেলবে রাক্ষুসী। বাপ-বেটায় তাড়াতাড়ি হালে চাড় দিয়ে এগুতে থাকে।

বিপিন স্বর্গে গিয়েছে। মহাজনের ঋণ ছাড়া উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি দীনুর। চাষীর বরাতে এ তো বিধির লিখন। তবু উদয়াস্ত খেটেই চলে দীনু। পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়। ঋণ শোধ হয়েও কিছুদিনের মধ্যেই আবার মা লক্ষ্মীর আসন পাকা হয়। চাষের জমি, টিনের ঘর, গরু, বাছুর—নিয়ে সোনার সংসার।···সেই সংসারে আবার ইদানীং ফাটল দেখা দিয়েছে। পদ্মার বুকে আবার সেই দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। রাক্ষুসী মার-মুখো হয়ে উঠছে দিন দিন। গেরুয়া রঙের জলের ওপর এবারও কালচে ছোপ পড়েছে। ঠিক সেই একই রকম তর্জন গর্জন। ধানের ক্ষেতে শীষ দেখা দিয়েছে। কচি সবুজ শীষ। টিপলে সাদা দুধ বেরোয়। মাস খানেক পরে পাটও ঘরে উঠবে। কিন্তু পদ্মা যে এরই ভেতর ফণা তুলে ধেয়ে আসছে।

মোড়ল দীনুর বাড়িতে গ্রামবাসীরা এসে জড়ো হয়। সকলে মিলে চাঁদা তুলে গঙ্গাদেবীর পুজো আরম্ভ করে। জোড়া পাঁঠা, কচি ডাব, দুধ, ঘি, চিনি যার যেমন

সাধ্য গলবস্ত্র হয়ে মানত করে ক্রুদ্ধ দেবতার উদ্দেশ্যে। পুরোহিতরা অহোরাত্র মা গঙ্গার স্তোত্র পাঠে তন্ময়। প্রতি সন্ধ্যায় ঘাটে ঘাটে দীপ জেলে আরতি শুরু করে পুরনারীরা। সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় মেঘ-ঘন আকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। মন্দিরে মস্‌জিদে চলে সমবেত প্রার্থনা। না, কিছুতেই যেন প্রসন্না নন বিরিঞ্চি তনয়া। ফণা তুলে তুলে দিন দিনই গর্জে উঠছে ভয়ংকরী।…

অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। সারাদিন ইলশেগুড়ি চলেছে। সন্ধ্যা থেকে পদ্মার বুক থম্‌থমে। গেরুয়া বাস ছেড়ে নীলাম্বরী পরে নাগিনী। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে নীলাঞ্চল। কাশীপুরের আবালবৃদ্ধ ভয়ে তটস্থ। সকলে মিলে বহুদূর পর্যন্ত ঘুরে ফিরে দেখতে থাকে, কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে কিনা। না, সে রকম কোথাও কিছু লক্ষ্য হয় না। তবু যথা সাধ্য সতর্ক থাকে সকলে। বাসন-কোসন যে-যেমন পারে সরিয়ে রাখে। যার নৌকো আছে সে নৌকোর ওপরেই ঘুমোয়। দুপুর রাত পর্যন্ত সকলে খোল বাজিয়ে কীর্তন করে। করিমের বাড়ি 'দয়াল চানের' আসরেও আবার কেউ কেউ জমায়েত হয়।…

আকাশে একটিও নক্ষত্র নেই। থম থম করছে চারদিকের অন্ধকার। অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে কোথাও কোথাও। রাত একটা, হঠাৎ গাছের চূড়া নড়ে ওঠে। শোঁ শোঁ সাঁই সাঁই শব্দে প্রবল বেগে শুরু হয় তুফান বৃষ্টি। ঘুমিয়ে ছিল মানুষ, অতর্কিতে লাফিয়ে ওঠে। শিশুরা মায়ের বুকে মুখ থুবড়ে চেঁচাতে থাকে। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, মানুষ একযোগে আর্তনাদে ফেটে পড়ে। কড়াৎ কড়াৎ—ঝন্‌ ঝন্‌ —কড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ শব্দে ঢেউ টিনের চালগুলো উল্কার মতো ছুটতে থাকে। ভয়ে হাত পা সিটিয়ে গেছে দীনুর। স্ত্রী কুসুম মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছে। ঘরে চাল নেই। সুচের মতোই এসে বিঁধছে বৃষ্টির ফলক। সহসা করিমের চীৎকার শোনা যায়, ভাইজান, সাবধান! পোলাপানগ বুকের মধ্যে চাইপা ধর। ত্যাও ছুটছে…

গলা পঞ্চমে চড়িয়ে দীনু উত্তর দেয়, আর রক্ষা নাই ভাইসাব। সব গেল, সব গেল…

ভয় নাই, আমরা আইলাম। ভয় নাই…স্ত্রী, পুত্রকন্যাসহ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে থাকে করিম। ওর বাড়ি ঘরদোর সব সাফ। প্রতিবেশী সকলের অবস্থাই তাই। সকলেই ছুটতে থাকে দীনুর বাড়ির দিকে। একমাত্র বৈরাগী

বাড়িই যা টিনকাঠ দিয়ে পাকাপাকিভাবে তৈরী। আর তো সব খড়ের চাল ঝাঁপের বেড়া। ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতোই উড়ে গেছে। আশ্রয়হীন মানুষ আশ্রয়ের আশায় দলে দলে ছুটতে থাকে। কিন্তু একি! খড়ের ঘরের চেয়ে যে টিনের ঘর আরো ভয়াল হয়ে উঠেছে। টিন ছুটছে না তো যেন এক-একটা বর্শা ফলকই ছুটে চলেছে। কোনগতিকে এক-আধটা উড়ে এসে গায়ে পড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে দু' আধখানা। এখন তাহলে যায় কোথায় ওরা? এত জলই বা আসছে কোত্থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এতো ওদেরই ডিঙ্গি। ঘাটে বাঁধা ছিল। তবে কি···

'বান ডাকচে, বান ডাকচে,' নদীর পারের ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার একটানা ভেসে আসতে থাকে।

সকলে মিলে একযোগে আর্তনাদ করে ওঠে। বুড়োদের মধ্যে একদল কাঁদতে কাঁদতে এসে করিমের পা চেপে ধরে, ফকির সাব, আমাগ বাঁচান। আপনার সিদ্ধাইডা একবার ছাড়েন। আমাগ বাঁচান···

করিম নিরুপায়। ভূত প্রেত খেদাবার মন্ত্র জানা থাকলেও উত্তাল পদ্মার সঙ্গে যুঝবার মতো ফুসমন্ত্র ওর জানা নেই। কিন্তু কে শুনছে আর সে-কথা। করিম দমে না। গুরুগম্ভীরভাবেই সকলকে সান্ত্বনা দেয়, ভয় নাই। দয়াল চানরে ডাক হগলে। দীন-দয়ালই রক্ষা করব।

হতবুদ্ধি মানুষ কিছুটা বল পায় করিমের সান্ত্বনায়। করিমের সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গিগুলোকে শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধতে থাকে। পা দিয়ে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। হাঁস, মুরগী, গরু, বাছুর, নারী, শিশু এক এক করে সকলকেই মাচার ওপর তুলতে থাকে। পাকা শালকাঠের খুঁটির ওপর বিরাট মাচা দীনুর। ভিটি থেকে পাঁচ ছ' হাত উঁচু। অসময়ে ধান, পাট, মুগ-মটর তোলা থাকে। বিপদে পড়ে মানুষ আজ সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। কোমরে গামছা বেঁধে দীনুও কাজে যোগ দেয়। মরবে তো নিশ্চয়ই তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা। মাথার ওপরের চাল নেই। তীরের মতোই এসে বিঁধছে বৃষ্টির ফলক। হাত, পা ভিজে জবজবে। মায়েরা পারে তো পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে রাখে বাচ্চা-কাচ্চাদের। কাতর কণ্ঠে ইষ্টদেবতাকে ডাকতে থাকে কেউ কেউ। জয় হরি, জয় মধুসূদন, খোদা, দীন দয়াল···

ঘণ্টা খানেক ধকল যাবার পর ঝড়ের বেগ কমে আসে। বৃষ্টি এখন এক রকম নেই বললেই হয়। সামান্য গুড়ি গুড়ি পড়ছে। কিন্তু কাশীপুরের মানুষ নিশ্চিন্ত

হতে পারে না। এখনো হাটু তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। করিমের নির্দেশেই আমগাছের উঁচু ডালে নতুন করে মাচা বাঁধা শুরু হয়। কেউ কেউ নিজ নিজ ঘর দোরের খোঁজেও বার হয়। বাচ্চা-কাচ্চাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেছে। আবার সকলে মায়ের স্তনে মুখ গুঁজে নির্ভয়ে চুষতে আরম্ভ করেছে। ডিঙ্গি গুলোও গাছের গুড়ির সঙ্গে ঠিকই বাঁধা আছে। অপূরণীয় ক্ষতি হলেও প্রাণে বোধ হয় সকলেই বেঁচে গেলো এ যাত্রা। নিশ্চিন্ত না হলেও কতকটা স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে গাঁয়ের মানুষ।....

মুখের কথা মুখেই থাকে। মাচা বেঁধে নেমে আসারও ফুরসত হয় না অনেকের। আবার তোড়ে আরম্ভ হয় ঝড় বৃষ্টি। শাখায় শাখায় ঠোকাঠুকি চলে। মূল থেকে খসে পড়ে বোধ হয় কোনটা। দেখতে দেখতে পদ্মা হুঙ্কার ছেড়ে এসে বাড়ির উঠোনে পড়ে। হাঁটু জল, কোমর জল, না না, গোটা মানুষই তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। ভিটে মাটি জলে টৈটুম্বুর। মাচার ওপরের জীব-জন্তু মানুষ আবার আর্তনাদ করে ওঠে। জোয়ান মানুষরা হাতের কাছে যাকে পায় ঠেলে তুলে দেয় গাছের ওপর। ছাগল, ভেড়া, গরু, বাছুরের দড়ি খুলে দিয়ে যে যেভাবে পারে গাছে এসে ওঠে। জল গাছের গুঁড়ি ছাপিয়ে মূল শাখা ছোঁয় ছোঁয়। বুকের ধুক-পুকানী বেড়ে যায় দীনুর। করিমকে বিড়বিড় করে কি যেন আওড়াতে দেখা যায়। কুসুম চোখ মেলে চাইতে পারে না। ঘন ঘন বাজ পড়ছে। ওপরের ডাল থেকে কে যেন ছিটকে পড়ে গেলো জলের ওপর। যে যার আপনজনের নাম ধরে চিৎকার করতে থাকে। কেউ সাড়া পায়, কেউ পায় না। আশঙ্কায় ডুকরে ওঠে কেউ কেউ। পাষাণী পদ্মা সমুদ্রের চেয়েও ভয়াল হয়ে উঠেছে।

ঝড় একটানা বয়ে চলেছে। খুব কাছেই একটা বাজ পড়ে। মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। সহসা চোখ মেলে চাইতেই আলোর ঝলসানীতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে দীনু, মত্থি গাঙ্গে ওটা কি ভাইসা যায় গ নিশার মা। ধান পাট বুজি আর একটাও ক্ষ্যাতে রইল না। ঐ দ্যাহ, ধবলী, আমাগ ধবলী ভ্যা ভ্যা করতে করতে আমাগ ছাইড়া চলল। পাঁচ সের দুধ দিত ধবলী। হায় হায়, কি খাইয়া পোলাপানে বাঁচব! তোমরা আমারে ছাইড়া ছাও—ছাইড়া ছাও—, আমিও ধবলীর লগে যাই, ছাইড়া ছাও...বুক চাপড়াতে চাপড়াতে জলের ওপর লাফিয়ে পড়তে যায় দীনু।

একা কুসুম, ছেলে সামলাবে না জোয়ান মরদকে। এক হাতে নিশিকে

বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আর-এক হাতে দীনুর কোমর জড়িয়ে ধরে! আকুল হয়ে ইষ্টদেবকে ডাকতে থাকে, জয় হরি, জয় ছিমদুসূদন, রক্ষা কর—রক্ষা কর আমাগ। সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দিমু ঠাকুর, রক্ষা কর···

কুসুমের পক্ষে একা আর সম্ভবপর হয় না দীনুকে ধরে রাখা। চেঁচামেচি শুনে করিম চোখ মেলে তাকায়। তাড়াতাড়ি পেছনের ডাল থেকে লাফিয়ে এসে খপ্ করে চেপে ধরে দীনুর হাত। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, কর কি বৈরাগীর পো! ক্ষেপলা নাকি? পোলাপানের দিগে চাও···

দীনু শান্ত হয়। করিম আবার চোখ বোজে।

সমস্ত রাত ধকল যাবার পর শ্রান্ত পদ্মা শান্ত হয়। সর্বনাশী এবার যেন স্নেহতুরা অভয়ার রূপ ধরে কুলকুল-নাদে বয়ে চলেছে। সন্তানের দুঃখে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে যেন। সূর্য কিরণে দেখা যায়, বাড়ি, ঘরদোর সব সাফ। ক্ষেতখামারের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। প্রাণনাশও হয়েছে অগণিত। দীনুর বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে। সমস্ত স্বপ্ন খানখান হয়ে ভেঙে যায়। আকুল হয়েই ডাকতে থাকে, কাঙালের ঠাকুর, বড় সাদ আচিল পরাণ ভইরা তোমারে ডাকুম, নামগান করুম। চরণে কি অপরাধ অইচে দেবতা যে সব কাইড়া নিলা। ···গাছের ডালে মাথা ঠুকে ঠুকে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে। কুসুম স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা খুঁজে পায় না।··

বন্যার জল তীর বেগে নেমে চলেছে। ভেসে চলেছে অগুনতি মরা জীব-জন্তু গাছপালা। আজ পাঁচদিন পর আবার পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠেছে আকাশে। রাতভোর প্রাণপণ যুঝে অধিকাংশ মানুষই জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু এখন খিদের জ্বালাতেই সকলকে মরতে হবে। পেটে তো হুতাশনই জ্বলছে। ঘুম থেকে উঠে কারো বরাদ্দ ছিল একবাটি পান্তা, কারো বা এক কাঠা গুড় মুড়ি। আজ ভাণ্ডার-সুদ্ধ অবলুপ্ত। ভিখিরী, অতিথি এসে যে বাড়ি থেকে কখনো ফেরেনি রাতারাতি সে বাড়ির মালিকও ফকির বনে গেলো। রাক্ষুসী পদ্মা সব গিলে খেয়েছে। অশ্বিনী এরই মধ্যে 'মুড়ি দ্যাও, মুড়ি দ্যাও' বলে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। নিশি কুসুমের কাঁধের ওপরেই ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে। ধবলী নেই যে গরম গরম দুধ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। বেচারা কুসুমের শরীরও আর বইছে না। এখনো মানুষ তলিয়ে যাবে জল উঠোনে। গাছ থেকে নেমেও কোন ফায়দা নেই।

ছোট ডিঙিখানা শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে। হয়তো রক্ষা হয়ে থাকবে। বিপদে একমাত্র ভরসা। দীনু দড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করে। কুসুম সঙ্গে সঙ্গে আবার হাত চেপে ধরে স্বামীর। বাধা পেয়ে দীনুও দমে যায়। এখনো ভীষণ কাটাল। নামতে গেলে হয়তো ভাসিয়েই নিয়ে যাবে। তাছাড়া রক্ষা যদি হয়েও থাকে তবু এত জলের ভেতর থেকে কখনো একা একা টেনে তোলা সম্ভবপর নয়। ···দীনুর ভাবনা বেড়ে যায়, লক্ষ্মী চরার মাঠ উজাড়। পাঁচশ টাকা ঋণ মহাজন মধু পালের কাছে। হাতে একটা কানা কড়িও নেই··· •

ভিটে মাটি ছেড়ে যেতে বুকে শেল বেঁধে দীনু করিমের। কিন্তু তবু না গিয়ে উপায় নেই। সমস্ত ক্ষেতময় পড়েছে কচকচে বালি। মধু পালের কাছে উভয়ে গিয়েছিল। যদি নতুন করে কিছু কর্জ পায় তা হলে চেষ্টা করে দেখবে আবার বালির ওপর সোনা ফলানো যায় কি না।···কিন্তু মধু পাল রাজি হয় নি। আগের টাকার জন্যই সে নিজের বুক চাপড়িয়েছে, মোড়লের পো, তোমরা তো মরলাই, আমারেও মাইরা গেলা। আবার টেকা দিমু কোঁহান থনে।

দীনু হাত পা জড়িয়ে ধরে। করিম আল্লার কসম খায়। কিন্তু মধুর এক কথা, "আগের টেকা ছাও, পরে কথা কও।"

কথা আর নতুন করে বলার উপায় নেই। চোখের জল মুছতে মুছতেই ফিরে আসে দুই মিতায়। ঘরদোর নেই। বন্যার সময় মাচার ওপর যা ওঠাতে পেরেছিল তাই-ই একমাত্র সম্বল। ঠাকুরের দয়ায় যে উভয়ের ডিঙি দু'খানা রক্ষা পেয়েছে সেই ঢের ভাগ্য। খেজুর পাতার পাটিতে ছৈ দিয়ে ডিঙির ওপরেই আবার নতুন করে ঘর বাঁধে দু'জনে। ভোর লগ্নে ছেড়ে যাবে কাশীপুর।

ছেলে কোলে করে দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছিল ফতিমা। মালপত্র বোঝাই শেষ। এখন ছেলেপুলে নিয়ে ফতিমা আর কুসুম ডিঙিতে উঠলেই ছেড়ে যাওয়া যায়। ফতিমার উদ্দেশ্যে করিম তাড়া দেয়. কৈগ রহিমার মা, বলি পোলা কোলে কইরা খাড়ইয়া খাড়ইয়া খালি কানবা, না নায়ে উঠবা ?

তাড়া খেয়েও কোন সাড়া দিতে পারে না ফতিমা। বলে কি রহিমের বাপ ! ছেলেপুলে নিয়ে ভরা গাং পাড়ি দেবে ! ঘরদোর তো সবই গেছে, এবার পেটের ক'টাকেও জলে দিতে চায় নাকি !···ডাক ছেড়েই কাঁদতে ইচ্ছা করে ফতিমার।

পেছনের গলুইতে বসে হুঁকো টানছিল করিম। ফতিমার কান্না দেখে নিজের বুকের ভেতরটাও আছড়াতে থাকে। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটে

মাটি। দু'দিন আগেও সব ছিল। ভিটে, ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গরু-বাছুর নিয়ে সুখের সংসার। আজ পথের ভিখিরী। নেই বলতে কিছু নেই। কোমর থেকে গামছাখানা খুলে দু' চোখ পুছে ফেলে।

ফতিমা দাঁড়িয়েছিল, এবার বসে পড়ে বিলাপ শুরু করে। কোথায় যাবে ও কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে! ঘর-দোরই যখন রাখলো না রাক্ষুসী তখন তো দু'খানা ডিঙ্গি এক থাবায় গিলে খাবে।...

করিম নিজেকে একটু সামলিয়ে নিয়ে ধরা গলায় সান্ত্বনা দেয়, পোলাপানের সামনে অমুন কইরা কাইন্দ না। আল্লার দোয়া যে তল গচ্চায় পড় নাই। হ্যাবারের ভাঙ্গনের কতা মোনে নাই তোমার। রাতারাতি গেরামকে গেরাম তলাইয়া লইয়া গেল। তল দিয়া কাইটা দেয় কেউ ট্যারই পায় না। কান্না থুইয়া গলৈতে জল দিয়া নায়ে ওঠ। পরাণে যহন বাচ্চ, তহন আল্লার দোয়া অইলে সব আবার পাইবা।...

ফতিমার তবু কোন সাড়া শব্দ নেই। দু'চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেই থাকে।

নিরুপায় করিম ফতিমাকে ছেড়ে কুসুমকে তাড়া দেয়, কৈগ মা লক্ষ্মী, তুমিও অবুজ অইলা নাকি। নায়ে ওঠ। বেলাবেলি পদ্মা পারি দেওয়ন চাই। বিকালে ঝড় তুফানের কতা কওয়ন যায় না।

কুসুম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডিঙ্গির কাছে আসে। কোলে নিশি, পায়ে পায়ে আঁচল জড়িয়ে অশ্বিনী। কান্নায় দু'চোখ ফুলে উঠেছে। অথৈ জলে ভেসেই যেতে হবে...

কুসুমের দেখাদেখি ফতিমাও আঁচলে চোখ মুছে রহিম, মৈনুদ্দিন আর মেহেরকে সঙ্গে করে ডিঙ্গির কাছে আসে। দুই পরিবারের দুই গিন্নী গলুইতে জল দিয়ে ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে ডিঙ্গির ওপরে ওঠে।

দীনু করিম হালে চাড় দিয়ে ডিঙ্গি ভাসিয়ে দেয়। জন্মের মতো ছেড়ে যাচ্ছে ভিটেমাটি। বৈঠায় খোঁচ দিতে দিতে বার বার ফিরে তাকায় উভয়ে সজল চোখে। দেখতে দেখতে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। এক এক করে মিলিয়ে যেতে থাকে চারিদিকের ঘর দোর গাছপালা। ঐ তো এখনো দেখা যাচ্ছে বাড়ীর বড় আম গাছটা। ধবলী বাঁধা থাকতো ওখানে—শক্তি প্রদায়িনী। ঐ গাছটাই তো জীবন রক্ষা করেছে, ঐ চর আর ঐ ধূলিকণার সঙ্গে রয়েছে সুখ দুঃখ বিজড়িত জীবনস্মৃতি। আর কি কখনো ফিরে আসতে পারবে ওরা ওখানে, আর কি কখনো...ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে দীনু।

পাশাপাশি করিম হাল ধরে চলেছে। দীনুকে অন্যমনস্ক দেখে হুঁশিয়ার করে দেয়, ভাইজান, শক্ত কইরা হাইল ধর। সামনা দিয়া কম্পানীর জাহাজ যাইবার নৈচে, ঢেউ আসব।…

করিমের ডাকে দীনু আচমকা উত্তর দেয়, আমাগ একবারে মরণ নাই ভাইসাব। ভগবান রুষ্ট অইচেন। তিলে তিলে মারব। এত বড় ঢেউয়েই যহন তলাই নাই তহন আর জাহাজের ঢেউয়ে কি করব।…

করিম পাল্টা ধমক দেয়, তুমি পোলাপানের সামনে অমুন কথা কইও না। অরা মোনে কষ্ট পাইব। আল্লার দোয়া অইলে সব ফিরা পামু। শক্ত কইরা হাইল ধর।

দীনু আর কথা বাড়ায় না। সংযত হয়েই হাল ধরে। ঢেউয়ে ডিঙ্গি দুলতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরে ফতিমা কুসুমের চেঁচামেচি শোনা যায়।

করিম বৈঠায় খোঁচ দিয়ে সাহস দেয়, ভয় নাই। পোলাপানগ বুকের মধ্যে চাইপা ধর।

ঢেউ একটু একটু করে মিলিয়ে যেতে থাকে। ছৈয়ের ভেতরের চেঁচামেচিও বন্ধ হয়ে যায়। স্রোতের টানে দৌড়ে চলে দুজনের ছোট্ট দু'খানি ডিঙ্গি।

॥ ২ ॥

বর্ষার ভরা পদ্মা। অনন্ত জলরাশি থৈ থৈ করছে দিগন্তে। এক পারে দাঁড়ালে অন্য পার নজরে পড়ে না। কালনাগিনী যেন ফণা তুলেই আছে। বাগে পেলেই ছোবল মারবে। কিন্তু উপায় কি? সাপের মাথার মণি আহরণ করতে গেলে ছোবলের ভয় করলে চলে না। দীনু হুঁকোটায় সজোরে একটা টান দিয়ে গলুইয়ের পাশে নামিয়ে রাখে। শক্ত করে দু'হাতে হাল চেপে ধরে করিমের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, ভাইসাব, জমিন না অইলে বাঁচন যাইব না। আর ইপারে আমাগ কেউ জমিন দিবও না। চল, পারি দিয়া ওপারে যাই।

হ হ, ঠিক কইচ ভাইজান। তবে পদ্মার পারে আর নয়। সব্বনাশী আমাগ আর থাকবার দিবার চায় না। খেদাইয়া দিবারই চায়। চল, যমুনার পারে যাই। হুনচি ওহানে ইরকম ভাঙন নাই। মিলবারও পারে ছটাক মটাক, করিমও হুঁকো টানতে টানতে মনের আবেগে সায় দেয়।

যমুনায় পদ্মার মতো ভাঙন না থাকলেও স্রোতের বেগ ভয়ংকর। একবার ভরা বর্ষায় আক বোঝাই ডিঙ্গি নিয়ে জনকয়েক উজাতে চেষ্টা করছিল ওরা। কিন্তু তিন দিন তিন রাত্রি বইঠা ঠেঙ্গিয়েও সফল হতে পারেনি। আজ উভয়েই একক মাঝি। ডিঙ্গি দু'খানাও অপেক্ষাকৃত ছোট। দীনু দমে যায়। করিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাতে সাহাস পায় না।

দীনুকে নিরুত্তর দেখে করিম পুনরায় জের টানে, কি, ভয় পাইলা নাকি মোড়লের পো? আরে আমাগ মতন পোড়া কপাইলা মাইনষের মরণ নাই। বাদাম খাটাইয়া পারি ছ্যাও আল্লা বইলা।

হ হ, ঠিকই কইচ ফকিরের পো। নদীর কিনারের জমিন না অইলে চাষ কইরা সুখ নাই। পদ্মার পারে আর জমিন পাওয়ন যাইব না। চল, যমুনার পারেই যাই। কৈ গ, হাইলডা একটু ধরবার পারবা নাকি? আমি বাদামডা খাটাইয়া লই, কুসুমকে তাড়া দেয় দীনু।

ছৈয়ের ভেতর কাৎ হয়ে শুয়ে নিশিকে মাই দিচ্ছিল কুসুম। দীনুর সম্বোধনে চমকে ওঠে, তুমি কও কি! এই ঝড় তুফানের দিনে পোলাপান লইয়া ভরা গাং পারি দিবার চাও! তোমার কি মাথা খারাপ হৈচে?

হ হ, আমার মাথাই খারাপ হৈচে। না খাইয়া মরুম নাকি তোমার কথায়?

পাশাপাশিই চলেছে করিমের ডিঙ্গি। কুসুমের কাতর কণ্ঠে চমক ভাঙে। ছৈয়ের ভেতরে রহিমের মা-ও বিস্ময় প্রকাশ করছে তার দিকে চেয়ে। মেজাজটা একটু খাদে নামিয়েই উত্তর করে করিম, ভাইজান, মা লক্ষ্মী ভাল কতাই কৈচে। কাম নাই ভরা গাং পারি দিয়া। তার থনে চল বাঁক ঘুইরা ধলেশ্বরীর মধ্যি দিয়া যাই। ট্যাঙর ছ্যাশের মানুষ গাঙের কিনারের জমিন পছন্দ করে না। গাঙের কিনারের জমিন কি কইরা চাষ করার লাগে তাও তারা জানে না। আমাগ সুবিদা অইবার পারে।

কথাটা মনে ধরে দীনুর। সোৎসাহেই সায় দেয়, হ, ঠিকই কৈচ। তবে তাই চল। দেহি, কি আছে বরাতে।...

ধলেশ্বরীর তীর ঘেঁষেই চলেছে দু'খানি ডিঙ্গি। পদ্মা যমুনা অপেক্ষা কন্যা ধলেশ্বরী আকারে ছোট হলেও বিক্রম কম নয়। সেই একই রকম তর্জন গর্জন ফোঁস-ফোঁসানী। পূর্ববঙ্গের নদীগুলো সবই যেন এক একটা কেউটে সাপের বাচ্চা। ফণা তুলেই আছে—বাগে পেলেই ছোবল মারবে।

দীনু করিম শক্ত হাতে হাল ধরে। কালনাগিনীর ছোবল এড়িয়ে চলবার মতো কুসুমন্ত্র জানা আছে ওদের। সময় বুঝে পথ চলে। সময় বুঝে খালের মধ্যে লগি পুঁতে বিশ্রাম নেয়।

দেশ হতে দেশান্তরে ভেসে চলেছে ডিঙ্গি। এক হাটে তাল, কলা, শসা, আক কিনে আর-এক হাটে বেচে দেয়। সামান্য দু'দশ পয়সা মুনাফা। তা দিয়েই চলে ঘর সংসার—হাট বাজার। শুধু চারটে চাল আর একটুখানি নুন। পর্যাপ্ত মাছ তো মুফতুই পাওয়া যায়। অবসর সময়ে একটা ছিপ ফেলে ধরে নিলেই হলো। টাটকা জলজ্যান্ত মাছ। খোলা জলে প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস। দীর্ঘ এই মাসখানেকের ভ্রমণে শরীর ওদের কারো খারাপ হয় না। জলো হাওয়ায় বরং সকলেই বেশ মুটিয়েছে। এখন চাই জমি। জমি হলেই মনের শান্তি ফিরে আসবে। আবার চাষ আবাদ হবে—ঘরবাড়ি।

আষাঢ় থেকে আশ্বিন এমনিই কাটে। কার্তিকে জলে টান ধরে। স্রোতের বেগ বেশ মন্থর। এখন এগুতে হলে শক্ত হাতে বইঠা বেয়েই এগুতে হবে। রীতিমতো আয়াস সাধ্য। কিন্তু মিছিমিছি পরিশ্রম করে লাভ কি? নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যস্থান জানা নেই। সামনেই তে'মোনা। ব্রহ্মপুত্র-নন্দন বংশী এসে মিলেছে ধলেশ্বরীর সঙ্গে। বংশীর পূর্বপারে গঞ্জ সাভার—বিখ্যাত জনপদ। হাজার হাজার মণ মুগ, কলাই, ধান, পাট কেনাবেচা হয় সাভারের হাটে। স্থায়ী দোকানপাটেও গঞ্জ সাভার জমজমাট। প্রতি শনি মঙ্গলবারে হাট বসে। দশ বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। ফল পাকুড় তরি তরকারী থেকে আরম্ভ করে অগুনতি জিনিষের সমাবেশ। দূর দুরান্ত থেকে হাটুরেরা আসে। রুজি রোজগারে প্রতিপালিত হয় হাজার কয়েক সংসার। দীনু করিম লগি পুঁতে তিন চার হাট বেচাকেনায় মন দেয়। এর আগ পর্যন্ত যা রুজি রোজগার হয়েছে তাতে কোনরকমে দিন গুজরান সম্ভবপর হয়েছে। হাত থেকেছে সদাসর্বদা শূন্য। কিন্তু সাভারের হাটে বেচাকেনা করে সংসার চালিয়েও কিছু কিছু হাতে থাকছে। অনেক বড় ঝাপটার পর ঈশ্বর বোধ হয় এতদিনে ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছেন ওদের। সাভার ছেড়ে ওরা আর এক পা'ও নড়বে না। এখানেই মাটির সন্ধান করবে। প্রয়োজন হলে চিরজীবন অপেক্ষা করবে।...

সাভারের ওপারে চরফুট নগর সবে জাগতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

সঙ্গমস্থল থেকে বদ্বীপের মতো উঠে চলেছে বিরাট চর উত্তর দক্ষিণে। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে দুই পড়শী ঐ চরকে কেন্দ্র করে। চর নয়তো যেন মা লক্ষ্মীর আসনই ধীরে ধীরে জাগছে। মনের স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পরিগ্রহ করে। মা লক্ষ্মীর আসন স্থায়ী করে পাতার এই উপযুক্ত মাটি। এই মাটিতেই ফলবে ধান পাট সোনালী শস্য। কিন্তু কে দেবে এই চরের নিশানা? কার কাছে গেলে পাবে অকূলেতে কূল? মাটি—মাটি—মাটি, না হলে প্রাণের জ্বালা জুড়োবে না। মাটি না হলে ছেলেপুলেরা বাঁচবে না। মাটি না হলে ঘর বাঁধা চলবে না। জীবনে মরণে সর্বস্তরে চাই মাটির মায়ের কোল,… দীনু করিম কাজের শেষে সকাল সন্ধ্যা হুঁকো খায় আর বসে বসে ভাবে।

॥ ৩ ॥

চরফুটনগর একটু একটু করে জাগছে। দীনু করিমের মনে বইছে খুশীর হাওয়া। সাভায়ের হাটে খোঁজ পেয়েছে, কাশিমপুরের বড় তরফের দখলে ঐ চর। কেউ ওখানে চাষ আবাদ করে না। বিলি ব্যবস্থাও এ পর্যন্ত কেউ নেয়নি। নায়েব রাখাল গোসাঁইয়ের ওপরেই সকল ভার ন্যস্ত। বেশ নাদুস নুদুস চেহারা গোসাঁইজীর, খানদানী মানুষ। কিছু দিলেথুলে আশা আছে। দীনু করিম দুরাশার স্বপ্ন দেখে।

চর অনেকটা জেগেছে। কচকচে বালুর ওপর কোথাও কোথাও সামান্য সামান্য পলির আস্তরণ। একদিন দুজনে চরের ওপর গিয়ে মাটি হাত দিয়ে পরখ করে দেখে। এখনো চাষ চলবে না। তবে এ দেশের মানুষ হয়তো জানেই না কি করে এই ঊষর ভূমিকে শস্য শ্যামল উর্বর ভূমিতে পরিণত করা যায়। দু'জনে এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায়। এখনো সবটা চর জাগেনি। তবু কোথা থেকে কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে দুয়ে মিলে মনে মনে জরিফ করে। ঈশ্বরের দয়ায় যদি বিলি ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে একবারের বর্ষাতেই পলি ধরা যাবে। ধান পাট না হোক রবিশস্য ফলানো কেউ আটকাতে পারবে না। দু'জনে দুমুঠো মাটি হাতে করে ডিঙ্গিতে ফিরে আসে। হুঁকো খায়—সল্লা করে। তারপর হাটের রোজগার থেকে যা বাঁচাতে পেরেছে তা নিয়ে গুনতে বসে। গোসাঁইজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা না করে শুধু হাতে কাছারীতে গিয়ে কোন লাভ নেই। দুটো বাঁশের চোঙের

মধ্যে গচ্ছিত দুজনের ধনভাণ্ডার। মাত্র ক'দিনের উপার্জন। শুনলে আর কতই বা হবে? পয়সা, সিকি, আনি, দু'আনিতে মিলিয়ে—মাত্র টাকা পাঁচেক হয়। উঁহু, এতে গোসাঁইজীর মন উঠবে না। দোকানে বসে দই খেতে খেতে কান্দনী ঘোষের নিকট সব খোঁজ পেয়েছে। গোসাঁইজীর পেটটা একটু ডাগরই। তা ছাড়া আছে এদিক সেদিকের খরচা।···

বিরাট চত্বর জুড়ে বাংলো ধরনের পাকা একতলা কাছারি বাড়ি। পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিমে বংশীর তীর—ঘাটলা বাঁধানো। বর্ষায় কানায় কানায় ফুলে ওঠে বংশী। দু'তিন বছর অন্তর এই সময়েই খোদ মালিকের "গ্রীনবোট" ঘাটলায় এসে লাগে। করিতকর্মা রাখালের তৎপরতা বেড়ে যায়। তোষামোদে মুখর হয়ে ওঠে। রঙীন সুধা পান করে মালিক অষ্টপ্রহর বিভোর হয়েই আছেন। প্রায়শঃই কাছারীতে নামা প্রয়োজন বোধ করেন না। 'গ্রীনবোটে' বসেই এক আধবার আঁখি মেলে হিসেবের খাতায় নজর দেন। চুলচেরা হিসেব কড়া ক্রান্তিতে মিল। পাইক পেয়দা পাঠিয়ে কিছু কিছু গরীব প্রজা আর চাটুকারদের ডেকে আনে রাখাল।· প্রয়োজন বোধে প্রণামী আর নজরানার স্থূল অংশটা নিজের টেঁক থেকেই চাটুকারদের হাতে গুঁজে দেয়। নগদ লাভে ডগমগ হয়ে ওঠেন প্রভুপাদ। মনে মনে রাখালের তারিফ করেন।···

ঘাটলা দিয়ে উঠেই দু'দিক জুড়ে ফুল বাগিচা। উত্তর দিকের·দেয়াল ঘেঁষে আমলা মুহুরীদের থাকবার ঘর। দক্ষিণে বিরাট ফটক। স্থলপথে কাছারিতে প্রবেশ করার দরজা। পশ্চিমের ঘাটলার ওপরও একটি ফট্‌ক আছে। উভয় ফটকেই সশস্ত্র প্রহরী অষ্টপ্রহর মোতায়েন। কাছারি নয়তো যেন একটি প্রমোদ উদ্যান। কেয়ারিতে কেরারিতে মরশুমী ফুলের বাহার নিয়তই পথিকজনের চোখ ধাঁধায়।

মঙ্গলবারের হাটবার। বিকেল প্রায় চারটে। দীনু করিম ভাবে, সোজাসুজি কাছারির ঘাটলায় ডিঙ্গিখানা বেঁধে গোসাঁইজীর সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। কানাঘুষোয় শুনেছে, ঘাটলায় নৌকো বাঁধা সাধারণের জন্য নিষেধ। প্রথম যাত্রাই কি গোসাঁইজীর বিষ নজরে পড়বে? ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদুতের মতো শিখ প্রহরী। কাজনেই বাবা! হালে চাড় দিয়ে ঘাটলা ছাড়িয়েই একপাশে গিয়ে ডিঙ্গি বাঁধে। পরিষ্কার করে হাত পায়ের কাদা মাটি ধুয়ে দক্ষিণ ফটকে এসে দাঁড়ায় উভয়ে। সেখানেও

প্রহরী। কিন্তু আজ আর ফিরে গেলে চলবে না। চর অনেকটা জেগেছে। হয়তো এর মধ্যেই আবার কেউ এসে বাগড়া দেবে। এ কদিন সংসার খরচা একরকম বন্ধ রেখেই গোটা পঞ্চাশ টাকা যোগাড় হয়েছে। ফরমাস তো অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। ছেলে বউয়ের কাপড় গামছা ছিঁড়ে কুটি কুটি। নিজেদের পরনের মধ্যেও চলেছে তালির পর তালি। সব কিনলে কাটলে টাকা কটা আর এমন কি? হয়তো কুলোবেই না। না না, সবার আগে চাই জমি। জমির মধ্যেই রয়েছে বাঁচার উৎস।···খানিক ইতস্ততঃ করে পাঞ্জাবী প্রহরীর শরণাপন্ন হয় দুজনে। মুসা সিং মুখে কোন জবাব না দিয়ে সোজা দেখিয়ে দেয় কাছারি ঘর। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় উভয়ে ভেতরের দিকে।

নাকের ডগায় নিকেলের পুরু চশমাটা নামিয়ে দিয়ে গদীর ওপর বসে হিসেবের খাতা দেখছিল রাখাল। তক্তপোষের ওপর ফরাস বিছানো গদী। তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে আলমারীর ওপর থরে থরে সাজানো রাশিকৃত খেরুয়া মোড়া হিসেবের খাতা। ওপর দেয়ালে রামদা, হরিণ মুণ্ডু, ঢাল, তলোয়ার, বাঘছাল। একটা বড় তৈলচিত্র পূব দেয়ালের মধ্যভাগে। শিকারীর পোষাকে সুসজ্জিত বলিষ্ঠ দেহ। মোম দিয়ে চাড়ানো গোঁফ। মুণ্ডু সমেত বাঘছালে মোড়া একটা পা-দানীতে ভর করে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছেন বর্তমান জমিদার কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। হাতের বন্দুক উল্টো করে মাটির সঙ্গে ঠেকানো। করিম, দীনু থতমত খেয়ে যায়। মহাজনের গদীতে গিয়ে টাকার জন্য ধর্না দেওয়া ওদের অভ্যাস আছে। মহাজনের সামনে চটের ওপর বসে কল্কের পর কল্কে তামাক সেজেও খেয়েছে। সময় বিশেষে তার তর্জনগর্জনও দেখেছে। কিন্তু জমিদারের কাছারি কি বস্তু জীবনে কখনো দেখেনি। খাজনা কড়ি তসিলদার নিজে বাড়ির ওপর এসে নিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া জমি। কোনরকম ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। জীবনে এই প্রথম কাছারিতে পদক্ষেপ। থ বনে যায় করিম দীনু। ভেবে পায় না, কি করে মনের কথা খুলে বলবে। রাখাল যেন ডুবে আছে হিসাবের খাতায়। দেখেও দেখছে না। কিন্তু আজ যে কোন রকমেই ফিরে যাওয়া চলবে না। চর প্রায় সবটাই জেগে উঠেছে। যে কোন মুহূর্তে হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। নয়তো পাকা ধানেই বা বাজ পড়বে কেন? দীনু সাহসে নির্ভর করেই সম্বোধন করে, দণ্ডবৎ হই কত্তা।

রাখাল কপালের ওপর চশমাটা তুলে আড়চোখে প্রশ্ন করে, কি চাই ?

আইজ্ঞা, আপনাদের ঐ চরটুকুনের লাইগা আইচিলাম, হাত কচলাতে কচলাতে উত্তর করে দীনু।

কি নাম ?

আইজ্ঞা আমার নাম দীনু বৈরাগী। আর উনি মিতা করিম ফকির।

নিবাস ?

আগে ফরিদপুর জিলার কাশীপুরে আচিল। এহন···দীনুর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে।

এখন কোথায় ?

এহন জলের উপুর ভাসচি কত্তা! রাইক্ষসী পদ্মা আমাগ সব গিলা খাইচে। আপনার ছিচরণে তাই একটু আশ্রয় চাই।

রাখাল সহসা হদিস করতে পারে না কোন্ চরের কথা বলছে ওরা। ধলেশ্বরীর ওপারে প্রতি বছর শীতকালে যে চর জাগে ভুলেও তো এ পর্যন্ত কেউ কোনদিন তার খোঁজ করতে আসেনি। প্রজাবিলি তো দূরের কথা সাময়িক ভাবেও কেউ কোনদিন ইজারার কথা বলেনি। শুধুই তো কচকচে বালির ঢিপি। বোশেখ থেকেই আবার তলাতে থাকে। বর্ষায় একেবারেই তলিয়ে যায়। মূর্খেরা কি ঐ বালির চরেই ঘর বাঁধবার ফন্দী আঁটছে!···

রাখালকে ইতস্ততঃ করতে দেখে করিম মুখ খোলে, দয়া কইরা দেন কত্তা আমাগ ঐ চরটুকুন। আল্লা আপনার মোঙ্গল করব।

রাখাল আর এক নজরে উভয়ের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝে নেয়, আনাড়ী দুটো ঐ শূন্য চরের জন্যই ধর্না দিচ্ছে। তাই দাঁও বুঝেই কোপ মারে, ও চরের জন্যে তো অনেকেই আসছে হে। ঠিক মতো নজরানা দিতে পারবে কি ? অনেক দাম ঐ চরের।

আমরা গরীব মানুষ। নজরানা কুথায় পামু হুজুর ? দয়া কইরা দেন একটু আশ্রয়। আল্লায় ভাল করব আপনার,···পুনরায় অনুরোধ করে করিম।

খালি হাতে জমিদারের দয়া হয় না বাপু। মালকড়ি যদি কিছু এনে থাক দয়া করে বা'র করো।

আপনাগ ছিচরণে নিবেদন করবার মতন ধন দৌলত কি আমাগ মতন কাঙালের ঘরে আচে কত্তা ? তবে এই যৎকিঞ্চিৎ পেন্নামী আনচি। দয়া কইরা কলা কয়ডা সেবায় লাগাবেন দেবতা। দীনু গামছায় জড়ানো বেশ

সুপক ও পুষ্ট একছড়া মর্তমান কলা গদীর ওপর রেখে টাকার থলির জন্য কোমর হাতড়াতে থাকে।

করিমও ঠিক সেই একই ভাবে গণ্ডা পাঁচেক মুরগীর আণ্ডা গামছার বাঁধন খুলে গদীর ওপর রাখতে যায়। দৃষ্টি পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে রাখাল হুঙ্কার ছাড়ে, আরে কর কি—কর কি! নীচে রাখ নীচে রাখ! রাধা কৃষ্ণ—রাধা কৃষ্ণ—হরি হে…

করিম থতমত খেয়ে ডিমগুলো নীচে নামিয়ে রেখেই দীনুর মতো টাকার থলি খুলতে থাকে। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে। ভয়ে আর একটি কথাও বলতে পারে না। মুখ কাঁচুমাচু করেই টাকার থলে হাতে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাখাল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ভৃত্য হরির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে, হরে, এই হরে—?

হরি হয়তো নিকটেই কোথাও ওতপেতে ছিল। ডাক কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে।

রাখাল পুনরায় দাঁত খিঁচোয়,এই যে নবাব পুত্তুর। এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

আইজ্ঞা—মাথা চুলকাতে থাকে হরি।

আর 'আইজ্ঞাতে' কাজ নেই। চট করে এক কল্কে তামাক দিয়ে ডিমগুলো ভেতরে নিয়ে যা। দু'বেলা গিলবার বেশ ভাল সুযোগই জুটলো।

হরি তাড়াতাড়ি ডিমগুলো আঁচলে জড়িয়ে বেরিয়ে যায়। রাখাল দীনুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, প্রথম কিস্তিতেই যে জমিদারকে কলা দেখালে মোড়লের পো।

কি যে কন কত্তা!—ঈষৎ হেসে উত্তর করে দীনু।

করিমও দীনুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বোকার মতো খানিক হাসতে থাকে।

রাখাল সুযোগ বুঝে পুনরায় প্যাঁচ কষে, ও কলা মুলোয় হবে না হে। রূপচাঁদ কত এনেছ চট করে গুণে ফেলো।

দীনু করিম সোৎসাহে থলির মুখ খুলে মাটির ওপর বসে গুনতে থাকে। সিকি, আনি, দু'আনিতে মিলিয়ে নগদ পঞ্চাশ টাকা গদীর ওপর রাখে দু'জনে।

রাখাল যেন তেমন খুশী নয়। তাচ্ছিল্য ভরেই কি যেন বলতে যাচ্ছিল, উভয়ে একযোগে উঠে এসে পা জড়িয়ে ধরে: কত্তা, আর একটা কানাকড়িও নাই আমাগ। পোলাপান লইয়া জলের উপুর ভাসচি। দেন একটু আশ্রয়।

তোমরা দেখছি আমাকে ঠেকাতে চাও! বিঘা প্রতি যে কুড়ি টাকা আদায়ের রীতি রয়েছে মালিকের।

আপনি কাঙালের মা বাপ। আমাগ মুখের দিকে চাইয়া দয়া করেন,—আরো শক্ত করে পা চেপে ধরে দীনু।

আঃ, কি মুশকিল, পা ছাড়ো। কি বল হে বিকাশ, দেওয়া যায় নাকি?

মুহুরী বিকাশ দত্ত—পঞ্চাশউর্ধ্ব বয়স। পাশে বসেই খাতা লিখছিল। সেতারের ঘাটের মতো একই সুরে বাঁধা। কৃত্রিম দরদ ঢেলেই সম্মতি জানায়, কি আর করবেন? এরা তো দেখছি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত মালিকের কাছে আমাদেরই গালমন্দ শুনতে হবে।

দেখ হে বাপুরা, নিমক-হারামী করো না। যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাকে না হয় কলাই দেখালে। কিন্তু সামনের হাটে এদের অন্ততঃ কিছু দিয়ে যেয়ো—নয়তো ধর্মের কাছে ঠেকা থাকবে, বিকাশ. আর হরির উদ্দেশ্যে ইঙ্গিত করে রাখল।

কত্তা, আর আমাগ মাইরেন না। ঘরে একটা কানাকড়িও নাই। আল্লায় দিন দিলে ছোট কত্তার জন্য যা পারি দিয়া যামু, কথা দিলাম। এহন ছ্যান আমাগ একটা ব্যবস্থা কইরা, করিম পুনরায় কাকুতি জানায়।

বিকাশ তুমিও যখন বলছ তখন দাও দু'জনকে দু'খানা দাখিলা লিখে।

রাখালের সম্মতিতে দীনু করিম কিছুটা আশ্বস্ত হয়। বিকাশ আলমারী খুলে রসিদ বই বার করে লিখতে যায়। রাখাল পুনরায় নির্দেশ দেয়, হ্যাঁ, এখন এক এক জনকে দশ বিঘার দাখিলা দাও। বিঘা প্রতি বার্ষিক এক টাকা খাজনা। হাঁ হে, চর তো দু'ভাগে ভাগ হয়ে উঠেছে; কে কোন দিগটা নেবে?—বিকাশকে নির্দেশ দিয়ে দীনুকে প্রশ্ন করে রাখাল।

আপনার পছন্দ মতন ছ্যান্ যারে যেদিগে খুশি। আমাগ কোন আপত্তি নাই। তবে বিঘা পঁচিশের কমে কিন্তু চাষ কইরা সুখ নাই কত্তা। গরীবের আর্জিডা রাখেন, দীনু হাত জোড় করে পুনরায় আব্দার জানায়।

তোমরা দেখছি বসতে পারলে শুতে চাও হে। যা দিচ্ছি তাতেই মালিকের কাছে কি গালাগাল শুনতে হবে জানিনে। তার ওপর আবার পঁচিশ বিঘে! না হে না, ওসব বাড়াবাড়ি করলে আমি কিছুই করতে পারবো না। সরে পড়ো।

মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর করে দীনু, তবে যা দিচিলেন তাই ছ্যান্ কত্তা। গরীবরে আপনারা না দেখলে আর কেরা দেখব? এহন আর না ছ্যান্ না দিলেন। তবে পরে য্যান্ বঞ্চিত্ না হই।

আচ্ছা হে আচ্ছা, পরের কথা পরে। আগে দেখি তোমরা কি রকম চাষ আবাদ করো তারপর অন্য কথা।

আশীর্ব্বাদ করেন কত্তা, মুখ য্যান্ থাকে। আপনাগ য্যান্ খুশী করবার পারি,—গদ গদ হয়েই করিম উত্তর করে।

বেশ, ভাল কথা। দীনু, তাহলে তোমার রইলো উত্তর অংশ আর করিমের দক্ষিণ অংশ।

মনের মতো জমি না পেলেও প্রথম প্রচেষ্টা সফল হওয়ায় উভয়েই খুশী হয়। রসিদ দু'খানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে পুনরায় রাখাল আর বিকাশকে প্রণাম করে কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, অসম্ভবই সম্ভব হলো আজ। অনেক দিন পর আবার হাতে মাটি এল। এখন মা লক্ষ্মীর দয়া হলে অচিরেই ভরে উঠবে গোলা গোয়াল। পূজা পার্বনে আবার মুখর হয়ে উঠবে সমস্ত বাড়ি।···দুই মিতার আনন্দ আর ধরে না। ট্যাঁকে একটা পয়সাও নেই। তবু আজ আর কোন দুর্ভাবনা হয় না। মা লক্ষ্মীর ভিত যখন পাকা হলো তখন আর ভাবনার কি?···মনের খুশীতেই ডিঙ্গিতে এসে ওঠে উভয়ে। ফুরুক ফুরুক শব্দে হুঁকো টানতে থাকে।

দীনু করিম কাছারি ছেড়ে বেরিয়ে এলে বিস্ময়ের সঙ্গে মন্তব্য করে রাখাল, ও বিকাশ, আনাড়ী দুটো বলে কি হে, বালুর ওপর চাষ করবে!

আনাড়ী না হলে আমাদের চলে কি করে দাদা?—হাসতে হাসতেই জবাব দেয় বিকাশ।

ঠিক বলেছ। এখন নজরানার খাতায় দশ টাকা হিসেবে বিশ টাকা জমা করে নাও। বাকীটা—হে-হে-হে, খাসা কলার ছড়াটা এনেছে হে! খাবে নাকি দুটো? হরে, এই ব্যাটা হরে,—হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে দুটো কলা অনিচ্ছা সত্ত্বেই বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয় রাখাল।

যথা লাভ মনে করে কলা দুটো হাত বাড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখে বিকাশ।

হরি জানতো, ওরা দু'জনে উঠে গেলেই পুনরায় ওর তলব পড়বে। তাই ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে আসে।

রাখাল ওর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনী কাটে, কিরে ব্যাটা, ডিমগুলো এরই ভেতর সব সেদ্ধ বসিয়ে দিলি নাকি?

আইজ্ঞা না। তবে হাতের থেইকা পইড়া দুইডা ডিম ভাইঙ্গা গেচে, মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে হরি।

তোর মাথা ভাঙবো গাড়ল! যা, বাকী সবগুলো এক্ষুনি নিয়ে আয় এখানে।

হরি বেরিয়ে গেলে রাখাল পুনরায় মন্তব্য করে, বুঝলে বিকাশ, ব্যাটারা সব ওত্‌ পেতেই আছে। সুযোগ পেলেই ভাগ বসাবে।

হরি ইত্যবসরে ডিম নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে। ভাগের আশা ও ছেড়েই দিয়েছে—মুখ চোখ গম্ভীর। কিন্তু রাখাল ওস্তাদ খেলোয়াড়। সে জানে, খোদ মালিকের পিয়ারের চাকর এই হরি। কিছু কিছু দিয়ে-থুয়ে মুখবন্ধ না করতে পারলে নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। দুটো ডিম ভেঙে ফেললেও ফের দুটো ডিম হরির হাতে দিয়ে সেখান থেকে ওকে তাড়ায়, যা ব্যাটা যা, এই দুটোই রেঁধে খা গে। এক সঙ্গে বেশী ডিম খেলে পেট ছাড়বে।

দুটো ডিম ভাঙবার পরেও পুনরায় দুটো ডিম পেয়ে হরি আশাতীত খুশী হয়। রাখালকে আর-এক কলকে তামাক দিয়ে বেশ ফুর্তির সঙ্গেই হেঁশেলের দিকে ছোটে।

হরি বিদায় হলে এক-একটা ডিম হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে রাখাল। খুশীতে গদ গদ। বিকাশকে লক্ষ্য করে পুনরায় উচ্ছ্বাস জানায়, বেশ বড় বড় টাটকা মুরগীর ডিম হে বিকাশ। তোমার চলে নাকি? আমাদের তো হাঁড়ি হেঁশেলেই ঢুকবাব জো নেই। বাড়িতে রাধা গোবিন্দজীর বিগ্রহ রয়েছে। তবে সেবার বুকের ব্যামোটা চাড়া দিতে ডাক্তার দত্ত 'হ্যপ্‌ বয়েল' করে খেতে বলেছেন। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে—হে-হেহে-। নাও, তুমিও গোটা পাঁচেক নিয়ে যাও। সকালে আধ সেদ্ধ করে খেয়ো। বেশী করে খাটতে পারবে। বিকাশের তরফ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাঁচটা ডিম তার দিকে এগিয়ে দেয়।

বিকাশ ঈষৎ হাস্যে ডিম পাঁচটা আলমারীর নীচে রেখে হাত বাক্স খুলে ত্রিশটা টাকা রাখালের হাতে দিতে যায়।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করে বাধা দেয়, না হে না, তুমিও খেটেছ। তোমারও কিছু পাওয়া দরকার। ও থেকে পাঁচটা টাকা রেখে দাও। অসময়ে কাজ দেবে।

বিকাশ আরো কিছু বেশীই আশা করেছিল কিন্তু মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারে না। পাঁচ টাকা নিজের পকেটে রেখে বাকী পঁচিশ টাকা রাখালের হাতে দেয়। ডিম, কলা আর টাকা নিয়ে অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই বাড়ির দিকে রওনা হয় রাখাল।

॥ ৪ ॥

অঘ্রানের শেষাশেষি। চরফুটনগর সম্পূর্ণ জেগেছে। উত্তুরে হাওয়ায় ক্রমশঃ শুকিয়ে উঠছে বালির স্তর। দীনু করিম ডিঙ্গি থেকে নেমে চরের ওপর ঘর বাঁধে। সামান্য চালাঘর। খড়ের ছাউনি—পাট কাটির বেড়া। নদীর ভাবগতি না দেখে পাকা কিছু করা সমীচীন নয়। তাছাড়া অত পয়সাই বা কোথায়? শুধু একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই। দীর্ঘকাল পর ছেলেপুলেরা আবার একটু মাটির মায়ের স্পর্শ পাবে। ডিঙ্গির ওপর থেকে দিন দিন যেন অসার হয়ে পড়ছে। খোলা চরের ওপর একটু দৌড়ঝাঁপ। মাটির মায়ের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠবে কচি প্রাণ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।...

দেখতে দেখতে এসে পড়ে চৈত্র। কাঠ ফাটা রোদ খাঁ খাঁ করে চরের ওপর। ঘুর্ণি হাওয়া ওলটপালট করে দিয়ে যায় ঘর-দোর। কিন্তু দীনু করিম দমে না। আবার খুঁটি পুঁতে বাঁধে ঘর—সোনালী ভবিষ্যৎ।

বৈশাখে জোয়ারের জল বাড়তে থাকে। আকাশে ভেসে বেড়ায় রাশি রাশি কৃষ্ণ মেঘ। বর্ষার পদধ্বনি শোনা যায় গগনে ভুবনে। একটু একটু করে আসছে নতুন জল। এবার কোমর বেঁধে কাজে লাগার পালা। জমি হারিয়ে অচল হয়ে পড়েছিল ওরা। উঞ্ছবৃত্তির মধ্যেই কাটলো এ ক'মাস। গ্রহের ফের হয়ত বা কেটেছে। আবার জমি হাতে এসেছে। সোৎসাহে কাস্তে টোকা বার করে দুই মিতায়। চাষ নয়, জমি তৈরীর কাজ। বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে মা লক্ষ্মীর আসন। দেবীর কৃপা হলে গঞ্জের মানুষ দেখবে যাদুর খেলা। ঊষর মরুভূমি উর্বর শস্য শ্যামলা হয়ে উঠবে।

একটু একটু করে বাড়ছে জল। নদীর পার ঘেঁষে পুঁতে দেয় দু'জনে থোকা থোকা কচি করচার চারা। সঙ্গে ধনচে গাছ। গঞ্জের লোক দাঁত বার করে হাসে। আনাড়ী দুটোর মাথা খারাপ হয়েছে। আষাঢ়ে যাবে সব তলিয়ে।...

আষাঢ় আসে। চর ডুবে যায়। দীনু করিম আবার এসে ডিঙ্গিতে আশ্রয় নেয়। চালের খড় বেড়ার পাটকাটিতে জ্বালানীর কাজ চলে। কিন্তু ধনচে করচা ডোবে না। সজাগ প্রহরীর মতোই হাত খানেক মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরই মাঝখানে বাঁধা থাকে উভয়ের ডিঙ্গি—দু'খানি ছোট্ট সংসার।

বিধাতা বোধ হয় ওদের ওপর কিছুটা প্রসন্নই এবার। বর্ষার ধকল এবার অনেকটা কম। বংশীর দৃষ্টিও যেন পড়েছে গঞ্জের দিকে। গঞ্জের পাড়ই দিন দিন একটু একটু করে ভাঙছে! চরফুটনগরের ওপর দিয়ে বইছে মৃদু স্রোত। দূর দূরান্ত থেকে নদনদী বয়ে আনছে লক্ষ্মীর আশীস্-কণা—জমির প্রাণশক্তি পলি মাটি। দীমু করিম আসন বিছিয়েই রেখেছে। এখন মা-লক্ষ্মী এসে পায়ের ওপর পা তুলে কেবল বসবেন। ধন্‌চে করচার গায়ে বেশ পুরু হয়েই ধরা পড়ে শস্যপ্রাণ। কার্তিকে আবার টান পড়ে জলে। করচা ধন্‌চের গায়ে বেশ পুরু হয়ে জমেছে শেওলা। কচকচে বালির পরিবর্তে গোড়ায় জমেছে পাঁক। কাস্তে দিয়ে ঝটপট কেটে দেয় ধন্‌চে করচার গাছ। হেমন্তের টানে থকথকে হয়ে আসে পাঁক দিন কয়েকের মধ্যে। উভয়ে মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দেয় বীজ কলাই চরময়। ভিটির ওপর আরো উঁচু হয়ে বালি পড়েছে। চর বেড়েছে দ্বিগুণ হয়ে। দীমু করিমের সংসার আবার মাটিতে নেমে আসে। নতুন করে গোছ-গাছ চলে ঘর-দোরের। প্রাণে আর আনন্দ ধরে না দুজনের। প্রথম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থক হয়েছে।....

লক লক করে বেড়ে চলেছে কলাইয়ের ডগা। আর ক'দিনের মধ্যেই শুঁটি দেখা দেবে। নতুন পলির ওপর প্রথম আবাদ। ফলন বেশ ভালই আশা করা যায়। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে চৈত্রেই ঘরে উঠবে দেবীর আশীস-কণা। গঞ্জের লোক হতবাকই হয়েছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ এসে কুতূহল জানিয়ে যায়। ফড়েরা এসেও টোপ ফেলবার চেষ্টা করে। দীমু করিম অষ্টপ্রহর তদারকে নিযুক্ত। গরু বাছুরের মুখ লাগলে বাড় বাড়ন্ত দমে যাবে কচি কচি ডগাগুলোর। মানুষের চোখকেও বিশ্বাস নেই। এক এক জনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাখানো থাকে। চোখ পড়লেই জ্বলে যায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাঁশের মাথায় কালো হাঁড়ি বেঁধে চুন দিয়ে পুত্তলী এঁকে দেয় উভয়ে। করিম ভাল ঝাড় ফুঁক জানে। বংশ পরম্পরায় ফকির ওরা। ফকির বংশ নামেই বংশের পরিচয় ওদের। বংশী এখন এমনভাবে শুকিয়ে গেছে যে হেঁটে পার হয় গরু, ঘোড়া, ছাগল, মেষ। জায়গায় জায়গায় পায়ের পাতা পর্যন্ত ডোবে না। ওপার থেকে প্রায়ই কেউ না কেউ এসে উৎপাত শুরু করে। চোখের পলক ফেলবার উপায় নেই। শুধু পশুপক্ষীই বা কেন? মানুষ চোরও কম নয়। তন্‌তনে শুঁটির লোভ অনেককেই হাতছানিতে ডাকে।...

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। শুঁটিতে পাক ধরতে শুরু হয়েছে। বংশী ধলেশ্বরীর

বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সোনালী শস্যের ঝল্‌মলানী। আর ক'টা দিন, তারপরেই শুরু হবে কাটা। কম করেও পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মণের আশা করে এক এক জন। খুশী আর ধরে না। সন্ধ্যার পর করিমের দাওয়ার ওপর বসে দুই মিতাতে কথা হচ্ছিল। হুঁকো খেতে খেতে দীনুই প্রথম কথা পাড়ে, ভাইসাব, ধান পাট বুনবার না পারলে সুখ নাই। অভাব কিছুতেই ঘুচব না। চল আর একদিন গোসাঁইজীর কাছে যাই। চর ত অনেকটা জাগচে। কান ভাঙানি দিবার মাইনষের অভাব নাই।

আল্লার দোয়া অইলে সবই অইব ভাইজান। আর কয়ডা দিন সবুর কর। খালি হাতে গেলে কি তাগ মন পাইবা? কলাই কয়ডা ঘরে উঠুক, কিছু হাতে কইরাই যাওয়ন যাইব, হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে করিম উত্তর করে।

কলাই উঠতে আর মাসটাক। তদ্দিনে সব খতম অইব। দেখবার পাও না, মাইন্‌ষে কেমুন ঘুর ঘুর করবার নইচে?

আমাগ আল্লা ভরসা। ই'ছাড়া উপায় কি?

উপায় একটা আচে ভাইসাব।

কি উপায় মোড়লের পো?—করিম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

আচে আচে, একটু ভাইবা ছাহ, মৃদু মৃদু হাসতে থাকে দীনু।

আরে ধুৎতর ভাইবা ছাহ, তুমি কও না?

দীনু সহজভাবেই বলতে থাকে, আরে আমাগ খালের মুখে ডাল-পালা দিয়া রাখচি, দেখ্‌চ ত?

হ, তাত দেখ্‌চিই।

ঐগুলি উঠাইয়া পলো ফেললে্‌ কিছু বড় মাছ উঠব না?

হ, তাত উঠবই। তবে মাছ দিয়া তুমি কি উপায় করবা? জাইলার মত মাছ বেচবা নাকি হাটে বাজারে?

তোমার দেখচি বুইড়া বয়সে ভীমরতিতে ধরচে। মাছ বেচুম্‌ ক্যান! ঐ মাছ দিয়াই আসল কাম সারুম।

মাছ দিয়া কাম সারবা!

হ হ, মাছ দিয়া কাম সারুম। তুমি বোজ না ক্যান? বড় বড় গোটা দুই গরমা যদি গোসাঁইজীর চিচরণে নিবেদন করবার পারি, তাইলে কাম হইব না?—দীনুর ওষ্ঠে হাসি খেলে!

কিন্তু করিম সায় দিতে পারে না। না, ভাইজান, ও মাছটাছ লইয়া গিয়া কাম নাই। হেবার দেখলা না, আণ্ডা দেইখা গোসাঁইজী কেমুন রাগ করল?

তুমি কোন খবরই রাখ না ফকিরের পো। ও রাগ-টাগ নোক দ্যাখানো। হরির মুখে আমি হুনচি, গোটা আষ্টেক বাদে ও সব আণ্ডাই তিনার প্যাটে গেচে। মাছ মাংস পাইলে আর কিচুই চাই না ওনার।

তুমি দেখচি আদা জল খাইয়া লাগচ। তবে আর কথা কি? লও, কাইল থেইকাই কামে লাগি।

হ হ, কাইল থেইকাই। আর দেরি করলে আমাগ কপালে আর জমি আইব না। হরি কইল, আর অনেকে নাকি কাছারিতে যাওয়া আসা করচে।

করিম সে-কথায় সায় দিয়ে ভেতর বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে, কৈরে রহিম, কইলকাডা একটু বদলাইয়া দে। আর বেড়ার মধ্যি থেইকা এক-তারডাও দিচ একবার। মোড়লের পো, আহ, দয়াল চানরে আইজ একটু ডাকি।

হ ভাইসাব, আমিও তোমারে তাই কইবার চাইচিলাম। অনেক দিন তোমার মুখে নাম হুনি না।

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে রহিম আসে। ফতিমা কয়েক খিলি পানও সঙ্গে দিয়েছে। হুঁকোয় গোটা কতক টান দিয়ে একতারা নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। দীনু দোহারের জন্য তৈরী হয়। বসন্তের মাতাল বাতাস বয়ে চলে দাওয়ার ওপর দিয়ে। স্বচ্ছ চাঁদ উঠেছে আকাশে। প্রাণের আবেগে গান ধরে করিম। উভয়ের মিলিত কণ্ঠ অনুরণিত হতে থাকে চরময়:

তুমি কোন্ বা দ্যাশে রইলা রে দয়াল চান্।
আমি তোমার লায়িগা যগিনী সাজিলাম
হারা-ইলাম কুলমান॥
জ্বালা-ইয়া প্রেমের বাতি
বইসা রইলাম সারা রাতি
তুমি না আসিলা গুণনিধি
বল কেমনে বাঁচে পরান॥

॥ ৫ ॥

চৈত্রের মাঝামাঝি কলাই ঘরে ওঠে। উভয়ের জমি আলাদা আলাদা। দীনু সত্তর মণ পেয়েছে। করিম একাত্তর মণ। যেমন বড় বড় দানা তেমন ঘিয়ের মতো রং। নতুন শাড়ী পরে দুই গিন্নী প্রথম শস্য ঘরে তোলে। ফতিমা পীরের শিন্নির জন্য নতুন মাটির কলসীতে আলাদা করে এক মণ কলাই উঠিয়ে রাখে। কুসুমও গোপীনাথের ভোগের জন্য মণ 'খানেক আলাদা করে রাখে। সেবার দীনুর ইচ্ছে ছিল অষ্টপ্রহরের পরিবর্তে ছাপান্ন প্রহর নাম গান করায়। কিন্তু সে সাধ ওর পূর্ণ হয়নি। রাক্ষুসী পদ্মা সব তছনছ করে দিলে। নিজেরাও এতদিন জলের ওপর ভেসেছে। ঠাকুরের কৃপায় আজ একটু আশ্রয় মিলেছে। অষ্টপ্রহর ছাপান্ন প্রহরের খরচা যোগানো এখনো সম্ভবপর নয়। এখন যৎসামান্য ভোগ নিবেদন মাত্র। মা লক্ষ্মীর পূজোও কোনরকমে সারতে হবে। গত বছর তো জলের ওপর ডিঙ্গির মধ্যেই হয়েছে। দেবীর কৃপা হলে আবার কবিগান যাত্রাগান হবে। আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের পায়ের ধুলো বাড়িতে পড়বে। আবার উৎসব-মুখর হয়ে উঠবে দশদিক।...স্বপ্নে স্বপ্নে রঙীন হয়ে ওঠে সোনালী ভবিষ্যৎ।

মঙ্গলবারের হাটবার। মাত্র চার আনায় পাঁচ সের কলাই বেচে দেয় দীনু। সবটা দিয়েই গোপীনাথের আখড়ায় গিয়ে বাতাসা কিনে ভোগ দিয়ে আসে। ঠাকুর দেবতার ভোগ না দিয়ে একটা কানাকড়িতেও হাত ছোঁয়ানো চলবে না। মরে গেলেও না। প্রথম শস্য বেচা পয়সা—ও তো ঠাকুরেরই প্রাপ্য। তাঁর দয়াতেই তো অকুলে কুল পেয়েছে—ক্ষেত ভর্তি ঘি-কলাই। বেশ ঘটা করেই হরিলুট দেওয়া হয়। চার আনায় পাঁচপো বাতাসা। গোবিন্দ কীর্তনিয়া আসে। সঙ্গে শ্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু। দীনু নিজেও দোহার টানে —খোল বাজায়। ঘণ্টা দুই চলে নাম গান। তারপর ঝুমুরের সঙ্গে অঙ্গ দুলিয়ে নৃত্য। মেয়েরা উলু দেয়। মোহন্ত চরণ দাস মন্দির থেকে ছিটিয়ে দেন মুঠো মুঠো লুটের বাতাসা। যে যেভাবে পারে লুফে নেয়। যে না পারে তাকে পরে হাতে হাতে বেঁটে দেওয়া হয়। মাত্র চার আনায় প্রাণগঙ্গা বয়ে যায়।

রাখাল গোসাঁইকে দুটো বড় গরমা ও ঝুড়ি খানেক গল্‌দা চিংড়ী ভেট দিয়ে পাঁচ বিঘে করে আরো দশ বিঘে জমির দখল পায় দুই মিতায়। কলাই বেচে

পঁচিশ পঁচিশ করে নগদ টাকাও দিতে হবে পঞ্চাশটি। আর দুটো দিন দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যেতো। পদ্মার পার থেকে অন্য একদল চাষী এসে নাকি ধর্না দিতে শুরু করেছিল। রাখাল নিতান্ত খাতির করেই ওদের দিলে। তাইতো বললে সে। যাকগে, ঠকা জেতা যাই হোক—জমি তো হাতে এল। এখন দায় শুধু ঐ পঞ্চাশটি টাকার। তা দর যতো মন্দাই হোক এতগুলো কলাই বেচে এ টাকা শোধ দেওয়া যাবেই।···দীনু করিম অনেকটা নিশ্চিন্ত। গঞ্জ থেকে দলে দলে সব ফড়েরা আসছে। অবশিষ্ট কলাই বেচে ফেলবার জন্য উস্‌কানীরও অন্ত নেই। কিন্তু ওরা পাকা চাষী। কখন দর ওঠে আর কখন দর নামে পূর্ব অভিজ্ঞতায় সে-পাট ওদের জানা। এখন চাই ধৈর্য। দাঁতে দাঁত চেপে থাকা। অভাব তো সংসারে লেগেই আছে। ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলোও যেন এক-একটা খুদে রাক্ষস। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাই এক বাটি পান্তা নয়তো এক কাঠা গুড় মুড়ি। তা ওদেরই বা আর দোষ কি? ভালমন্দ তো আর কিছু মুখে দিতে পারে না। ঐ তো সামান্য দুটি ভাত আর মুড়ি। তাও না দিতে পারলে দাঁড়াবে কি দিয়ে? এ সময় হাটের রোজগার নেই বললেই হয়। চৈত্রের মন্দায় কোন চাষীই হাতের জিনিষ বেচতে রাজী নয়। ফড়েরাও বসে বসে আঙুল চুষছে আর হা হুতাশ করছে। অভাবের তাড়নায় দীনু করিমও সময় সময় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এক-একবার ভাবে, কলাই ক'টা বেচে সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলে। রাখালকে দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। তার ওপরেই নির্ভর করছে জমির পাকাপাকি বন্দোবস্ত। তারপর এখন বলদের আবশ্যক না থাকলেও একটা দুধেল গরু না হলে ছেলেপুলেদের বাঁচানো শক্ত। বর্ষার আগে ঘর-দোরের ওপরও নজর দেওয়া দরকার।···কিন্তু মোটে তো ঐ ক'টা কলাই সম্বল। এখনকার এই মাটির দরে বেচলে ক'টাকা আর হাতে থাকবে? ফড়েরা চরে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুঁকো টানে। মুঠো ভর্তি কলাই হাতে নিয়ে যাচাই করে দেখে। কিন্তু দর আর কিছুতেই ওঠে না। সব শেয়ালেরই যেন এক রা। মাত্র একজন অতিকষ্টে দু'টাকা এক আনা দর দেয়, আর সকলেই দু'টাকা। কিন্তু তিন টাকার কম দরে বেচলে যে সংসার খরচাই কুলোবে না! দীনু করিম দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করে।···

বৈশাখের মাঝামাঝি। দু'টাকা দু'আনা দরে সব কলাই বেচে দেয় উভয়ে। না বেচে উপায় নেই। সামনের হাটে রাখালকে টাকা না দিলে সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যাবে। জল আসার আগে সমস্ত চর জুড়ে লাগাতে

হবে ধনচে করচা। এবার আর একা একা সব পেরে উঠবে না। ফতিমা কুসুম সাহায্য করলেও জন দুই কামলা নিতে হবে। টাকার অভাবে গত বছর অপেক্ষা এবার বেশ দেরিই হয়ে গেল। ভাগ্যিস জল এবার নামি আসছে। নয়তো বাড়তেই পারতো না ধনচে করচার চারা। শিকড় ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তলিয়ে যেতো সব। মীরপুরের হাট থেকে গরু আনতে হলে সেও এই শেষ সময়। এরপর আর হাঁটা পথে গরু আনা সম্ভবপর হবে না। বড় নৌকায় চড়িয়ে গরু আনায় অনেক খরচ।...সাত পাঁচ ভেবে গোলা উজাড় করেই কলাই ক'টা বেচে দেয় দুজনে। বাড়ির উঠোনে শক্ত করে বাঁধা হয় মাচা। নদীর পার ঘেঁষে ধনচে করচাও টায় টায় লাগানো হয়ে যায়। রাখালের নিকট ওয়াদাও সময় মতোই রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু দুধেল গাই আর গোয়ালে আসে না। হাড় জিরজির করছে ছেলেপুলেগুলোর। মুখে আঙুল চুষেই দুধের তেষ্টা মেটায়। বুক ফেটে যায় দুজনের। কিন্তু কিছু করার উপায় নেই! অবস্থা চরমে ওঠে আষাঢ়ে। কলাইয়ের মণ সাড়ে তিন টাকা। চোখের জলের সঙ্গে নদীর জল মিশে সমস্ত চর তলিয়ে যায়। তবু ভাগ্যি ভাল যে এবার আর ডিঙ্গিতে উঠতে হয় না। মাচার ওপরেই কোনরকমে টিকে যায়।

আবার কার্তিক আসে, জলে টান ধরে। চতুর্গুণ হয়ে জেগেছে চর। নাগিনী কন্যা ধলেশ্বরী ঝিমিয়ে পড়েছে। একদা বিষ-দাঁতে কেটে ক্ষেত খামার তছনছ করেছে। কিন্তু এখন আর ওর সে দাপট নেই। বর্ষায়ও এখন আর তেমন ফণা তুলে নাচতে পারে না। বালিতে বালিতে বুকে যেন পাষাণ চাপা পড়েছে। দু'চার বছর অন্তরই তাই ওকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দেখা যায়। প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিগবলয়। ব্রহ্মপুত্র নন্দন বংশীও আজ নিষ্প্রভ। পিতৃদত্ত ব্রহ্মতেজ একেবারেই ম্রিয়মান। চরে চরে বিশুষ্ক বক্ষকোষ। কোনরকমে এ ওর গায়ে এলিয়ে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে মাত্র।

দীনু করিম যথারীতি কলাই ছিটিয়ে দেয় থকথকে পলির ওপর। সঙ্গে ছোলা মুগ। বিস্তৃত অঞ্চল আজ শস্য-দায়িনী হয়ে উঠেছে। অনুর্বর বালুকারাশি উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। খুশীতে উপচে পড়ে উভয়ে। আর বিঘা দশেক করে জমি দখলে এলে মুখর হয়ে উঠবে সংসার। আবার যাত্রাগান, কবিগান আর ধামাল উৎসবে মেতে উঠবে আনাচে-কানাচে। লক্ষ্মীর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। শুধু বরণ করে ঘরে তোলা।

মরসুমে মণ মণ বিক্রি হয় মুগ, কলাই, ছোলা। লক্ষ্মীর ঝাঁপি কেঁপে ওঠে দিন দিন। রাখালকে পঞ্চাশের জায়গায় একশ দিয়ে আরো পাঁচ পাঁচ বিঘার অধিকার লাভ হয়েছে। কিছু ফলমূল মাছ মিষ্টিও দিতে হয়েছে। গঞ্জ থেকে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ঢেউ টিন আসে। শালের খুঁটি পুঁতে উঁচু ভিতের ওপর তৈরী হয় পাকা ঘর। কলাগাছের সারির ভেতরে সোনালী রদ্দুরে ঝিকমিক্ করে নতুন ঘরগুলো। গঞ্জের লোকের চোখ ঝলসায়। মাত্র বছর তিনেকের ভেতর স্বপ্ন দেখছে ওরা। চরফুটনগর এখন এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শস্য-ভাণ্ডার। জমির দাম কাঠা প্রতি পঞ্চাশ ষাট টাকা। রাখালের আফসোস হয় এতগুলো জমি হাতছাড়া করে দিয়ে। খোদ মালিকের কাছেও কটূক্তি শুনতে হয়েছে ওদের। ইচ্ছে থাকলেও দীনু করিম আর অধিক জমির আশা করে না। বালির ঢিপি শস্যাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন তো জুয়াড়িদের পাল্লা চলবে। ধাপে ধাপে চড়বে জমির দাম। যা হোক, মা লক্ষ্মী হাতে তুলে যা দিয়েছেন তাতেই ওরা খুশী। নাগ নাগিনী যদি আর ওদের ছুবলে না খায় তা হলে কেটে যাবে দিন কোনরকমে। পূজো-পার্বনে বংশের ধারাও রক্ষিত হবে। বংশী ধলেশ্বরীর উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধা জানায় উভয়ে, দোহাই মহাদেব মহাদেবী, রক্ষা করো আমাদের। কাঙালদের আর মেরো না।...

এবার লক্ষ্মীপূজো ভিটির ওপরেই হয়। পূর্বরীতি অনুযায়ী গান-বাজনা না হলেও গঞ্জের জন কয়েক সাধু সজ্জনের পদধূলি পড়েছিল। পেট ভরেই প্রসাদ পেয়েছেন সকলে। মোহন্ত চরণ দাসের অনুগ্রহে গোপীনাথের ভোগও হয়েছে মণ খানেক চালের অন্ন দিয়ে। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অখণ্ড সাধু সকলেই যোগদান করেছিলেন। বেশ জমেছিল আসর নাম গান আর পালা গানে। তিন মণ দুধের শিন্নিতে নারায়ণ পূজোও সম্ভবপর হয়েছে শুভ গৃহ-প্রবেশ-লগ্নে। গঞ্জের আবালবৃদ্ধ দলে দলে এসে প্রসাদ পেয়ে গেছে। সঙ্গে মুঠো মুঠো কচকচে মুড়ি।...

করিমের বাড়িও উৎসব-মুখর। বছর তিনেক দায়ে পড়ে সব বন্ধ ছিল। ভিটে ছাড়া হওয়ায় শিষ্য সামন্তদের কোন খোঁজ খবর ছিল না। ইচ্ছে করেই কোন সংস্রব রাখেনি করিম। ছিন্নমূল মানুষের আবার পরিচয় কি? সে না ঘাটের না পথের। আজ খোদাতায়ালার ইচ্ছায় আবার সব হতে চলেছে। ঝাড় ফুঁক এতদিন প্রায় বন্ধই ছিল। কাছের মানুষও এতদিন ওর গুণপনার কোন সন্ধান পায় নি। ফকিরাত্তি ওদের বংশের সাধনা। রুজি রোজগারের

ফন্দি নয়। তাই শত অভাব অভিযোগেও কারো নিকট হাত পাততে পারে নি। ও যেন ভুলেই গিয়েছিল সব মন্ত্রতন্ত্র। মিতা দীনু সব খবর রাখে। সম্পদে বিপদে সে-ই একমাত্র সাথী। কিন্তু দীনুও এতকাল সমগোত্র হয়ে জোয়াল টেনেছে। কারো কাউকে সাহায্য করার মতো সঙ্গতি ছিল না। দু'জনে একসঙ্গে নিরালায় বসে দয়াল চানরে ডেকেছে। খোদা দয়াময়। সংসারে দুঃখ আবার কি? বরং ভাগ্যবান ওরা। মিত্রতা ওদের অন্তরে বাহিরে। এক সঙ্গে দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে এক সঙ্গে তীরে উঠেছে। এ যেন এক তন্ত্রীতে পৃথক সত্তা। একজন কাঁদলে আর একজন কাঁদবে, একজন হাসলে আর একজনও হাসবে।

মাঘী পূর্ণিমা। তিন বছর পর আবার করিম ফকিরের বাড়িতে ধামাল উৎসব শুরু হয়েছে। ফকিরান্তির চরম উৎসব ধামাল উৎসব। দুর দুরান্তের শিষ্য সামন্তদের চিঠি লিখে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। কেউ ছুটে এসেছে, কেউ প্রণামীর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। একাদশী তিথি থেকেই খোলা হয়েছে মণ মণ চালের অন্নসত্র। চরফুটনগরের কারো বাড়িতে এ ক'দিন রান্না হবে না। অতিথ অভ্যাগতসহ খাও দাও আনন্দ কর। হোগলার ছাউনী দিয়ে নতুন নতুন ঘর তোলা হয়েছে চরময়। শত শত নরনারীর ভিড়ে জমজমাট। দোকানীরা এসে দোকান খুলেছে। মেলার পণ্যের বিপুল সমাবেশ। শূন্য চর কলকণ্ঠে মুখর। যাদুই বোধ হয় জানে দীনু করিম। উৎসাহী জনতার মধ্যে কেউ কেউ বেশ জোরের সঙ্গেই মন্তব্য করে, আরে এই তো কথা। এত বড় গুণী না হলে বালির চরকে কেউ এমন করে গড়তে পারে? সব ভোজবাজী। করিমের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায় আশপাশের সমস্ত গাঁয়ের লোকের। দলে দলে এসে মোমবাতি জেলে দিয়ে যায় ফকিরের আসনের সামনে। ফল ফুল বাতাসার ছড়াছড়ি। স্তূপাকার হয়ে পড়ে পয়সা, আনি, দু'য়ানি টাকা। করিম এর একটি পয়সাও হাত দিয়ে ছোঁবে না। সব উৎসবে খরচ করে দিচ্ছে। আজ ওর পরম সৌভাগ্য। অগুনতি মানুষ এসে জমায়েত হয়েছে চরফুটনগরে। কারো তেলপড়া চাই, কারো বা জলপড়া। আপাদ মস্তক ঝেড়েও দিতে হবে কাউকে কাউকে। বিরামবিহীনভাবেই যথা-রীতি করে চলেছে করিম। বিরক্তির লেশ মাত্র নেই চোখ মুখে।

আজ পুণ্যাহ। সকাল থেকেই নিয়মিতভাবে ব্যাণ্ড বাজছে। আজ আর কোনরকম ঝাড়-ফুঁক হবে না। সমস্ত দিনরাতই চলবে গান। বিরাট

চত্বর জুড়ে আসর তৈরী হয়েছে। আকাশে ধ্বজা উড়ছে পৎ পৎ করে। রান্না খাওয়ার আজ বিপুল সমাবেশ। টাকা-কড়ি যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে সব উজাড় করে খরচ করা হবে। কাপড়, গামছা সব বিলিয়ে দেওয়া হবে গরীব দুঃখীকে। যদিও সংসার আছে তবু ফকিরের কোনরকম সঞ্চয় রাখতে নেই। বিশেষ করে দয়াল চানের নামে যা এসেছে তা তো নয়ই। করিম মহাখুশী। —সমস্ত চরফুটনগর জুড়েই যেন আজ খুশীর বান ডেকেছে। জীবনের বড় সঞ্চয়ই হলো আনন্দ। করিম সেই আনন্দ সায়রেই ডুব দেয়।...

•

এক-একটি বর্ষা যায় চরফুটনগরের এক-একটি অঞ্চল কেঁপে ওঠে। বছর পাঁচেকের চেষ্টায় ক্ষুদ্র চর বিরাট এক পল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বছরেই নতুন নতুন মানুষ এসে ঘর বাঁধছে। চাষের জমি মেলাই এখন ভার। জমিদার রমেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর মরা গাঙেও আবার জোয়ার বইতে শুরু হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে লাটের কিস্তি বন্ধ হয় হয় অবস্থা। প্রজার বুকের ওপর বাঁশ-ডলাই করেও সংকুলান হচ্ছিল না। চরফুটনগরের চরই আবার নতুন সমৃদ্ধির সূচনা করেছে। ছোট ছোট খণ্ডে চলেছে প্রজাবিলি। মোটা নজরানা। একসঙ্গে অধিক জমি কাউকে দেওয়া হয় না। নায়েব গোমস্তাকে আর বিশ্বাস নেই। বছর তিনেক নিয়মিত এসে ঘাটে লাগছে তাঁর "গ্রীণবোট"। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে আগমন, আশ্বিন কার্তিকে প্রত্যাবর্তন। দীনু করিম আর ছিটে-ফোঁটা জমিও পায় না। তা না পাক, মা লক্ষ্মী ওদের কুশলেই রেখেছেন। চরের মোড়ল ওরাই। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও ওদেরই। বিপদে আপদে ওদেরই শরণাপন্ন হয় চরের মানুষ। ছোট বড় প্রায় শ'খানেক ঘরের বসতি। লোকসংখ্যাও হাজারের ওপর।...

চর দু'ভাগে ভাগ হয়েছে, মাঝখানে খাল। দীনুরা জাতিতে নমশূদ্র। উপাধি বৈরাগী। বংশ পরম্পরায় হরিভক্ত ওরা। প্রতি সন্ধ্যায় খোল বাজিয়ে কীর্তন করা, বৎসরে একবার অষ্টপ্রহর মহোৎসব করা, বিপদে আপদে লুটের মানত করা ওদের বংশ-রীতি। জাত বোষ্টমের সঙ্গে ওদের কোন মিল নেই। পুরোপুরি সনাতন পন্থী। কাছা দিয়েই কাপড় পরে। তবে তিন লহর কাঠের মালা ওদের প্রত্যেকের গলাতেই শোভা পায়। বোষ্টম নয়—হরিভক্ত বৈষ্ণব। দীনুর নাম অনুসারেই খালের নাম বৈরাগীর খাল নামে পরিচিত। বর্ষায় কানায় কানায় ভরে ওঠে—শীতে শুকিয়ে যায়। রমেন্দ্র নারায়ণ গঞ্জে

এলে রাত্রিবাস খালের মুখেই করেন। সম্ভবতঃ ঝড় তুফানের হাত থেকে গ্রীণবোট রক্ষা করা। গত দু'বছর থেকে একটু নেক-নজরই পড়েছে যেন তাঁর চরফুটনগরের ওপর। বর্ষে বর্ষে চরফুটনগর বাড়ছে—তার আশা আকাঙ্ক্ষাও। অর্থ চাই—প্রতিপত্তি। হয়তো আরো কিছু।...

॥ ৬ ॥

বংশী বয়ে চলেছে উত্তর দক্ষিণে, ধলেশ্বরী পূবে পশ্চিমে। নদ নদীর সঙ্গম কেন্দ্র থেকে বদ্বীপের মতো উঠেছে চরফুটনগর। বংশীর পূর্ব পাড়ে গঞ্জ সাভার। ধলেশ্বরীর দক্ষিণ পাড়ে চরধল্লা—বর্ধিষ্ণু খামার বাড়ি। চর না বলে ধল্লাকে সমৃদ্ধশালী জনপদ বলাই সমীচীন। চরফুটনগর অপেক্ষা চরধল্লার ভৌগোলিক স্থায়িত্বও কয়েক পুরুষের। বেশ কয়েক ঘর সম্পন্নশালী গৃহস্থের বাস। অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান। সাদাসিধে ওদের চাল-চলন —সহজ সরল মনোবৃত্তি। মিথ্যে কথা কেউ বলাতে পারে না ওদের দিয়ে। স্বয়ং পীর এসে বললেও না। চরধল্লার মোড়ল পলান বেপারি।

আব্বাজান ষাট বছর বয়সে বেহস্তে গেলেন। পলান বছর দশেকের বালক। আম্মাজান তো শৈশবেই গত হয়েছেন। কি দিয়ে গেলো রহমৎ পলানকে? ছোট্ট একখানা খড়ের চালা ঘর আর গোটাকতক মাটির সান্কী ঘড়া, বদ্‌নী। পোড়া পেট কি আর ওতে চলে?...রহমতের দোষ নেই। কিছু খামার জমি তার ছিল। গোটাকতক গরু বাছুরও। পলান তো 'কালা-গাইয়ের' দুধ খেয়েই মানুষ হয়েছে। গ্যাঁট্টাগোট্টা চেহারা তো সেই অতীতেরই সাক্ষ্য। কিন্তু রাক্ষসী ধলেশ্বরী সব গিলে খেলে। জমিজমা তলিয়ে গেল—আম্মাজানকে খেলো কাল নাগিনীতে।

আষাঢ়ের রাত। ঘুটঘুটে অমাবস্যার অন্ধকার ভেপসা গরমে ঘরে তিষ্ঠানো দায়। দাওয়ার ওপর খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে শুয়েছে ছালেহা। পলান তখন দুধের শিশু। সারা দিনের খাটুনীর পর এক নিমিষে দু'চোখ এক হয়ে আসে ছালেহার। রহমৎ নিয়মিত মাচার ওপরেই শোয়। ওর আবার ভিজে মাটি সহ্য হয় না। শ্লেষ্মার ধাত—একটুতেই কাশির দমক ওঠে। দস্যি পলানকে বুকে চেপে মাই দিতে দিতে অসাড়েই ঘুমিয়ে পড়ে ছালেহা। হঠাৎ বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে ছোবল পড়ে। "মলাম মলাম, কালিয়ে

নিল কালিয়ে নিল” বলে চীৎকারে সমস্ত বাড়িখানাই যেন ডুকরে ওঠে। রহমতের ঘুম পাতলা। চীৎকার শুনে শিয়রে রাখা রামদা নিয়ে মাচা থেকে এক লহমায় লাফিয়ে পড়ে। না না, চোর ছ্যাঁচর নয়। লণ্ঠন ধরিয়ে কাছে আসতে না আসতে বাজীমাত। মুখ দিয়ে গোল্লা উঠছে ছালেহার। অঝোরে খুন ঝরছে। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে। রাক্ষুসী অনেকটা মাংস ছুবলিয়ে খেয়েছে। রহমতের বুঝতে দেরি হয় না। তাড়াতাড়ি পাটের দড়ি দিয়ে তিন জায়গায় তাগা বেঁধে ফেলে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। কালনাগিনীর বিষ দমকে দমকে উঠেছে শিরা উপশিরায়। কিছুক্ষণ দাপা-দাপি করে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে ছালেহা। রহমতের বুক ফেটে কান্না আসে। সোরগোল শুনে প্রতিবেশীরা এসে জড় হয়। ওঝা ফকিরও আসে। তিনদিন তিন রাত্রি চলে ঝাড় ফুঁক। কিন্তু ছালেহা আর জাগে না। রাক্ষসী ধলেশ্বরী ওর গোরস্থানটা পর্যন্ত উদরে পুরেছে। যাক—সব যাক। রহমতের কোন শোক আফসোস নেই। ছালেহাই যদি না রইলো তবে আর জমিজমা দিয়ে কি হবে? নদী আর নাগিনী কাকেও তোয়াক্কা করে না ও। বয়সেও ভাটি পড়েছে। এখন আর ওকে মেয়ে দেবে কে? তা ছাড়া কি আছে যে তাই দেখে পরের ঝি ঘরে আসবে! সবই তো তলিয়ে গেল। নতুন করে ঘর বাঁধা আর হয় না রহমতের। পলানের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না। আধ আধ কথায় ‘আম্মা আম্মা’ বলে চীৎকার করে পলান। গলা শুকিয়ে ওঠে দুধের তেষ্টায়। এক হাতে চোখ পোঁছে আর-এক হাতে পলানকে সামলায় রহমৎ। কিন্তু পলানকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে গৃহলক্ষ্মীর দরকার। মনকে শক্ত করতেও চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ঘর-দোরে পা দিলেই যে ছালেহার কথা মনে পড়ে। পাছা-পেড়ে শাড়ী পরে গাঙের ঘাটে জল ভরতে যেতো ছালেহা। দাওয়ার ওপর বসে কল্কের পর কল্কে তামাক খেতো আর অপলক নেত্রে চেয়ে থাকতো রহমৎ। মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হলে নিজে ছুটে যেতো ছালেহা নাস্তা নিয়ে। কাছে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াতো—আঁচল দিয়ে বাতাস করতো। …রহমতের দু’চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কালনাগিনী ওকে খায় না কেন? একবার বাগে পেলে বিষ দাঁত ভেঙে দেবো না!…না না, সবই খোদাতায়ালার মর্জি। কপাল ভাল হলে অসময়ে ছালেহাই বা যাবে কেন আর পলানেরই বা এত দুঃখ হবে কেন? গলায় কলসী বেঁধে ধলেশ্বরীর জলে ডুব দিলে সব জ্বালা

জুড়ায়। কিন্তু পলানের কি উপায় হবে? খাঁ বাড়ির আর রইলো কি পলান ছাড়া! ঘর-দোর জমিজমা গরু বাছুর সবই তো গেল। একমাত্র পলানই যা ভরসা। ছালেহার বুকের রক্ত বইছে পলানের শিরায় উপশিরায়। পলানের মধ্যেই বেঁচে আছে ছালেহা। পলান—পলান, ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরে রহমৎ পলানকে। চুমোয় চুমোয় ভরে দেয় ওর কচি সোনা মুখ।

মা ছাড়া দুধের শিশুকে মানুষ করা কঠিন কাজ। আত্মীয়স্বজনদের ভেতর কেউ কেউ নিতেও চেয়েছিল পলানকে। কিন্তু রহমৎ দেয়নি। সংসারে ওর আর এমন কি কাজ? ক্ষেতখামার সবই তো গেছে। একা পলানকে সামান্য একটু যত্ন-আত্তি করতে পারবে না? নিজের জন্যও তো দুটো চাল ফোটাতে হবে। পলানকে ভাসিয়ে দিলে বেহস্ত থেকে কি ছালেহাই ওকে ক্ষমা করবে?···অন্য পর কারো কথায় কান না দিয়ে নিজের জিম্মায়ই রাখে রহমৎ পলানকে। মাত্র দশে পা দিয়েছে পলান, রহমতেরও ডাক আসে ছালেহার পাশে।

দশ বছরের পলান আজ পঞ্চাশঊর্ধ্বে পা দিয়েছে। জমিজমা, ক্ষেত খামার, বাড়িঘর, নৌকো, ডিঙ্গি সব হয়েছে। চরধল্লার মাথা আজ ও। ওর একটি মাত্র ইঙ্গিতে সমস্ত চর ওঠে বসে। সালিসী দরবার কোন কিছুই ওকে ছাড়া হয় না। চরের কোন চাষী মহাজনের কাছ থেকে কর্জ নিতে গেলেও চাই ওর সই-সাবুদ—জামিন হওয়া। পলানের সুখ সমৃদ্ধি অতুলনীয়। আল্লার মর্জিতে চরধল্লার কেউ কোনদিন না খেয়ে থাকে না। ঈদ, মহরম, রমজানেও প্রাণ খুলে মাততে পারে সকলে। চরধল্লার পসার লোভনীয়। গঞ্জ থেকে দলে দলে ফিরিওয়ালারা আসে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা নিয়ে। শাড়ী, গামছা, ফুলেল তেল নিয়েও আসে কেউ কেউ। সব নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়। আর হবে নাই বা কেন? চরধল্লা তো এ অঞ্চলের মধ্যে পাটের একটি খুদে আড়ত। ক্ষেতের ধান, কলাইতে সারা বছরের খোরাক চলে। পাট থেকে আসে বাড়তি পয়সা। গঞ্জের বাজারে অন্য অঞ্চলের পাট দশ টাকা দরে বিক্রি হলে চরধল্লার পাট বিক্রি হবে কম করেও দশ টাকা আট আনা দরে। এ অঞ্চলের মধ্যে উৎকৃষ্ট পাট বলতে চরধল্লার পাটকেই বোঝায়। ১৩৩২ সালে চড়া দরে পাট বেচেই সমস্ত চরময় নতুন ঢেউ টিনের ঘর উঠেছে। সোনালী রদ্দুরে ঝলমল করে চরধল্লা। গাঙের পথে নৌকোয় যেতে যেতে ভিন্ দেশী মানুষ হতবাক হয় চরধল্লার সমৃদ্ধি দেখে। ছোট বড় ঘরগুলোর

ওপর কলার-ঝাড় আর বাঁশ-ঝাড়ের ছায়াবাজী চলে বসন্তে শরতে। চর নয় তো যেন এক ইন্দ্রপুরী।···

হঠাৎ পাঁচ-সাত টাকা ত্রিশ-বত্রিশ টাকায়

মহাজনের বাদ-বকেয়া কর্জ এক বছরে শেষ হয়ে যায়। গঞ্জের বাবু ভুইঞারা এবার আর ইলিশ মাছ ও ফজলী আম মুখে দিতে পারে না।

আরে কত চাই ? তুই টেহা ? নামাইয়া থোও মাঝির পো, আট আনার ইলিশ দু'টাকায় কিনে নিয়ে যায় চরধল্লার এক চাষী। পঞ্চাশ টাকার পাট তিনশ' টাকায় বেচে খাঁত ভর্তি করকরে নোট পেয়েছে আজকের হাটে। আট আনার ইলিশ দু'টাকায় খাবে তাতে আর হয়েছে কি ? ক্ষেতে ফি বছর সোনা ফলাবে। আনন্দে খাবে ঘুমাবে গান গাইবে। চাষের কলাকৌশল যখন জানা আছে তখন আর ভাবনার কি ?···টাকায় চারটে দরের ফজলী আম দু'টাকা দিয়ে তিনটে কিনে নিয়ে যায় আর একজন। হলুদে রঙের বাছাই মাথার ফল। গঞ্জের এক বাবুমশায় দর কষাকষি করে দাঁড়িয়েছিলেন। থ বনে যান। হাঁড়ি ভর্তি মিঠাই মণ্ডা এক-একজন চাষীর হাতে। হাটবারে কারো সাধ্য নেই পাট-চাষীর নজর বাঁচিয়ে কোন জিনিষ কিনে খান।

আল্লায় করলে সাম্নের সন আর ধান বুমুম না মিঞা, একতাড়া নোট গুণতে গুণতে মন্তব্য করে একজন আর-একজনকে লক্ষ্য করে। সকলের মুখই হাসিখুশী। কাঁড়ি কাঁড়ি কাপড়-চোপড় আর খাদ্যসামগ্রী কিনে ডিঙ্গি ভাসিয়ে দেয় মনের সুখে। সারি গায়—চলে রঙ তামাসা।

চরধল্লা আর চরফুটনগরে চলে মিতালী। ধলেশ্বরী সূতিকা রুগিণীর মতোই নির্জীব। না আছে স্রোত না উচ্ছ্বাস। সরু এক ফালি রূপালী জরির ফিতে যেন এঁকে বেঁকে চলেছে আপন খেয়ালে। হাঁটা পথেই পারাপার চলে। চরধল্লার মানুষ আসে চরফুটনগরে। চরফুটনগরের মানুষ যায় চরধল্লায়। হেমন্তে জলে টান ধরলেই ছোটরা একটু একটু করে পা ফেলতে শুরু করে। গামছা বা লুঙ্গিখানা মাথায় জড়িয়ে দিব্যি পার হয়ে যায়। বর্ষার ধলেশ্বরী বিমাতার মতোই এতদিন ওদের দূরে রেখেছিল। ডিঙ্গি বেয়ে যাতায়াত সব সময় সম্ভবপর ছিল না। সুযোগের অভাবে অনেক সময় মনের বাসনা চাপতে হয়েছে। এবার রাক্ষুসী শায়েস্তা হয়েছে। ছোবল মারা তো দূরের কথা পাশ ফিরবার ক্ষমতাও এখন নেই।

ডান পা'টা কিছুদিন থেকেই কনকন করতে শুরু করেছে পলানের। গঞ্জের ভোলা কব্‌রেজের ওষুধে এক গাদা টাকা নষ্টই হয়েছে কেবল। ফল কিছুই হয়নি। পা'টার জন্য দিন দিন বড় ভাবনাই হচ্ছে পলানের। বেঁচে থেকেও খোঁড়া হয়ে থাকবে নাকি ও! কব্জির বল যতই থাক—পায়ের বল না থাকলে চাষার চলে কি করে!···করিম ফকিরের তো ঝাড়ফুঁকের সুখ্যাতির অন্ত নেই, গেলে হয় না একদিন? সাকিনা তো অনেক দিন থেকেই ওষুধ ছেড়ে ফকিরের শরণাপন্ন হতে বলছে। সেই ভাল, যাওয়াই যাবে একদিন, হুঁকো টানতে টানতে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল পলান।

সাকিনা মাস কলাই ফোটানো একবাটি গরম সরষের তেল হাতে নিয়ে কাছে এসে বসে। আস্তে আস্তে মালিশ শুরু করে। একটু ঝাঁজের সঙ্গেই বলে, কত দুর দ্যাশের মানুষ আইসা বালো হইয়া যাইবার নৈচে। আর তুমি কাচের থনে কাচে তাই যাইবার পার না?

পালান নিজের গরজেই যাবে বলে স্থির করেছিল। বউয়ের কথায় অধিকতর উৎসাহ বোধ করে। হেসে হেসেই সম্মতি জানায়, তা তোমরা হগলেই যহন কইবার নৈচ তহন যামুনে একদিন ফকিরের কাচে।

সাকিনা খুশী হয়। তাইতো, পুরুষ মানুষের ডান পায়েই বল। সেই ডান পা-ই যদি না রইলো তবে কাজকর্ম করবে কি দিয়ে? পলানের সম্মতিতে সোৎসাহেই জবাব দেয়, হ হ, তাই যাও। মিচামিচি আর দেরি কইরা কাম নাই। কাইল বিহানেই যাও।

পলান পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। সূর্যোদয়ের আগেই চরফুট-নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শুনেছে, সকাল আর সন্ধ্যা বেলাই ঝাড়-ফুঁকের উপযুক্ত সময়। কিছুটা অসুবিধা হলেও তাই যায় পলান। পীর পয়গম্বরের কাছে যেতে হলে শুধু হাতে যেতে নেই। গতকাল বিকেলেই একটা বড় তরমুজ ক্ষেত থেকে উঠিয়ে রেখেছে। বেশ বড়। পাঁচ সাত সেরের কম হবে না। কাটলে যেমন টুকটুকে রং তেমন মিষ্টি হবে। চতুর্থ পুত্র ফজলুলকে সঙ্গে নিয়ে চলে। খোঁড়া পায়ে এত বড় তরমুজ বয়ে চলা সম্ভবপর নয়। ফজলুলই একটা ধামায় করে তরমুজটা নিয়ে চলে। পীর পয়গম্বরের কাছে আবার শুধু ফলও দিতে নেই। সঙ্গে মিষ্টি দিতে হয়। নয়তো কোন ফলই পাওয়া যায় না। দিন কয়েক আগে নতুন আকের গুড় তৈরী হয়েছে। এক কলসী গুড়ও সঙ্গে দেয় সাকিনা।

সকালে দাওয়ার ওপর বসে তামাক খাচ্ছিল করিম। মিতা দীনুও পাশেই বসে। চাষবাসের কথাই হচ্ছিল উভয়ের মধ্যে। আর কিছুটা বেলা হলেই পান্তা খেয়ে মাঠে যাবে। পাটের নিড়ানি চলেছে। হুঁকোটা দিনুর হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বিস্ময়বোধ করে করিম, ক্ষেতের আল ধরে ও পলান ব্যাপারী আসচে না!

হ, ব্যাপারী সাব্-ই তো!—দীনুও বিস্ময় জানায়।

আজ ক'বছর হলো ওরা চরে এসেছে। যৎসামান্য চাষাবাদ করে কিঞ্চিৎ সুখের মুখও দেখছে। কিন্তু পলান ব্যাপারীর সঙ্গে তার কোন তুলনাই হতে পারে না। আট-দশখানা হাল পলানের বাড়িতে। তা ছাড়া আছে ধান চালের কারবার। বড় বড় দু'টো গস্তি নৌকোও আছে। হাজার মণ ধান ধরে এক-একটায়। হাটে বাজারে অনেকদিন দেখা হয়েছে পলান ব্যাপারীর সঙ্গে। সৌভাগ্যশালী পুরুষকে দেখে মনে শ্রদ্ধাও জানিয়েছে উভয়ে। কিন্তু কখনো বাক্যালাপ করতে সাহস পায়নি। ভিন্ গাঁয়ের মানুষ তাতে বড় লোক। ডেকে কথা না বললে কথা বলে কোন সাহসে?...পলান যতই ফকির বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে ততই যেন ওরা হতবাক হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পলানের মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা নেই। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা এসে ফকির বাড়ির উঠানে দাঁড়ায়। আগে থেকেই সহাস্যে আদাব জানায় করিম দীনুকে। সাধারণ একখানা লুঙ্গি পরনে। কাঁধের ওপর আধ-ময়লা আর একখানা ঢাকাই চাদর থোপানো। গায়ের রং নিকষ কালো। যেন তেল চোয়াচ্ছে সারা গা বেয়ে। মাথায় বেতের টুপি।

দীনু করিমও যুগপৎ আদাব জানিয়ে থতমত খেয়ে যায়। এত বড় মানুষ, কোথায় কিসের ওপর বসতে দেবে ভেবে পায় না। করিম একটা মাদুরের জন্য ভেতর বাড়ির উদ্দেশ্যে ডাক হাঁক শুরু করে।

পলান বাধা দেয়, আরে থাউক। মাদুরের কাম কি? মাটিই খাঁটি। থপ করে দাওয়ার ওপরেই বসতে যায়। ডান পায়ে টান লাগে। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে।

করিম সন্ত্রস্ত হয়ে প্রশ্ন করে, কি অইল ব্যাপারী সাব্?

আর কন ক্যান্। এই পাওডার লাইগাই ত আপনার ঠাঁই আইলাম। বাতে ধরচে।

করিম উত্তর দেবার আগে দীনুই আলসের আগুনে নতুন করে তামাক

সেজে পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে মন্তব্য করে, ওয়ার লাইগা কিছু ভাবনার নাই। ফকিরের পো'র এক ফুঁ, কোথায় ছুইটা যাইব বাত টাত।...

হ হ, আল্লার কাচে তাই কন। একটা ফুঁতেই য্যান ভূত পলায়। অমাবইস্যায় পুন্নিমায় বড় কষ্ট পাই।

করিম জিজ্ঞাসা করে, বাসি মুখ ধুইয়া আইচেন নাকি ?

হ, নাকে মুখে ত জল দিচিই।

তাইলে কাইল বিহানে একবার না ধুইয়া আইবেন। খোদার দোয়া হইলে তিন ফুঁ'র বেশী চাইর ফুঁ লাগব না। খান, তামুক খান। তরমুজটা তো বড় জব্বর আনচেন ?

হ, খোদার দোয়ায় ইবার ফলন খুব জোরই হইচে। শ' চারি বেচলাম ই পয্যন্ত। আর শতাবিদি অইব ক্ষ্যাতে আচে। ভাবলাম পীরের কাচে যামু—খালি হাতে যাই কি কইরা। তাই এই গুড়-টুকুন আর তরমুজডা লইয়া আইলাম। দাওয়াত দিয়েন আসনের কাচে। বয়রে বাজান বয়। খাড়ইয়া রইলি ক্যান ?—ফজলুল ধামাটা উঠানের ওপর নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়েছিল। ওকে বসতে বলে জোরে জোরে হুঁকো টানতে থাকে পলান।

ফজলুলকে এতক্ষণ বসতে না বলায় করিম লজ্জাই পায়। তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শোধরাতে চেষ্টা করে, ইদিকে এই ছেওয়ার মদ্দি আইসা বস্ বাপ। আহা-হা চখ মুখে য্যান কালি ছড়াইয়া দিচে, কামডা বালো করেন নাই ব্যাপারী সাব। পোলা-পানরে দিয়া কি এত বড় মোট বয়ায় ? ই গা আপনার—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান উত্তর করে, আমার চতুর্থ ছাওয়াল ফজলুল। হে হে হে—, ফুরুক ফুরুক শব্দে হুঁকো টানতে থাকে আবার।

তাই কন। আয় বাজান আয়। এইখানে আইসা বয়।

ফজলুল ইঙ্গিত মতো কাছে গিয়ে বসলে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে করিম। হাসিমুখেই অন্তঃপুরের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে, কইরে বিটি, কয়েক খিলি পান দিয়া যা। ব্যাপারী সাব, আইজ পরথম্ দিন আপনাগ পায়ের ধুলা পড়ল! কি দিয়া আর খাতির করুম! দুইডা ছাতু মুড়ি দেই ?

না না, আপনি অ্যাত উতালা অইবার নৈচেন ক্যান ? কপালের ফ্যার না কাটলে কি আর আপনাগ মতন মাইনষের দেখা পাওয়ন যায় ? কতদিন থেইকাই ত ভাবচিলাম, আপনাগ চরে আহি। কিন্তু তা আর অইল কই!

ছাতু মুড়ি লাগব না। দয়া কইরা আমার পাওডারে সারাইয়া ভান। তাইলেই আমি আপনার বান্দা অইয়া থাকুম, বিনীতভাবেই প্রত্যুত্তর করে পলান।

তোবা তোবা। খোদার দোয়া মাগেন। আমি কেডা? আমিত তার নফর।

আপনেইত আমার লাইগা তেনার কাচে নালিশ করবেন। আমরা পাপী তাপি মানুষ কি আর তেনারে ডাকবার পারি?

কন্ কি ব্যাপারী সাব! পরান খুইলা দীন দয়ালরে ডাকবেন হ্যার আবার কথা কি!

হ হ ব্যাপারী সাব, আহেন না একদিন সন্দা বেলা, ফকিরের পো'র মুখে গান হুনবেন। দয়াল চানরে এমুন কইরা ডাকে যে পরান আপনার থেইকাই মোচড় দিয়া ওঠে, দীনু সায় দেয়।

বৈরাগীর পো'রে চিনলেন নি ব্যাপারি সাব?—দীনুকে দেখিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করে করিম।

আরে কি য্যান কন! ওনারে ই মুল্লুকে কেড়া না চিনে! হগল (সকল) লোকের মুখেই না ওনার নাম! ই তল্লাটে ওনার মতন কলাই ফলাইবার পারচে কেডা? চরে এ্যাদ্দিন আহি নাই বইলা কি গুণী মাইনষের খোঁজ খবরও রাকি না?

কি য্যান কন! আপনার নখের যুগ্যি মানুষও আমরা নই। পলান ব্যাপারীর নাম সাত গাঁয়ের কেডা না জানে? দীনু অধিকতর বদান্যতা জানায়।

পলান উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—মেহেরা একখানি রেকাবিতে করে কয়েক খিলি পান নিয়ে প্রবেশ করে। মুখের কথা মুখেই থেকে যায় পলানের। মেহেরার রূপ দেখে দু'চোখ বিস্ময়ে ফেটে পড়ে। বছর দশ বার বয়স মেহেরার। নিটোল স্বাস্থ্য। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ।

মনে মনেই ভাবতে থাকে পলান, আল্লা আমাকে অনেকগুলো ছেলে দিয়েছেন। কিন্তু এরকম ফুটফুটে মেয়ে একটিও দেননি। ফকির সাহেব যদি দিতেন আমাকে এই মেয়েটিকে...

মেহেরা কাছে এলে করিম অভ্যর্থনা জানায়, ব্যাপারী সাব, পান খান। এই আমার বেটি।

বাইচা থাউক, বাইচা থাউক। আপনি ত আসমানের চান কোলে পাইচেন ফকির সাব!

মেহেরা রেকাবি রেখে ততক্ষণে পালিয়েছে। দীনু সুযোগ বুঝে পলানের কথার জবাব দেয়, আসমানের চানরে আপনার ঘরে লইয়া যান না ?

কি য্যান্ কন! ফকির সাব কি আমার কালা পোলার লগে হার দুদের মতন ম্যায়ার (মেয়ের) সাদী দিব ? ফজলুর ত আমার সাদী অইয়া গেচে। এহন বাকী কাশেমের। কাশেমের গায়ের রং ত না য্যান আলকাত্‌রা।

বেটা ছাওয়ালের আবার গায়ের রং দিয়া কি অইব! চরিত্তির বালো রাইখা গতর খাটাইবার পারলেই অয় (হয়), উত্তর করে দীনু।

তা যদি কন তাইলে নিজের পোলার সুখ্যাতিই কঁরুম। চাষ আবাদ ত এহন কাশেমই ছ্যাহে। আর স্বভাব চরিত্তির কথা মাইনষেরে জিগাইলেই পারবেন।

মাইনষেরে আর জিগান লাগব না। আপনার ঘরের পোলাপান বালো অইব নাত কার ঘরের পোলাপান বালো অইব ? এহন কথা ছ্যান্, আসমানের চান আপনি ঘরে নিবেন কি না ?

ফকির সাব কি কন ?—দীনুকে পাশ কাটিয়ে করিমকে জিজ্ঞেস করে পলান।

ইত আমার নচিবের কতা। আপনার ঘরে যদি মেহেরা যাইবার পারে তার থনে (থেকে) আর আনন্দের কি অইবার পারে ? ঘর দরজার ফ্যারে (ফেরে) পইড়া হিমসিম খাইবার নৈচি তাই। নইলে কি আর আমাগ সব ঘরে এত বড় ছ্যায়না ম্যায়া থাকে ?

পলান খুশীতে ডগমগ। সোৎসাহেই বাধা দেয়, আল্লায় অরে আমার লাইগাই রাখচে ফকির সাব। বাড়ি গিয়া ফজলুর মারে কইগা। আম্মাজানরে নিজে আইহা একবার দেইখা যাউক।

পোলার সাদী যহন তহন ত আপনেই কত্তা। আপনে কথা দিয়া যান, দীনু বাধা দেয়।

ঘাব্‌রান ক্যান মোড়লের পো ? ই ম্যায়া দেখলে পোলার মায় আর না কইবার পারব না। কাশেম হ্যার্ (তার) আদুইরা গোপাল। টুক টুইকা বউ চাই হ্যার্। মেহেরা মারে দেখলে পাগল অইয়া যাইব। আইজ তাইলে উঠি। কাইল বিহানে বাহি মুখে আহুম (আসব)। পলান উঠে দাঁড়ায়।

দুইডা কিছু মুখে দিয়া গেলে খুশী হইতাম, বাধা দেয় করিম।

পোলার সাদী অইলে ত রোজই আহুম কুটুম বাড়ি, তহন যত পারেন

খাওয়াইয়েন। ঘুম থেইকা উইঠাই চইলা আইচি। হকালের (সকালের) কাম কাইজ কিছুই অয় নাই। এহন কিছু মুকে দিবার পারুম না, পলান উত্তর করে।

তাইলে বাপজান কিছু খাইব, পুনরায় আব্দার করে করিম।

আইচ্ছা, দেন অরে আপনার যা মন চায়।

করিম ফজলুলকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। দীনু আর এক কল্‌কে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

গোটা কয়েক টান দিয়ে মন্তব্য করে পলান, হ, তামুক যত দিবেন আমার না নাই। তামুক না অইলে এক দণ্ডও চলে না আমার।

আর কন কারে? আমারও ঐ কতা। তামুকেই বুদ্ধি খেলে তামুকেই চাষের শক্তি জোয়ায়। খান, বালো মতিহারী পাতায় তৈয়ার।

করিম দীনু অনেকটা পথ পলানকে এগিয়ে দিয়ে আসে। ফিরতি পথে দীনু উচ্ছ্বাস জানায়, ভাই সাব, মা লক্ষীর কৃপায় সবই এখন আপনার থেইকা অইবার নৈচে। ব্যাপারী সাব তো বাড়ি বইয়া আইহাই মেহেরো মারে নিবার চাইল। আর ভাবনার কিছু নাই।

সব কাম আগে মিটা যাউক তারপর কইও। খোদার মর্জি বোজন যায় না।

তুমি দিন রাইত দয়াল চানরে ডাক। দয়াল চান তোমার অমুঙ্গল করবার পারে না।

জানে দয়াল! এহন মেহেরার মার কি মত হাডাও ছাহ।

মেহেরার মা ই সাদীর কতা হুনলে (শুনলে) খুশীই অইব।

তবু হ্যার মত লওয়ন লাগব। ম্যায়ার সাদীর চিন্তায় ত হ্যার চক্ষে ঘুম নাই।

হ, সব ম্যায়া মাইনষেরই ঐ এক কতা। নিশার মাও পোলার বিয়ার লাইগা উতালা অইচে। দিন রাইত ঘ্যানর ঘ্যানরের কামাই নাই।

তা ভুবন বিশ্বাসের ম্যায়ার লগে না কাম ঠিক অইয়াই আচে। ছাও না সাদী দিয়া?

না, অত দুর ছাশে কুটুম বাড়ি করুম না। কেরা যাইব পদ্মার পারে?

পোলার সাদী দিয়া বউ ঘরে আনবা হ্যার আবার দুর ছাশে কি করব?

হ, দেহি। একটা কিছু করণ লাগবই। বেলা অইল, আমিও বাড়ি যাই।

আর এক ছিলুম তামুক খাইবা না ? নও, তোমার ছামনেই মেহেরার মার কাছে কথাডা পারি।

তবে নও।—দুই মিতায় গল্পে গল্পে পুনরায় এসে দাওয়ার ওপর বসে। তামাক টানতে টানতে ফতিমাকে ডেকে কথাটা পাড়ে দীনু। ফতিমা আশাতীত খুশী হয়। পলান ব্যাপারীর ঐশ্বর্যের কথা তার কানেও গেছে। সুখেই থাকবে মেহেরা। পুরুষ মানুষের গায়ের রংকে ও গ্রাহ্য করে না। বড় মধুময় মনে হয় আজকের এই সকাল।

॥ ৭ ॥

পলান বাড়ি ফিরলে সাকিনা ছুটে এসে প্রশ্ন করে, কি কইল ফকির সাব ? পাওডা বালো অইব ত ?

পলানের চোখে বোধ হয় এখনো মায়া কাজল লেগে রয়েছে। সাকিনার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আপন খেয়ালেই জিজ্ঞেস করে, ছোট পোলার সাদী দিবা নাকি ফজলুর মা ?

রাগে সাকিনার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। কিঞ্চিৎ ঝাঁজের সঙ্গেই উত্তর করে, তুমি তাইলে ফকিরের কাছে যাও নাই !

আরে যামু না ক্যান ? হেইখান থেইকাই ত আইলাম, হাসতে হাসতেই জবাব দেয় পলান।

যদি হেইখান থেইকাই আইহা থাক তবে কইল কি ফকির সাব আগে তাই কও !

বাহি মুকে যাইবার কৈচে কাইল। তিন ফুঁর বেশী নাকি চাইর ফুঁ লাগব না।

আল্লায় করুক তাই য্যান অয়। আমি পাঁচ টেহার শিন্নী দিমু।

তুমি থইরা থোও—পাও আমার বালো অইয়াই গেচে। ফকিরের কি আর আমার পাও বালো কইরা না দিয়া উপায় আচে ? নিজের গরজেই দিব নে।

ক্যান্, ই কতা কও যে ?

তোমারে ত কইলাম, পোলার সাদী দিবা নাকি। বউ পাইবা না ত য্যান আসমানের চান পাইবা।

হ, তুমিত তিন পোলার বউই আমারে আসমানের চান আইনা দিচ। তোমার কতায় আমি আর কাশেমের সাদী দিমু না।

আরে তাইত কই, কাইল বিহানে নও না আমার লগে। নিজের চক্ষেই দেইখা আইহ (এসো)।

ফকির সাবের ম্যায়া আচে নাকি ?

ম্যায়া থাকব না তবে কি পোলার লগে সাদীর কথা কইবার নৈচি নাকি আমি ? ম্যায়া ত না য্যান আসমানের চান। দুদের মতন রং। এহন তোমার কালা মানিকের লগে হ্যারা সাদী দেয় কিনা তাই ভ্যাহ।

না দেয় না দেউক। কাশেমও আমার ফ্যালনার না। গায়ে গতরে সোবার দেখতে।

নিজের পোলার বড়াই নিজে কইর না। দশ জনে কইলে তবেই বালো।

ক্যা, কেরা আমার কাশেমরে মোন্দ কয় হুনি ?

না, তোমার পোলা হীরার টুকরা।

হীরার টুকরা না অয় না অইল। বাইচা থাকলে এমনেই কত আসমানের চান আইহা গড়াগড়ি যাইব।

আরে রাগ কর ক্যান ? ফকির সাবত তোমার কালা মানিকের লগে হ্যার ম্যায়ার সাদীর কতা নিজের থেইকাই কইল।

তাই কও ! তুমি নিজের চক্ষে দেখচ নাকি ম্যায়া ?

দেখচি না ! না দেকলে তোমারে এত কইরা কইবার নৈচি কেমুন কইরা ?

তবে ঠিক কইরা ফ্যাল।

তুমি দেখবা না ?

কি য্যান কও ! কুটুম বাড়ি ম্যায়া মাইনষে কোনদিন আগে যায় নাহি (না কি) ?

দেইখ, পাচে য্যান আমারে গাইল মোন্দ কইর না। আমি কইলাম কাইলই পাকা কতা দিয়া আহুম।

তোমার পোলার সাদী তুমি পাকা কতা দিবা নাত গায়ের নোক আইহা দিব নাকি ?

হ, এহন বালো ম্যায়ার কতা হুইনা বুজি আমার পোলা অইল !

আইচ্ছা, না অয় আমার একলার পোলাই। এহন খোদার দোয়ায় তোমার

পাওড়া সারলেই বাঁচি। নাচতা বাড়া বৈ চে। যাও, হাত পায়ে জল দিয়ে আহ, কথার মোড় ঘুরিয়ে সাকিনা হেঁশেলের দিকে রওনা হয়।

খিদেয় পলানের পেটও চোঁ চোঁ করছে। বদনীর পানিতে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে।

করিম ফকিরের কেরামতিতেই হোক কিংবা পূর্ব ব্যবহৃত কোন ওষুধের গুণেই হোক—পলানের পায়ের অবস্থা এখন অনেকটা ভাল। দিন তিনেকের ঝাড় ফুঁতেই পায়ের কনকনানি একরকম নেই বললেই হয়। বোয়াল মাছ আর কলাইয়ের ডাল খেতে নিষেধ করেছে করিম। অথচ এ দুটোই পলানের প্রিয় খাদ্য। তা হোক, খাবে না বোয়াল মাছ আর কলাইয়ের ডাল। পা সারলে দুনিয়ায় খাবার জিনিষের অভাব নেই। কত ভাল ভাল খাবার রয়েছে।

তিনদিন সমানে যাতায়াতের পর করিমও একদিন আসে পলানের বাড়ি। মিতা দীনুকে সঙ্গে করেই আসে। পলানের ঘরবাড়ি দেখে দু'চোখ বিস্ময়ে ভরে ওঠে দু'জনার। গোয়াল ভর্তি গরু বাছুর। সারবন্দী টেউ টিনের ঘর চারদিকে। বার বাড়ি আর ভেতর বাড়িতে মস্ত বড় উঠোন। বাড়ি থেকে নেমেই ধু ধু করছে অনন্ত বিস্তৃত চাষের জমি। বাড়ি নয়তো যেন এক ফলন্ত বাগিচা। আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, কলা গাছ থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় ফলফুলের বিস্তৃত সমাবেশ। করিম আপন মনেই ভাবে, মেহেরা যদি এ বাড়ির বউ হয়ে আসতে পারে তবে সেটা ওর পরম সৌভাগ্য।

পলান একরকম জোর করেই বাটি ভর্তি দুধ, মুড়ি ও পাঁচ সাতটা করে বড় মর্তমান কলা উভয়কে খাইয়ে দেয়। সাকিনা আড়াল থেকে দেখে ফকির সাবকে। কাঁচা পাকা গোঁফ দাড়ী মুখ ভর্তি। আলখাল্লার মতো ঢোলা সাদা পাঞ্জাবী গায়ে। পরনে সাদা লুঙ্গি। অত্যন্ত সাদাসিধে। হ্যাঁ, এ রকম বাপের মেয়ে ফর্সা না হয়ে যায় না। বেশ লম্বা চওড়া মানুষটা। কাশেমের বিয়ে এঁর মেয়ের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে। সাদী পাকা করতেই মত দেয় সাকিনা। দিন পনেরো পরেই ধুমধাম।

আসমানের চাঁদ ঘরে আনে সাকিনা। চরথল্লার মুখে মুখে মেহেরার রূপের প্রশংসা। হায়-আফসোসই করে অনেকে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল এতকাল? এতদিন তো কারো নজরেই পড়েনি। ভাগ্যবানেরই ভাগ্য।

খোলে। তবে এই মেয়ের সঙ্গে কি আর ঐ কেলে-মানিককে মানায়? শুধু পয়সা দেখেই মেয়ের সাদী দিয়েছেন ফকির সাব।

বছর বারো বয়েস কাশেমের—বেশ গ্যাঁট্টাগোট্টা চেহারা। দোষের মধ্যে শুধু আবলুস কাঠের মতো রং। পাথুরে গোপাল যেন। বছর দুই গঞ্জের পাঠশালায় যাতায়াত করেছে কাশেম। সাকিনার ইচ্ছে, ছেলেদের মধ্যে অন্য কেউ লেখাপড়া না করলেও কাশেম অন্ততঃ কিছু শিখুক। কেউ যে কোরান খানাও পড়তে পারে না! ওর বড়দা কত সুন্দর করে পড়ে।...

বছর দুইয়ের চেষ্টায় অক্ষর পরিচয় হয় কাশেমের। থিতিয়ে থিতিয়ে ছাপার অক্ষরের কিছু কিছু পড়তেও পারে। মোটামুটি লিখতেও পারে বড় বড় করে। নিজের নাম—বাড়ির ঠিকানা—ভাই বেরাদারদের নাম। কিন্তু সাকিনার পক্ষে আর বেশী দিন ধৈর্য রাখা সম্ভবপর হয় না। ঐ হয়েছে। লেখাপড়া শিখে তো আর কারো গোলামী করতে যাবে না কাশেম। কোরানখানা যখন পড়তে পারে তখন মিছিমিছি দৌড়ঝাপ করে লাভ নেই। রোজ রোজ নৌকোয় করে গঞ্জে যাওয়া সোজা কথা নয়। তাছাড়া ঝড় বাদল খরায় কষ্ট কি কম হয়? এক ফোঁটা ছেলে সোজা পরিশ্রম করেনি। দু'বছর সমানে টানা-হেঁচড়া করেছে। সকাল দশটায় ডিঙ্গিতে উঠেছে আর ফিরেছে সেই সূর্যি ডোবে ডোবে। মুখখানা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠতো। কাজ নেই আমার বেশী লেখাপড়া শিখে! শেষটায় কি বাছা আমার মরবে?... পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় কাশেমের। দিনকয়েক ওকে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য মন-মরা হয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক চেষ্টায় নতুন করে উৎসাহ এসেছিল। কিন্তু অঙ্কুরেই ছাই চাপা পড়ল। কাশেম এখন দাদাদের সঙ্গে মাঠেই যায়। চাষ আবাদের কাজেই চলে নতুন করে হাতেখড়ি। দিন কয়েকের মধ্যেই ভুলে যায় বই খাতাপত্রের কথা।

ওসমান আর গণি ধান চালের কারবার করে। বড় বড় দুটো গস্তি নৌকোয় চলে আমদানী রপ্তানীর কাজ। হাজার মণ ধান-চাল ধরে এক একটায়। পাঁচ ছ'জন করে দাঁড়ি মাঝি প্রতিটিতে। চোর ডাকাত সদা সর্বদা ওতপেতেই আছে। বাগে পেলেই লুঠ করবে নয়তো ছিনিয়ে নেবে মূলধন। কিন্তু গণি ওসমানকে ঘায়েল করা সহজ কাজ নয়। গায়ে এক একজনের অসুরের বল। তা ছাড়া আছে জোয়ান জোয়ান মাঝিমাল্লারা। সকলেই চরের মানুষ—চেনাশুনো। নির্ভয়েই কাজ করে চলেছে উভয়ে। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন

বাড়ি থাকতে পারে। বাকী পাঁচ দিনই কাটে গস্তিতে। সেখানেই আহার—সেখানেই নিদ্রা। কেরামৎ আর ফজলুল দেখে ক্ষেত খামারের কাজ। পলানও প্রত্যহ মাঠে আসে। বাতে পঙ্গু হবার আগ পর্যন্ত নিজে হাল ধরেছে। এখন আর তা পারে না। ছেলেদের কাজেরই তদারক করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুঁকো খায়। ভুলচুক হলে শুধরে দেয় সকলকে। উপরি মজুররাও কেউ ওর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে চাষ আবাদ। লোকজন গরু বাছুরে সদাসর্বদা সরগরম।

ওসমান আর গণির বউ সংসারের কাজে সাহায্য করে সাকিনাকে। চাকর চাকরাণীতে মিলেও আছে আরো দশ বারো জন। কিন্তু হলে কি হবে চাকররা তো সকলেই ক্ষেত খামারের কাজে ব্যস্ত। ওদের দিয়ে সংসারের কুটোগাছও ভেঙে দু'খানা করানো যাবে না। উল্টো ওদের ভাত জল করতেই সকলকে হিমসিম খেতে হয়। এদিক থেকে মাত্র দুটো চাকরাণীই যা সাহায্য করে। ঘাট থেকে বয়ে বয়ে জল আনাই তো এক দুঃসাধ্য কাজ। নদী ছাড়া কোথাও একবিন্দু জল নেই। রান্না-খাওয়া থেকে হাত-মুখ ধোয়া সমস্ত কাজই হবে ঐ নদীর জল দিয়ে। তারপর আছে ধান, চাল, মুগ, মসুরি ঝেড়ে পুঁছে গোলায় তোলা। দৈনিকের রান্না নয়তো যেন এক মুসাফিরখানার কাজ। অষ্টপ্রহর উনুন জ্বলছেই। এছাড়া আছে মুড়ি ভাজা, ধান ভানা, ঘরদোরের কাজ। কাপড়-চোপড় ময়লা হলে তাও বাড়িতে সেদ্ধ করেই ঘাটে গিয়ে কেচে আনতে হবে। সকাল সন্ধ্যা যে কোথা দিয়ে গড়িয়ে যায় সাকিনা টেরই পায় না। গণির বউয়ের আবার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা কোলে। কাজ করবে কি ওদের সামলাতেই ওর দফারফা। ভাগ্যিস ওসমানের বউয়ের কোন ছেলেপুলে হয়নি। ফজলুর বউ তো এখনো লায়েকই হয়নি। আমিনা আনোয়ারার সঙ্গে ওকে দিয়েও কেবল ফাই-ফরমাসের কাজই চলে। এদিক থেকে দেখলে কাশেমের বউ ঘরে এসে সুবিধেই হয়েছে। তবু তো দু' গ্লাস জল গড়িয়ে দিতে পারছে! বয়েস হয়েছে, এখন আর কত খাটবে ও ?···মেহেরার রূপের কথা চিন্তা না করেই ছোট পোলার বউ ঘরে আনে সাকিনা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আমিনা আর আনোয়ারাকে নিয়ে। মেহেরাকে দিয়ে সংসারের কোন কাজই ওরা করাতে দেয় না। নিজেরাও অনেকটা ঢিলে দিয়েছে। বাপ-মা মরা পরের মেয়ে কিছু বলারও জো নেই। পলান তো নিজের ছেলেদের চেয়েও ভালবাসে আমিনা আনোয়ারাকে। দূর সম্পর্কের এক ভাই—মৃত্যুশয্যায় সঁপে দিয়ে গেছে

অনাথা মেয়েদুটোকে। বয়েস এই তো সবে একজনের নয় দশ আর একজনের সাত আট। মেহেরাকে পেয়ে খুশী আর ধরে না ওদের। অষ্টপ্রহর মেহেরার তদারকেই আছে দু'বোন। কি দিয়ে যে সাজাবে ভেবেই পায় না। কখনও বা মেদি বেটে চিত্রিয়ে দিচ্ছে হাত পায়ের নখ। খোঁপায় দিচ্ছে থোকা থোকা কাশ ফুল। কপালে কাচ পোকার টিপ। মেহেরার মতো ভাবী সারা চরথল্লা খুঁজে কেউ বার করতে পারবে না। টুকটুক করছে গায়ের রং—বেলুনের মতো হাত পা। কষ্ট হলেও সাকিনা কিছু বলে না। ক'দিন আর! একটু লায়েক হলে আপনা থেকেই ঘরদোরের কাজে লাগবে। দিন কয়েক সুখ করে নিক।...

কাশেমের সাজগোজও একটু বেড়েছে। দিনের মধ্যে বার চার পাঁচ সাবান ঘষে গায়ে মুখে। কিন্তু কালো রং কালোই থেকে যায়, কোন ফায়দা হয় না। দু'শিশি গন্ধ তেল আনিয়েছে গঞ্জ থেকে। ঘাড় আর জুলফি বেয়ে চোয়ায় তেল। তেড়ির বাহার তুলতেও এক প্রহর সময় লাগে। গঞ্জের বাবু ভুইঞাদের ছেলেপুলের মতোই জামা জুতো পরতে শুরু করেছে। সাকিনা দেখে দেখে হাসে। চুপি চুপি এক ফাঁকে এসে পলানের সঙ্গে তামাসা জোড়ে, কিগ পোলার বাপ, তোমার ছোট পোলা যে ক্ষ্যাত খামারে যাওয়াই ভুইলা গেল?

পলান জবাব দেয়, দিন কতক বাড়ির ক্ষ্যাতই চাষ করুক। হি আল্লা, আমাগ দিন কাইল সব গেচে, ঘরের মধ্যে একা পেয়ে সাকিনার কোমর জড়িয়ে ধরে।

দিন দুপুইরে বুইড়া মদ্দার ঢং গ্যাহ। আরে ছাড়, ছাড়। গণির বউ আসচে, বিরক্তির সঙ্গেই দু'হাত দিয়ে ছাড়া পাবার চেষ্টা করে সাকিনা।

পলান দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সুখের সংসার চারদিকে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ফকির-বাড়ি যায়। দাওয়ার ওপর বসে পান তামাক খায়। সুরে সুর মিলিয়ে দয়াল চানরে ডাকে—

আয় না প্রেমের বঁড়শী বাইয়া যাই নতুন পুকুরে...

॥ ৮ ॥

অশ্বিনীর বিয়ে দিয়ে দীনুও বউ ঘরে আনে। কুসুমের পক্ষে একা একা আর সবদিকে তাল দেওয়া সম্ভবপর নয়। লোক রেখেও পোষাবে না। সবে তো চাষের কাজ শুরু হয়েছে। এখনো হালের বলদ কেনা হয়নি। সব জমি ভালভাবে চাষ করতে হলে কম করেও দু'জোড়া হাল চাই। বিয়ে দিয়ে

ছেলের বউ ঘরে আনাই সবদিক থেকে সুবিধে। তাছাড়া অশ্বিনীর বয়েসও তো বেশ হয়েছে। বারো পার হয়ে তেরোয় পা দিলে।

আট বছরের পার্বতী বউ হয়ে ঘরে আসে। খুব সুশ্রী না হলেও ফেলনার নয়। বেশ আঁটসাঁট চেহারা। লায়েক হলে সংসারের কাজে খাটতে পারবে। নিশির জন্যও পেড়াপীড়ি করে দীনু। ছুই পোলার বিয়ে একসঙ্গে দিলে খরচায় বেশ সুবিধে হয়। বাড়ি খরচা এক। শুধু গয়না আর কাপড়-জামাই যা আলাদা। করিমও সেই পরামর্শই দেয়। কিন্তু কুসুম কিছুতেই রাজী হয় না। এত অল্প বয়সে কোলের পোলার বিয়ে দিতে ওর মন নেই। বাপের বাড়ির দেশে রায়বাবুদের বাড়ি দেখেছে, কত ডাগর ডাগর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে। কি সুন্দর তাদের আচার ব্যবহার—মুখের কথা। হোক না কেন চাষার পোলা, লেখাপড়া করায় দোষ কি ? "লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই," সই লীলার মুখে এ কথা ও বহুবার শুনেছে। লেখাপড়া শিখে নিশি যদি গাড়ি ঘোড়া নাও চড়তে পারে, তবু তো ভাল করে ছুটো কথা বলতে পারবে। ভদ্রলোকের সঙ্গে চলাফেরা করতে পারবে।···এখন বিয়ে দিলে তো চাষার পোলা চাষাই থাকবে। বিয়েব পরে আবার কেউ লেখাপড়া করতে পারে নাকি! না, কিছুতেই কুসুমকে রাজী করাতে পারে না দীনু।

স্প্রীং দেওয়া পুতুলই যেন পার্বতী। টুকটুকে একখানা লাল রংয়ের শাড়ী পরে শাশুড়ীর সঙ্গে এঘর ওঘর করে। ভাল করে ঘর সংসারের কাজ করতে না পারলেও ছোট ছোট ফাই-ফরমাসে আটকায় না। স্বামী কি বস্তু ভাল করে তা না বুঝলেও তাকে দেখে ঘোমটা টানতে হয় ওর। গুরুজনদের সকলকে দেখেই। পুতুল খেলার আনন্দে যে মেয়েটি দু'দিন আগেও ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে সে আজ ছককাটা পথে বন্দিনী। এ যেন বনের মুক্ত বিহঙ্গীকে খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছে। একদিন হয়তো দেখা যাবে পথের হেরফের ভাল করে কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জাগতিক নিয়মে মা হয়েছে পার্বতী। সর্বশেষ ধলেশ্বরীর বাঁকের মতোই একটি সূতিকা রুগিণী। অবশ্য ভাগ্য যদি ওর ভাল হয় তাহলে সবল সুস্থও থেকে যেতে পারে। দীনুর ঘরে তো আর এখন খাওয়া পরার অভাব নেই! মানুষ হিসেবেও সর্বত্র তার সুখ্যাতি। কুসুমের গুণপনারও তুলনা হয় না। পিতা ভুবন বিশ্বাস ঘর বর অপেক্ষা শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখেই কন্যা সম্প্রদান করেছে। নয়তো কোথায় পদ্মার পাড় আর কোথায় চরফুটনগর। এত দূরদেশ থেকে কি আর কুটুম্বিতা রাখা যায় ?···

চরফুটনগরের চর বেড়েই চলেছে। এখন আর দশ বিশ টাকা ঘুষঘাস কিংবা কলা মুলো দিয়ে জমি পত্তন পাবার উপায় নেই। স্বয়ং রমেন্দ্র নারায়ণের শনির দৃষ্টি পড়েছে চরের ওপর। যেখানে বিঘা মিলতো বিশ পঞ্চাশে সেখানে কাঠাই বিকোয় সত্তর একশো'তে। দিন দিন বিরাট এক জনপদ আকারে গড়ে উঠছে চর। চর নয়তো যেন সাজানো বাগান। দক্ষিণাংশে একমাত্র করিম ফকিরই জাগছে। সে ছাড়া আরো কয়েক ঘর মুসলমান বাসিন্দা এসে আশ্রয় নিয়েছে ধলেশ্বরীর মুখে। চর যদি আরও কিছুটা জাগে এই তাদের ভরসা। আর যা-ই হোক, ষোল আনা লাভ রমেন্দ্র নারায়ণের। জলে-ডোবা জমিই মোটা নজরানায় বিলি হয়ে যায়। আশায় আশায় দিন গুনতে থাকে নতুন মানুষেরা। চাষ আবাদ নেই—ঘর-দোরও ওঠে না। শুধু দিন মজুর খেটে দিন গুজরানো। দীনু করিমের মতো ওরাও পলি ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু আশানুযায়ী সফল হয় না। নদনদীর কাটাল এখন গঞ্জের দিকে। বর্ষায় চরফুটনগরের চর অনেকটা ডুবে গেলেও স্রোতের বেগ মন্থর। যেন অবশ ওদের এ অঙ্গটি। আগের মত তেমন করে আর চরও ডোবে না পলিও ধরা পড়ে না। যাদের তৈরী জমি আছে তাদের এখন চাষ করে খুব সুখ। কিন্তু নতুন করে জমি তৈরীর কাজে এখন আর এগোবার উপায় নেই। আগন্তুকদের আশা আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় আর পূরণ হয় না। রমেন্দ্র নারায়ণও সংশয়ে পড়েন। ক'বছর থেকে তার গ্রীনবোট নিয়মিত এসে খালের মুখে নোঙর ফেলছে। বিলাস ব্যসনের সঙ্গে চলে জমি পরখের কাজ। কোন কোন দিন বোটের ওপরেই বসে দরবার। সেখান থেকেই মোটা নজরানা নিয়ে বিলি ব্যবস্থা দেওয়া হয়। মোসাহেবরা এসেও জড় হয় সকাল বিকেল। বিকেলেই আসর জমে ভাল। সূর্য অস্ত যায়-যায় ডেক চেয়ারে এসে বসেন প্রভু। পাত্র-মিত্ররা মোড়ার ওপর। বিশেষ লাভালাভের ব্যবস্থা থাকলে দু'দশ মিনিটে হাতের কাজ চুকিয়ে নেন। নয়তো বিকেলে আর অযথা দেখা সাক্ষাৎ করে রসভঙ্গ করেন না।

বর্ষার নদনদী কানায় কানায় ফুলে ওঠে। রমেন্দ্র নারায়ণের মনেও জোয়ার জাগে। কোনদিন বা খিচুড়ী ইলিশ মাছ ভাজা, কোনদিন বা মাংস পরোটা চপ কাটলেট। মেজাজ হলে ভাজাভুজিতেও আপত্তি নেই। সঙ্গে রঙিন সরাপ। নিরামিষ গান বাজনাও চলে কোন কোন দিন। কেননা, বছর কয়েক ধরে হাত টান যাচ্ছে বলে ঢাকা থেকে আর হরি বাঈ আসছে না। মনের কোণে বিরহ দেখা দিলে দুপাত্র বেশী করে চড়িয়েই ভুলতে চেষ্টা করেন সে খেদ।

তাতেও আগুন চাপা না পড়লে পার্শ্বচরদের সঙ্গে খিস্তি-খেউড়ে মেতেই সময় কাটান। হাল আমলে রামকান্ত ভট্টাচার্যই সেরা পারিষদ। কি জানি কেন, রামকান্তকে বড় ভাল লাগে রমেন্দ্র নারায়ণের। সে এলে হরি বাঈয়ের কথা বড় একটা মনেও হয় না। খোশ গল্পে গল্পে বেশ মাতিয়ে রাখতে জানে লোকটা। চালাক চতুরও আছে বিলক্ষণ। চরের খবরাখবরও পাওয়া যায় ওর কাছ থেকে। শুধু আড্ডা ফক্কুড়িই করে না। আদায় উশিলেও সাহায্য করে।

ভাগ্যান্বেষী রামকান্ত পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ভাসছিল। দীনুর আহ্বানে চরে এসে আশ্রয় নেয়। কুলপুরোহিতের দুঃখ-দুর্দশা সইতে পারে না দীনু। চরের বাসিন্দা বাড়ছে। পূজো আরচা করে সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারবে রামকান্ত। সহজ সরল মানুষ, সরলভাবেই আহ্বান জানায়। দায়ে পড়ে রামকান্তও সাড়া দেয়। অনাহার অর্ধাহার থেকে রক্ষা পায়।

রামকান্তর পিতা রাম নারায়ণ ছিলেন কাশীপুরের কুলপুরোহিত। পাঁচশ ঘর নমশূদ্র মন্ত্রশিষ্য। যজন যাজন অপেক্ষা ইষ্টমন্ত্র কানে দেওয়াই ছিল তাঁর রীতি। শিষ্যরাও গুরুজী বলতে অজ্ঞান। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাগবৎ পাঠ করতেন রাম নারায়ণ। শিষ্যরা গোল হয়ে বসে শুনতো। খোল বাজিয়ে কীর্তন করতো। সিদা-সামগ্রীতে চলতো গুরুজীর ভরণপোষণ। কি আর এমন খরচা? নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। দিনান্তে একবেলা ভোগ দিয়ে প্রসাদ পেতেন। চলতেনও সাদাসিধেভাবে। স্ত্রী সত্যবতী পাঁচ বছরের রামকান্তকে রেখেই স্বর্গে যান। দ্বিতীয়বার আর ঘর বাঁধবার ইচ্ছে হয়নি রাম নারায়ণের। রামকান্ত মাতুলালয়ে মানুষ হতে থাকে।

ভাগবৎ মহাভারত পাঠ করে—কীর্তন আর মহোৎসবাদি করে পরমানন্দে স্বর্গে যান রাম নারায়ণ। শিষ্যরা চাঁদা তুলে তাঁর সমাধির ওপর একটি তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে। শ্রাদ্ধাদি পর্বও চলে বেশ ধুমধামের সঙ্গেই। কাশীপুর গ্রাম সত্যি সত্যি একজন ধর্মগুরুকে হারালো। রাম নারায়ণের জন্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা অশ্রু বর্ষণ করে। শ্রদ্ধেয় গুরুজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী রামকান্তকেই সকলে মিলে বসাতে চায় সেই শূন্য আসনে। কিন্তু রামকান্ত নাচার। মাতুলালয়ে ইংরেজী ইস্কুলে পড়ে সে। মোটে তো থার্ড ক্লাসের বিদ্যা। তাও আবার ক্রমাগত তিনবার ফেল। তবু, রামকান্ত কিছুতেই রাজী হয় না। যজন যাজন তার ধাতে সইবে না। কিছুতেই পারবে না সে ধেই ধেই করে বাহু তুলে কীর্তনের মাঝে নাচতে। তুলসীর মালা গলায় দিয়ে গদ গদ ভাবে ভাগবৎ পাঠও

তার দ্বারা হবে না। শেষবার ফেল করে খড় মামার কাছ থেকে তাড়া খেয়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয় রামকান্ত। দিনকতক এদিক ওদিক ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাজধানী কোলকাতায় এসে উপস্থিত হয়। বয়েস তখন কম করেও ষোল সতেরো। কোলকাতায় থেকেই আজীবন ও ভাগ্যের সঙ্গে লড়বে। প্রয়োজন হয় জীবন দেবে। তবু গুরু-পুরোহিত সেজে ভিক্ষাপাত্র করে নেবে না। না, কিছুতেই না।···

আজব শহর কোলকাতা। কুয়োর ব্যাঙ সাগরে এসে পড়েছে। রামকান্ত হালে পানি পায় না। চাকরির ধান্দায় ঘুরে বেড়ায় যত্র তত্র। তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যা নিয়ে বেশী দুর অগ্রসর হওয়াও দুঃসাধ্য। হাতের পয়সা উজাড়। হোটেলের ভাত বন্ধ হয় হয়, অনেক উমেদারির পর ভাগ্যগুণে কোন এক চিত্রগৃহের—'গেট কিপারের' পদ জুটে যায়। মাস মাইনে পনেরো টাকা—দু'টাকা রাহা খরচ। বড় বাঁচা বেঁচে যায় রামকান্ত। দশ টাকায় খাওয়া থাকা—দু'টাকায় ট্রাম বাস ভাড়া। বাকী পাঁচ টাকায় জামা জুতো জল খাবার সব। খুশী না হলেও একেবারে অখুশী নয় ও। এখন কিছুদিন দম নিয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাবে। অগ্রিম পাঁচ টাকা চেয়ে নিয়ে নতুন বেশভূষার ব্যবস্থা করে কাজে লাগে। চেহারাটি রামকান্তর সুঠাম। মনের শান্তি ফিরে আসায় দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে। মালিক খুশীই হন ওর আচার ব্যবহারে। ভাবেন, হয়তো টিকে যাবে ছোকরা।

টিকে রামকান্ত নিশ্চয় যেতো কিন্তু ভাগ্যই ওর প্রতি বিরূপ। সেজেগুজে মেয়েরা আসে সিনেমা দেখতে। একা একাও আসে অনেকে। রামকান্তর দিকে কেউ হয়তো এক ঝলক চোখ তুলে তাকালে। কারো ঠোঁটে হয়তো বা হাসিই খেলে গেলো তড়িৎ রেখার মতো। রামকান্ত ভাবলে, মেয়েটি নিশ্চয় ওকে ভালবাসে। আর হবে না-ই বা কেন? দেখতে-শুনতে কি ও খারাপ? সিনেমা ভেঙে যায়। যারা তাকিয়েছিল তারা হয়তো ভ্রূক্ষেপ না করেই চলে যায়। কিন্তু রামকান্ত সোজা কথাটা বাঁকা ভাবে নিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। দিনে রাত্রে তিনবার শো। পারে তো রামকান্ত তিনবারই বেশভূষা পরিবর্তন করে। ঘন ঘন চুলে চিরুনি চালায়। রুমাল দিয়ে মুখ পোঁছে।

এক শনিবারের রাত্রের শোতে যুগলে আসে রাতের রহস্যময়ী দুই তারকা। তেমন ভিড় নেই। রামকান্ত একাকী দাঁড়িয়ে টিকেট চেক্ করছিল। ক্রুজি সিল্কের সার্ট গায়ে—পরনে কোঁচানো দিশি তাঁতের ধুতি। পায়ে আগ্রার নাগরা।

দু'জনের একজন রামকান্তর হাতে টিকেট দিতে গিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলে। আর কথা নেই। বলি বলি করেও এতদিন যে কথা ও কাকেও বলতে পারেনি আজ লাগাম-ছাড়া ভাবেই এগিয়ে যায়। প্রশ্ন করে, হাসলেন যে ?

মেয়েটি গদগদভাবেই উত্তর দেয়, এমনিই।

এমনিই ! বেশ মজা তো !

কথা আর হয় না। শেষ ঘণ্টা বাজছে। শো আরম্ভের আর বাকী নেই। ওরা দু'জনে এক তলাতেই উচ্চাসনে গিয়ে বসে। রামকান্তর মনে অসংখ্য প্রশ্ন এসে ভিড় জমায়।

অন্যদিন শো আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই মেসে ফিরে যায় রামকান্ত। কিন্তু সেদিন আর তা পারে না। ইন্টারভেল পড়ে। রামকান্ত মেয়ে দুটোর সিটের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আশপাশে লোক রয়েছে। কোন কথা হয় না। যতক্ষণ না আলো নেভে সূর্য আর সূর্যমুখীর মতো শুধুই চোখোচোখি চলে। পুনরায় শো আরম্ভ হলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় রামকান্ত ।কন্তু প্রাণখানা পড়ে থাকে ঐ সীট দুটোর ওপর।

সিনেমা যথারীতি শেষ হয়ে যায়। অনেকের সঙ্গে ওরা দু'জনও বেরিয়ে আসে। গুটি গুটি পা ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। রামকান্তও পেছু পেছু। না, কোন পুরুষ সঙ্গী নেই। রাশিকৃত গহনা গায়ে। দেখতে-শুনতেও সুশ্রী। ভয়-ডর কিছু নেই নাকি প্রাণে ! রাত তো প্রায় বারোটাই বাজতে চললো ! বিস্মিত রামকান্ত অধিকতর বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আবার এক ঝলক হাসি খেলে ওদের দু'জনের ঠোঁটে।

রামকান্ত আর ধৈর্য রাখতে পারে না। ভিড় অনেকটা কমে গেছে। সোজাসুজি গিয়ে প্রশ্ন করে, হাসছেন যে ?

হাসি পায় তাই হাসছি, তন্বী মেয়েটি হেসে হেসেই জবাব দেয়।

হাসি কি লোকের শুধু শুধুই পায় ?

পেলে কি করবো বলুন, অপরটি উত্তর করে।

রামকান্ত কিছুটা বেকায়দায় পড়ে। সহসা কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। খানিক ইতস্ততঃ করে পুনরায় প্রশ্ন করে, দাঁড়িয়ে রইলেন, গাড়ি আসবে নাকি ?

কথা তো ছিল কিন্তু এল কই ?—তন্বীটিই উত্তর দেয়।

পৌঁছে দেবো ?

তা হলে তো বেঁচে যাই।

ইঙ্গিত মাত্র ট্যাক্সী এসে দাঁড়ায়। রামকান্ত ড্রাইভারের পাশে, ওরা দু'জন পেছনের সীটে।

কোথায় যাবেন ?—পুনরায় প্রশ্ন করে রামকান্ত।

তন্বীটি উত্তর করে, নয়া রাস্তায়—

নয়া রাস্তায় !—ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারে না রামকান্ত।

পাঞ্জাবী ড্রাইভার সায় দেয়, হ্যাম সমজ গিয়া বাবু সাব, চলিয়ে।

পরের ইতিহাস গতানুগতিক। মকারাদি যজ্ঞে মশগুল রামকান্ত। সোনার অঙ্গ ঝলসে যায় বছর খানেকের মধ্যেই। মাইনের টাকা কর্পূরের মতো উবে যায়। ধার-কর্জ আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম ইয়ার-বন্ধুদের কাছে। তারপর চাকর দারোয়ানের কাছে। তাতেও যখন কুলোয় না আসে কাবুলিওয়ালা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে যেমন মালিকের নেকনজরে পড়েছিল রামকান্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তেমন তার বিষ-নজরে পড়ে। অবস্থা চরমে ওঠে যেদিন কাবুলিওয়ালা সিনেমাগৃহে এসে হামলা শুরু করে। মালিককে আর জবাব দিতে হয় না। রামকান্ত নিজেই একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়।

উপোস দিয়ে মরা ছাড়া এযাত্রা আর গত্যন্তর নেই। তাই-ই মরতে হবে। বড় আশা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিল। কিন্তু কি থেকে কি হয়ে গেলো। গাঁয়ে থাকলে আর যাই হোক দুমুঠো ভাতের অভাবে মরতে হতো না। কিন্তু এখন ফিরে যাওয়া মানে তো লোক হাসানো ! না, এত সহজে পরাজয় স্বীকার করবো না।···

সত্যি, বিধাতা বোধ হয় একেবারে বিমুখ ছিলেন না ওর ওপর। কেমন করে যেন ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয় আসামের এক চা বাগানে। বৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বাগান-আপিসের কেরানী। বেতন সামান্য—কিছু উপরি আছে। রামকান্তর স্বজাতি। একমাত্র অনূঢ়া কন্যা ছাড়া সংসারে আর দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই মহেন্দ্রনাথের। দেশ পূর্ববঙ্গেরই এক অজ পাড়াগাঁয়ে। কিন্তু সে সব ধুয়ে মুছে গেছে অনেককাল। এখন বাগানই ঘরবাড়ি—বাগানই কর্মক্ষেত্র। মহেন্দ্রর ভাবনা অনুরাধাকে নিয়ে। বেশ সেয়ানা হয়েছে মেয়ে, এখন একান্ত প্রয়োজন পাত্রস্থ করা। কিন্তু আসামের জঙ্গলে কোথায় বা পাত্র আর কোথায় বা তার খোঁজখবর ? ঘুম থেকে উঠে সম্পর্ক তো শুধু কুলি-কামিনের সঙ্গে। বড় বড় সাহেব সুবেদারদের জন্য ক্লাব আছে—

আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা। যেখানে সমপর্যায়ের লোকের দেখা-সাক্ষাৎও মেলে। কিন্তু নিম্নপদস্থদের জন্যে সে-সবের কোন বালাই নেই। তারা তো চব্বিশ ঘণ্টার ই দাসখৎ লিখে দিয়ে বসে আছে। হাতে কাজ না থাকলেও ইচ্ছে মতো কোন দল পাকানো চলবে না। আসামের জঙ্গলে অনুরাধারা যেন নির্বাসিতা। কাজে ইস্তফা দিয়ে আসারও কোন উপায় নেই। এক আছে পোড়া পেটের ভাবনা, দ্বিতীয়তঃ পদে পদে আইনের বাধা। চোখে মুখে অন্ধকার দেখে মহেন্দ্র। নিজের মৃত্যুর পর অনুরাধার কি উপায় হবে ?···

কথায় আছে, যত মুশকিল তত আসান। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় হাবুডুবু খাচ্ছিল মহেন্দ্র, সহসা বাগানে রামকান্তর আবির্ভাব হয়। আগেকার সে জৌলুস না থাকলেও এখনো রামকান্তকে বিনা দ্বিধায় সুপুরুষ বলা চলে। কথাবার্তায় সাক্ষাৎ বৃহস্পতি। মহেন্দ্র হাতে আসমানের চাঁদ পায়। প্রথমে চাকুরী—তারপর কন্যা সম্প্রদান। মাস পাঁচেকের মধ্যেই একেবারে মুক্ত মহেন্দ্র। মুক্ত সবরকম ভাবনা চিন্তা আর ভবযন্ত্রণা থেকে।···

জোয়ান স্বামীর সান্নিধ্যে এসে পিতৃশোক ভুলতে বেশী দেরি হয় না অনুরাধার। স্ত্রী-রত্নের সঙ্গে রামকান্তর হাতে আসে মহেন্দ্রর আজীবনের সঞ্চয়। বড় সাহেবকে ধরে বাগানের একটি পদেও ওকে বহাল করে গেছে মহেন্দ্র। একযোগে কামিনী আর কাঞ্চন লাভ। বিপদ কাটিয়ে ওঠে রামকান্ত। বেশ আনন্দের মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে দিন! বছর না ঘুরতে অনুরাধারও মাতৃ-অঙ্ক ভরে ওঠে। সত্যি, ও আজ গরবিনী, মা হতে চলেছে। স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ওষ্ঠের হাসি মেলাতে না মেলাতেই সহসা দুঃখের বান ডাকে। বিকলাঙ্গ এক মৃত সন্তান প্রসব করে অনুরাধা। নিটোল স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙতে থাকে। রামকান্তর গোলাপী নেশায়ও ভাটা পড়ে। সামনেই তো রয়েছে চা বাগানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পুতুলের মতোই আশ্চর্য সুন্দর খাসিয়া মেয়েগুলো। টুকটুক করছে গায়ের রং। ধান্যেশ্বরীর আকর্ষণও বড় একটা কম নয়। উঃ, কতদিন গলা ভেজানো যায়নি! এমন উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে এতদিন ও কি করে উপোস দিয়ে আছে!···বাঘ বুড়ো হলেও খাপ ভোলে না। ওর তো নবযৌবন। রঙিন সুরা আর সাকী নিয়ে আবার মেতে ওঠে রামকান্ত। তারপর তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বছর খানেকের মধ্যেই অনুরাধার ডাক আসে মহেন্দ্রর পাশে। রামকান্ত বড় বাঁচা বেঁচে যায়।

অনুরাধা মরে বাঁচে আর রামকান্ত বেঁচে থেকে মরে। হিসেবের খাতায়

বিরাট গোলমাল দেখা যায়। টমাস সাহেব তো রাগের মাথায় বুট সমেত এক ঘা লাথিই বসিয়ে দেয় বুকের ওপর। কাশতে কাশতে দম আটকে আসে রামকান্তর। তারপর অতিকষ্টে রাতের অন্ধকারে আবার একদিন গা ঢাকা দিয়ে আত্মরক্ষা করে। এবার আর অন্য কোথাও নয়। সোজাসুজি স্বগ্রামে। পিতার শিষ্য সামন্তদের মাথায় পা তুলে দিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়াই স্থির হয়। শহরে আর ওর ঠাঁই হবে না। সুখের ব্যবসা গুরুগিরির ব্যবসা। তোয়াজের ওপর থাকো, ভুঁড়ি বাগিয়ে খাও দাও ঘুমোও। তবে নিরামিষ খেতে হবে এই যা দুখ্যু। তা হোক, এ ছাড়া আর উপায় কি?···রামকান্ত শত নিরাশার মধ্যেও আশা নিয়েই গ্রামে আসে। কিন্তু এখানে পা দিয়েই মুষড়ে পড়ে। শিষ্য সামন্তদের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিজেদের বসত বাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। তারপর অনেক খোঁজখবরের পর দীনুর আকুল আহ্বানে চরণ রাখে এসে চরফুটনগরে।

চরফুটনগরে পা দিয়ে দিনকতক বড় মুশকিলেই পড়ে রামকান্ত। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ওকে হরি-সভায় বসতে হয়। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক সুর করে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করতে হয়। কীর্তনের সঙ্গে দু'বাহু তুলে নাচতেও হয় কোন কোন দিন। নিজের প্রেম ভক্তি থাক আর না-ই থাক ওর মুখে পাঠ কীর্তন শুনে আবাল বৃদ্ধ বণিতা গদগদ। ঘন ঘন জয়ধ্বনি আর উলুধ্বনিতে প্রাণগঙ্গা বয়ে চলে। প্রভুপাদের কণ্ঠমহিমায় সকলেই পঞ্চমুখ। রামকান্তকে আর চাল ডাল তেল নুনের জন্য ভাবতে হয় না। কাজের মধ্যে সকাল সন্ধ্যা পদ-রজ বিতরণ আর পাঠ কীর্তন করা। বাপের বয়সী শিষ্য হলেও তার মস্তকে পদ-রজ দানে বাধা নেই। পাদোদকও দিতে হয় অনেককে। ব্যবস্থা ভালই। তবে পুরোহিতগিরি অপেক্ষা গুরুগিরিতেই সুখ বেশী। পুরোহিত-দের পূজো পার্বনে তবু খানিকটা খাটা খাটুনী আছে। কিন্তু গুরুগিরিতে সে বালাই নেই। দিব্যি খাও দাও ঘুমোও। চাই কি খুশি হলে ঘরের ঝি বউকে দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতেও বাধা নেই! গুরু ব্রাহ্মণ তো সাক্ষাৎ নারায়ণ। নারায়ণ সেবায় আত্ম-নিয়োগ করতে পারা তো সৌভাগ্যেরই কথা। সময় সময় মাছ-মাংসের জন্য প্রাণটা আঁকুপাঁকু করলেও চরফুটনগর রামকান্তর কাছে ভালই লাগে। মোড়ল দীনুই যখন সহায় তখন আর ভাবনার কিছু নেই। তবে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে কিছুটা মোহন্ত চরণ দাসকে নিয়ে। বেটা কারো কাছ থেকে একটা কানাকড়িও নেয় না। স্বয়ং প্রেম-দাতা নিত্যানন্দই যেন

চরে এসেছেন। ঘর দর মন্ত্র শিষ্যও বড় একটা কম করে ফেলছে না। দীনু বৈরাগীরও যেন ভাবের অন্ত নেই। একজন কুলগুরু, একজন দীক্ষা গুরু, একজন সখাগুরু। গুরুর বহর যেন। সব বেটাকে নিয়েই নাচানাচি। মোহন্তটাই দেখছি সব পণ্ড করবে।···সুখ থাকলেও রামকান্তর মনে স্বস্তি নেই। দিন দিন ভাবনা বেড়েই চলেছে।

রোজ সন্ধ্যায় রমেন্দ্র নারায়ণ গ্রীনবোটের ছাদের ওপর ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানেন। কখনো বা সিগারেট। কাঁটা-চামচের সাহায্যে জলযোগও করেন কোন কোন দিন ছাদের ওপর বসেই। রামকান্ত দাওয়ার ওপর বসে সখেদে ভাবে, আহা কি রোশনাই সর্বাঙ্গে! পোষাক আষাকেরই বা কি জৌলুস। কোথাও ছন্দপতন নেই। আজ যেটা পরেন কাল আর সেটা পরেন না। অফুরন্ত বিধির ভাণ্ডার যেন। আর হবে না-ই বা কেন? একে বিশাল জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক—তাতে আবার উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ। আমার মতো চাঁড়ালের বামুনকে আর ক'জন ভদ্রলোক পোঁছে? চাঁড়াল আবার একটা জাত—তার আবার গুরুপুরোহিত। এখনো হাজার বছর ওদের পায়ের তলায় বসে শিখতে হবে।···

প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মমত পাঠে বসতে হয় রামকান্তকে। মন না বসলেও বসতে হয়। গলায় বিনা সুতোয় গাঁথা তুলসীর মালা। বাতাসে ফরফর করে উড়তে থাকে চাঁচর চিকুর। তিলক চর্চিত দেহ। ধ্যানগম্ভীরভাবেই আসনে বসে থাকে রামকান্ত। কিন্তু মনের খাতে বইতে থাকে দিবা রাত্রির স্বপ্ন। খোলে চাটি পড়ে। কীর্তনিয়ারা উচ্চগ্রামে গলা চড়িয়ে জয়ধ্বনি শুরু করে। সইতে পারে না রামকান্ত, যত সব বর্বরের কাণ্ড। সকাল হতে না হতেই গরুর পাল নিয়ে মাঠে যাও আর সন্ধ্যায় সমস্বরে জিগির তোল। সুরুচি বলতে কোন পদার্থ নেই এগুলোর রক্তে। কোলকাতায় যদি কোনরকমে টিকে থাকা যেতো! প্রকৃত মানুষ আছে কোলকাতাতেই। উঁচুনীচুতে এমন দুর্লঙ্ঘ্য ভেদাভেদও নেই সেখানে। সাধারণ একটু ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে যে কোন লোক যে কোন লোকের সঙ্গে মিশতে পারে। আর এখানে তো সব ধুলোয় অন্ধকার। একত্র মেলামেশা তো দূরের কথা, ছুঁলে হুঁকোর জল পর্যন্ত ফেলে দেয় উঁচুতলার মানুষেরা। নিজের কাছে নিজেই কেমন যেন দমে যায় রামকান্ত।···

আজ ক'দিন, চোখ বুজে বেদীর ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতেও পারছে না রামকান্ত। মন ঘুড়িটা কল্পনার নীল আকাশে কেবলই উড়ে চলেছে। কি হবে

এই ভাগবত পাঠ আর কীর্তনাদি করে? দুনিয়ার সুখ শান্তি তো সবই ওদের জন্য। ওরা একটানা কেবল সুখ করে যাবে আর আমরা পায়ের তলায় পড়ে মরবো। না, তা হবে না। দু'দিনের জীবন! নগদা যা পাওয়া যায় সেই-ই ভাল।...ডিঙ্গি নিয়ে একাকী ঘুর ঘুর শুরু করে রামকান্ত গ্রীনবোটের চারপাশে। আশা, কুমার বাহাদুর যদি ভুলেও একবারটি চোখ তুলে তাকান। আহা, গ্রীনবোট তো নয় যেন একখানা ভাসমান প্রমোদ বাসর। কি নেই ওর ভেতর? শোবার ঘর, বসবার ঘর, রসুইখানা, মায় স্নানাগার পর্যন্ত! রসুইখানার চিমনী দিয়ে অষ্টপ্রহর ধোঁয়া বেরুচ্ছে। খোশবুতে ম ম করছে চারদিকের বাতাস। এ যেন শহরের কোন রেস্তোরাঁয় মোগলাই রান্না চেপেছে। বৈরাগীদের পাল্লায় ঘাস পাতা খেয়ে খেয়ে তো পেটে চড়া পড়ে গেলো। মানুষ ক'দিন পারে কামনা বাসনাকে চেপে রাখতে? আর কেনই বা তা রাখবো?...রামকান্ত আলগোছে ডিঙ্গিখানা গ্রীনবোটের পেছনে বেঁধে প্রাণভরে ঘ্রাণ নিতে থাকে। কেমন করে যেন এক নিমেষে দুর অতীতে পৌঁছে যায়ঃ আষাঢ় মাস। তিনদিন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। মহানগরী কোলকাতার যান বাহন সব বন্ধ। যে যেভাবে পারছে ঘরের মধ্যেই আলস্যে দিন কাটাচ্ছে। দু'দিন আগে আপিস থেকে মাইনে পেয়েছে রামকান্ত। নগদ পঁচিশ টাকা। অল্প সময়ে আশাতীত পদোন্নতি। খুশীর হাওয়াই বইছে প্রাণে। খুশীতে গদগদ হয়েই এক বোতল হুইস্কিসহ এসে ওঠে সুষমার ঘরে। অতি অল্প দিনের প্রেম। ভরা বাদরে জোয়ার লাগে। চিৎপুরের রেস্তোরাঁ থেকে আসে গরম গরম চিংড়ীর কাটলেট। হুইস্কি আর কাটলেট্—সোনায় সোহাগা যেন। তারপর খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা, মাংস। একটানা বৃষ্টিতে সোনাগাছির গলি ঘিঞ্জি জলে টৈটুম্বুর। দু'দিন দু'রাত্রি চোখের পলকে কেটে যায়। আজো যেন মুখে লেগে আছে সেই চিংড়ীর কাটলেট।... রামকান্ত অন্যমনস্কভাবেই 'হোৎ' শব্দে পেছন টেনে রসনার জল সম্বরণ করে।

আষাঢ়ের সূর্য কখন অস্ত যায় বোঝা যায় না। বৃষ্টি না থাকলেও জলভরা আকাশ থম থম করছে। বৈষয়িক ব্যাপারে আজ একটু ব্যস্তই ছিলেন রমেন্দ্র নারায়ণ। চরে সান্ধ্য দীপ সবে জ্বলতে শুরু হয়েছে ডেক চেয়ারে এসে বসেন। রামকান্ত অতীত ভুলে যায়। যেন চাঁদ দেখছে আকাশে। কুমার বাহাদুর কি সত্যি ওর দিকে চেয়ে আছেন! ডিঙ্গিতে চাড় দিয়ে সামনা-সামনি হতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ তো হরি হাত ইশারায় ওকেই ডাকছে। হুজুরের সত্যি তাহলে এতদিন পর দয়া হলো। মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে আর ভয়

নেই। দু'দিনেই বশ করা যাবে।…রামকান্ত গ্রীনবোটের সামনা-সামনি এনেই ডিঙ্গি বাঁধে। হরি ছাদ থেকে নীচে নেমে এসে ওকে অভার্থনা জানায়।

কুমার বাহাদুর আজ একাই আছেন। রামকান্ত সন্ত্রস্তভাবে এসে কাছে দাঁড়ায়। ভাবে, এত বড় মানী ব্যক্তি, হাত জোড় করে নমস্কার করলে খুশী হবেন না। তাড়াতাড়ি পায়ে হাত দিয়েই প্রণাম করতে উদ্যত হয়।

কুমারবাহাদুর আপত্তি করেন না। অন্যের উন্নত মস্তককে স্বীয় পদতলে অবনমিত করানোই ওদের বংশ-রীতি। মনে মনে খুশীই হন রামকান্তর ওপর। একদিনেই যখন এতখানি আনুগত্য দেখা যাচ্ছে ভট্চার্যের মধ্যে তখন অনেক কিছু আশা করা যায়। বেশ একটু খাতির করেই পাশের মোড়াটাতে বসতে ইঙ্গিত করেন।

রামকান্ত আবার ভাবনায় পড়ে। হুজুরের পাশে মোড়ার ওপর বসবে! সেটা কি ভাল দেখাবে?…

অবস্থা বুঝে হুজুরই পুনরায় সমর্থন করেন, অত ভাবছো কি হে ভট্চায? বসো বসো, ওতে কোন দোষ নেই। তুমিও তো মানুষ!

দ্বিতীয়বার সম্মতি পেয়ে রামকান্ত গুটি-সুটি হয়ে মোড়ার ওপর বসে পড়ে। পুনরায় অবাক হয়েই ভাবতে থাকে। হ্যাঁ, একেই বলে দিল। এত বড় লোক একটু মান অহংকার নেই। লক্ষ্মী কি আর সাধ করে ঘরে বাঁধা আছেন?…

রামকান্তর অবস্থা আরো চরমে ওঠে যখন বসতে না বসতে হরিকে আদেশ করেন ওর জন্য দুটো চিংড়ীর কাটলেট এনে দিতে। পরিচয় নেই—জিজ্ঞাসাবাদ নেই—সরাসরি খাবার ব্যবস্থা! হবে, জীবনে ও আর ক'জন বড় লোককে দেখেছে আর তাদের আচার ব্যবহার জানতে পেরেছে! না বলতে গিয়েও মুখ দিয়ে বাক্য সরে না রামকান্তর।

আদেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা প্লেটে করে গরম গরম দুটো কাটলেট এনে হাজির করে হরি। বিস্মিত শুধু একা রামকান্তই হয় না। হরি নিজেও হতবাক হয়। প্রথম দিনেই কুমার বাহাদুরের তরফ হতে এত আদর আপ্যায়ন জীবনে ও খুব অল্পই দেখেছে।

কাটলেটের খোশবুতে চারদিক ম ম করছে। এতক্ষণ যা ছিল স্বপ্নেরও বাইরে সহসা তা বাস্তব হয়ে ওঠে। কঠিন হলেও রসনাকে সংযত রেখেই রামকান্ত ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কুমার বাহাদুর রসিয়ে রসিয়ে গড়গড়া টানছিলেন। রামকান্তর আড়ষ্টতা লক্ষ

করে—মুচকি হেসেই উৎসাহ দেন, কই হে ভট্‌চায, চট করে খেয়ে নাও। জলো হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কিছুই স্বাদ পাবে না।

আমি একা খাবো হুজুর? আপনার—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেন রমেন্দ্র নারায়ণ, আমার এখনো অনেক দেরি আছে হে। তোমার তো আবার ওদিকে কীর্তনের সময় হয়ে এল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে আজকের মতো এসো।

রামকান্তর তরফ থেকে আরো খানিকটা বিনয় প্রকাশ করাই হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু রসনাকে আর অধিকক্ষণ সংযত রাখা সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া সত্যিই তো, ইচ্ছে থাক আর না-ই থাক বৈরাগী বাড়িতে তো হাজিরা দিতেই হবে। সংসারের চাল ডাল তো এখনো ওখান থেকেই আসছে। তবে হুজুরের যদি দয়া হয়, নিদেন একটা মুহুরির কাজও যদি দেন, তাহলে আর ঢ্যাং ঢ্যাং করে কীর্তনের মাঝে লাফালাফি করতে হবে না। একঘেয়ে ভাগবত পাঠ করেও আর মুখ দিয়ে ফেনা তুলতে হবে না। না, হুজুরের একটা মতলব নিশ্চয়ই আছে। তা না হলে অনর্থক কেন ডেকে পাঠাবেন! এমন খাবারই বা খাওয়াবেন কেন!··· আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতেই চোখের নিমেষে একটা কাটলেট সাবড়ে দেয়। আঃ, কি মজাদার রান্না। বৈরাগীদের ঘাস গোবর খেয়ে খেয়ে মগজের ঘিলু যে লোপ পেতে বসেছে! দ্বিতীয়টাও মুহূর্তে শেষ হয়ে যায়।

ওর খাওয়া দেখে রমেন্দ্র নারায়ণ কৌতুক বোধ করেন। হেসে হেসেই পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, আরো গোটা দুই চলবে নাকি ভট্‌চায?

আজ্ঞে না হুজুর, যথেষ্ট হয়েছে। আমাকে আবার এক্ষুণি কীর্তনে যেতে হবে।

মুখে যত জোর দিয়েই কথা কটা বলতে যায় না কেন রামকান্ত মনের ভাব বুঝতে কিছুমাত্র দেরি হয় না রমেন্দ্র নারায়ণের। আরো দুটো কাটলেটের জন্য হুকুম করেন।

আবার কাটলেট আসে। খাওয়াও যথারীতি শেষ হতে চলে। রমেন্দ্র-নারায়ণ হাসতে হাসতেই টিপ্পনী কাটেন, আজ কাটলেট পর্যন্তই থাক হে ভট্‌চায! একদিনে বেশী এগোনো ভাল দেখাবে না।

কি যে বলেন হুজুর, মুচকি মুচকি হাসতে থাকে রামকান্ত।

কুমার বাহাদুর বলেন, কেন, খুব খারাপ বলছি নাকি? তা কাটলেট কেমন খেলে?

জীবনে কখনো এরকম সুস্বাদু কাটলেট খাইনি হুজুর—, ঢোক গিলে উত্তর করে রামকান্ত।

আচ্ছা, তা হলে এখন এসো।

হাত ধুয়ে রামকান্ত আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়। কুমার বাহাদুর বাধা দেন, থাক হে, বারে বারে পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

কি যে বলেন হুজুর! আপনি হচ্ছেন সৎ ব্রাহ্মণ, আপনার পায়ের ধুলো নেবো এতো আমার পরম সৌভাগ্য।

আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে, এখন এসো।

রামকান্ত মোহাবিষ্টের মতোই আবার এসে ডিঙ্গিতে ওঠে। অপলক দৃষ্টি কুমার বাহাদুরের দিকে। খোশ মেজাজেই গড়গড়া টানতে থাকেন কুমার বাহাদুর, জালে বোধ হয় মাছ এবার পড়লো।

পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত চরফুটনগর। মণ্ডল পাড়া, বিশ্বাস পাড়া, ফকির পাড়া, বৈরাগী পাড়া। এক একজন মোড়লের নাম অনুসারে এক একটি পাড়া। ফকির পাড়া আর মণ্ডল পাড়াই আয়তনে বড়। লোকসংখ্যাও এ দুটিতে অধিক। পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত শুধু পরিচয়ের সুবিধার জন্য। নয়তো, চরফুটনগর আসলে এক। দীনু আর করিমই চরের মাথা। সকলে মিলেমিশে চাষ আবাদ করে—প্রাণ খুলে ধামাল উৎসব আর কীর্তনে মাতে। ছোটখাটো ঝগড়াও সময় সময় পরস্পরের মধ্যে হয়। কিন্তু ভিন্ গাঁয়ের মানুষের সাধ্য নেই সেই সুযোগে চরের মানুষকে কিছু বলে। ঝগড়াই থাক আর মিতালিই থাক কেউ কিছু অন্যায় করলে একত্র হয়েই তার ঘাড় মটকায়। চরের সম্মান সকলের সম্মান। নিজেদের ঝগড়া-ঝাঁটি নিজেদের মধ্যে মেটাতে হবে। বাইরের লোক যেন কেউ তার মধ্যে নাক গলাতে না আসে, দীনু করিমের কড়া নির্দেশ। চরের অনিষ্ট করলে চরে বাস করা কিছুতেই চলবে না। আর ঝগড়াই বা হবে কেন? হয়তো বা ক্ষণিকের মন-কষাকষি। তারপর যেই সকলে কীর্তন কিংবা ফকিরের আসরে এসে বসলে অমনি মনো-

মালিন্য মিটমাট হয়ে গেলো। একজন খাওয়ালে পাঁচ কলকে তামাক সেজে আর একজন সাত কলকে। তারপর মাতব্বররা খানিক দাঁত বার করে হাসলে—দু'চারটে টিকা টিপ্পনী ঝাড়লে—পরস্পর গিয়ে পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলে।

অপরাধ যদি খুব গুরুতর হয় তাহলে বসবে পঞ্চায়েত। দীনু আর করিমের বার বাড়ির ঘর তার জন্য চির উন্মুক্ত। বাটা ভর্তি পান সুপুরি আসবে, কলকের পর কলকে তামাক। আসর ভাল করে জমবার আগ পর্যন্ত হাসি মস্কারা চলবে এ ও তার মধ্যে। তারপর আসল বাদী বিবাদী করজোড়ে সভাকে দণ্ডবৎ জানিয়ে পেশ করবে নিজ নিজ আর্জি। মন দিয়ে সব শোনা হবে। কেউ সভার মর্যাদা ক্ষুন্ন করলে মাতব্বরদের মধ্যে একজন গগনভেদী ধমকে বসিয়ে দেবে তাকে। তারপর চলবে খানিক কানা-কানি ফিস-ফিসানী। সর্বশেষে রায় দান। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে দোষীকে মারা হবে পাঁচ জুতো নয়তো দেওয়া হবে নাকে খত। সময় সময় দু'পাঁচ টাকা জরিমানাও আদায় হয় কারো কারো কাছ থেকে পঞ্চায়েতের জন্য। বিচার এইখানেই খতম। থানা, পুলিশ আদালত কেউ করতে পারবে না। জমির গোলমাল, বাড়ির গোলমাল, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, বাপ-বেটায় মন কষাকষি—সব মিটে যায় পাঁচজনের সালিসীতে।

মণ্ডল পাড়া নাম হয়েছে মধু মণ্ডলের নাম অনুসারে। মধুর আদি বাসও ছিল পদ্মারই পাড়ে। কিছু কিছু লেখাপড়া জানে মধু। তাই তার কথাবার্তা অনেকটা মাজা ঘষা। চাষের জমি-জমা আগেও বড় একটা ছিল না মধুর। তবু বাড়িতে দুটো দুধেল গরু পুষে এবং অন্যের জমি পত্তন নিয়ে এক রকম সুখেই দিন কেটেছে। কিন্তু কাল হল পদ্মা। কাশীপুরের পাশাপাশি গ্রাম মোহনপুর। তাই কাশীপুর যখন তলিয়ে গেলো মোহনপুরও একেবারে রেহাই পেলো না। ক্ষতি মধুরও হলো। তবু দীনু করিম পিতৃপিতামহের ভিটা ছেড়ে এলেও মধু তা পারলে না। অধিকতর দুঃখ কষ্টের মধ্যেই দিন কাটাতে থাকে। কিন্তু পদ্মা যে হাঁ করেই ছিল। ওর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখে মধু লড়বে কতক্ষণ? বছর না ঘুরতেই ভিটেমাটি সব সাফ। মধুও বাধ্য হয় অন্যত্র মাথা গুঁজতে।

ভিন্ গাঁয়ের মানুষ হলেও দীনু আর মধুর মধ্যে গলায় গলায় ভাব ছিল। অঞ্চলের সেরা কীর্তনিয়া মধু মণ্ডল। যেমন তার কণ্ঠস্বর তেমন ভাব ও ব্যঞ্জনা। কিন্তু দীনু বৈরাগী খোল না বাজালে মধুর ভাব আসে না।

সুতরাং মাসের মধ্যে দু'দশবার উভয়ের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হতো। দুর দুরান্ত থেকে মধুর ডাক আসে। দীনুকেও খোল বাজাবার জন্য সঙ্গে যেতে হয়। নৌকা বিলাস, মান ভঞ্জন, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালা গানে মধুর জুড়ি নেই। খোল বাজনায় দীনুর নাম-ডাকও দেশ-বিদেশময়। মধুর নিমন্ত্রণ এলে দীনুরও তা আসবে। মধু দীনু যেন যমজ দুই ভাই। স্বয়ং গৌর নিতাই-ই যেন কীর্তনের মাঝে অঙ্গ দুলিয়ে নাচতে থাকে। প্রতি বছর অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তনে দীনুর বাড়িতে মধুর আসা চাই-ই। তিনদিন তিন রাত্রি বিরাম-বিহীনভাবে চলে নাম মহা-যজ্ঞ। চারদিক থেকে দলে দলে আসে অঞ্চলের কীর্তনিয়ারা। প্রাণ খুলে নাচে—নাম গান গায়। পেট পুরে দু'বেলা পায় মহাপ্রসাদ। উৎসবের পরিসমাপ্তি হয় দধি-মঙ্গল আর মহোৎসবে। নাম যজ্ঞের আগে মাসাধিককাল নিয়মিত চলে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও পরে পালা গান। মহোৎসবের পরেও তাই বৈরাগী বাড়ির হাঁড়ি হেঁশেল সহজে বন্ধ হয় না। দুর গাঁ থেকে যে সব কীর্তনিয়ারা আসে তারা মধুর মুখের পালা গান না শুনে কেউ ফিরতে চায় না। গান নয়তো এক একটি কলিতে যেন অন্তর বিগলিত হয়ে প্রাণ-গঙ্গা বয়ে চলে। পয়লা কার্তিক থেকে শুরু অঘ্রানের মাঝামাঝি শেষ।

প্রলয়ের পরে দীনু মধুকে অনেক করে বলেছিল। কিন্তু গ্রাম ছাড়তে মধু কিছুতেই রাজী হয়নি। তারপর তিলে তিলে যখন রাক্ষুসী পদ্মা ভিটেটুকুও গ্রাস করলে তখন আর গত্যন্তর নেই। মধু নিজেই চিঠি দিলে দীনুকে। চরফুটনগরে তখন জমির দর অনেক। তবু মধু কীর্তনিয়ার মতো গুণী লোক চরে আসবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? বেচারা, হালে পুত্র-শোক পেয়েছে। পরমেশ্বরের যে কি মর্জি বোঝা যায় না। এমন সাধু সজ্জন ব্যক্তি তাকেও কিনা মহাশোক ভোগ করতে হচ্ছে! সংসারে পা দিয়েই তো সংসার-লক্ষ্মীকে হারিয়েছে। বছর খানেকের নিবারণকে রেখে মোক্ষদা স্বর্গে গেলো। সেই থেকে সন্ন্যাসীর জীবনই কাটাচ্ছে মধু কীর্তনিয়া। নিজে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে নিবারণকে। অনেক কষ্ট করে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়েছে। তারপর বিয়ে দিয়ে হীরের টুকরো বউ ঘরে আনলে কিছু না পেয়ে না থুয়ে। মধুর সংসার নবলক্ষ্মীর আগমনে ভরে ওঠে। নিজে পালা গান করে দু'দশ টাকা পায়। নিবারণ চাষ-আবাদের

কাজ করেও আবার ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানীগিরি করে। দুটো দুধেল গরু গোয়ালে। অভাব কিছু মাত্র নেই। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই নাতনীর মুখও দেখলে মধু কীর্তনিয়া। দয়াল হরির দয়া আর কাকে বলে ? আগে দূর দূরান্ত থেকে ডাক এলেও ওকে ছুটতে হতো। শুধু পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যই নয় পেটের ভাবনা ভেবেই। এখন আর তা হয় না। আশপাশের ডাক না থাকলে নাতনীকে কাছে বসিয়েই গান শোনায়। মনের আনন্দে কল্কে সেজে তামাক খায়। নাতনীর গায়ের রং বউমার মতো ফর্সা না হলেও মুখ-সৌষ্ঠব চমৎকার। স্বয়ং ওর রাধা-রমণই বোধ হয় নারীর বেশে পুনরায় ধরায় এসেছেন। ময়নার বয়েস বছর তিনেক। ওকে কাছে বসিয়ে খেলা দিতে দিতে দু'কলি গানই বেঁধে ফেলে মধু ঃ

ধনী—
কোথা ছিলে বল চাঁদ-বদনী।
আমি তোমার ও রূপে জলে মরি
কোথা ছিলে বল আদরিণী ॥

কৃষ্ণ নাম গানে, মহোৎসবে, সুখের সংসারে পরমানন্দেই দিন কাটতে থাকে মধুর। অসময়ে মোক্ষদাকে হারিয়ে এক সময় মনে যে খেদ হয়েছিল এখন আর তার বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। রাধারমণ ওকে বেশ আনন্দেই রেখেছেন। দিব্যি খায় দায় পূজা-আহ্নিক করে। নাতনীকে কাছে বসিয়ে খেলা দেয়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো কোঁকড়া চুল ময়নার মাথা ভর্তি। ছোট্ট ছোট্ট দুধের মতো সাদা দাঁত। খিল খিল করে হাসে। মধুর আনন্দ ধরে না। পাড়া প্রতিবেশীরা অনুযোগ করে, তবু তো নাতির মুখ দেখেনি মণ্ডল। নাতি হলে হয়তো মাটিতেই নামাতো না।

মধু হাসে। মনে মনেই বলে, নাতি আর নাতনীতে তফাত কি ? সকলেই তো কৃষ্ণের জীব। ভগবান ওকে প্রথম নাতি না দিয়ে নাতনী দিয়েই ভাল করেছেন। নারীই তো গৃহলক্ষ্মী। সর্বপ্রথম সেই লক্ষ্মীর আগমন তো পরম সৌভাগ্যেরই কথা। তাছাড়া বেটাছেলে লায়েক হতে ঢের সময় লাগে। কৃষ্ণদাসী তো শীগগীরই ডাগর হয়ে উঠবে। রাধারানীর পাশে এসে দাঁড়াবেন রাধারমণ। নয়ন জুড়াবে। বাপ মা পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ময়না

ময়না। কিন্তু মধুর কাছে ও কৃষ্ণদাসী। মেয়েই বলো আর ছেলেই বলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তো পুরুষ। আর সকলেই নারী—তাঁর দাসী।… মধুর ভাবনা কূল পায় না। চিরানন্দময় জগৎ।…

অলক্ষ্যে বিধাতা হয়তো হাসেন। বটে! আনন্দ চাও? পাবে। তবে জেনে রেখো :

যে করে আমার আশ,
করি তার সর্বনাশ।
তবু যে করে আশ,
হই তার দাসানুদাস।

নিবারণের বয়েস কুড়ি একুশ—জোয়ান ছেলে। ভোরে উঠে পান্তা খেয়ে ক্ষেতের কাজে গিয়েছে। দুপুরে ফিরে এসে গরম ভাত খাবে। শ্বশুরের নিরামিষ রান্না শেষ করে উনুনে মাছের ঝোল চাপিয়েছে দুর্গা। মধু ঘাট থেকে স্নান করে এসে সবে আহ্নিকে বসেছে। ক্ষেত থেকে আট দশ জন ধরাধরি করে নিবারণকে বাড়ি নিয়ে আসে। দু'বার ভেদবমির পর অচৈতন্য নিবারণ। ওঝা আসে, বৈদ্য আসে, মায় এ্যালোপাথিক ডাক্তার পর্যন্ত। কিন্তু নিবারণের আর জ্ঞান হয় না। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

গগনভেদী চীৎকারে ফেটে পড়ে দুর্গা। কাটা পাঁঠার মতো দাপাতে থাকে। ময়না ভ্যাবাচাকা খেয়ে উচ্চস্বরেই কাঁদতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনের চোখও জলে টৈটুম্বুর। কিন্তু জল নেই শুধু মধুর চোখে। চিরজীবন নাম গান করেছে ও—গীতা পড়েছে। ও জানে, জীর্ণ বস্ত্রের মতোই তো পরমাত্মা একদিন এ দেহ ত্যাগ করে চলে যাবে। এতো অনিবার্য পরিণাম। মায়াময় জগৎ। কে পুত্র, কে কন্যা, কে স্ত্রী?…হাতে আহ্নিকের তিলক-মাটি ছিল। আর ছিল প্রভুপাদের যুগল চরণের ছাপ। মধু মৃতপুত্রের সর্বাঙ্গে এঁকে দেয় তিলক-রেখা। কণ্ঠে পরিয়ে দেয় জপের মালা। মুখে দেয় গঙ্গা জল। ওর হয়ে আগে একাজ নিবারণেরই করার কথা ছিল। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় ওকেই আগে করতে হচ্ছে। বেশ তো তাই হবে। পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে একমাত্র পুত্রের শ্মশান কার্য করে ঘরে ফেরে মধু। কিন্তু পরদিন সকালে আর নিজের ঘরের দরজা খুলতে পারে না। রুদ্ধ অশ্রু উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। রাধারমণজীর চরণতলে বসে আকুল হয়েই কাঁদতে থাকে মধু।

পুত্র গেছে। চতুর্দিকে অভাব অনটন। ঘর বাড়িও গেলো। কিন্তু কর্তব্যের শেষ নেই। দুর্গা ময়নার ভরণ পোষণের ভার ওর। এ কর্তব্য পালন না করলে রাধারমণজীউ ওকে ক্ষমা করবেন না। তাই সব হারিয়েও আবার সব পাবার জন্য দীনুকে লিখতে বাধ্য হয়। যতদিন জীবন ততদিন কাজ করে যেতে হবে। আবার বাঁধতে হবে ঘর। যারা আশ্রিত তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে উপায় নেই।

প্রাণাধিক মধু-কীর্তনিয়ার পত্র পেয়ে দীনু স্থির থাকতে পারে না। জমিদারের কাছ থেকে যদি জমি পাওয়া না যায় ক্ষতি নেই। নিজের ওপর আস্থা রেখেই মধুকে আসতে লিখে দেয়। একবার শুধু পরামর্শ করে মিতা করিমের সঙ্গে।

করিম বলে, বল কি মিতা! এতবড় গুণীলোক আশ্রয়হারা হয়ে পথে পথে ঘুরবে! স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, বয়েসও ভাটির পথে। আমরা না দেখলে কে দেখবে মণ্ডলকে? তুমি লিখে দাও—দুজনে না হয় দু'বিঘে ক'রে জমি ছেড়ে দেবো।

দীনুর আমন্ত্রণ পেয়ে মধু চরেই আসে। সঙ্গে দুর্গা ময়না। সামান্য কিছু তৈজসপত্র। অনেকদিন পর কীর্তনিয়ার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। চরে এসে গত দু'বছর কার্তিক মাসে কীর্তনিয়াকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে দীনু। কিন্তু কীর্তনিয়া আসেনি। কেন আসেনি সেকথা আজ বুঝতে পারছে। পুত্রশোক মানুষকে বোধহয় এমনিই করে ফেলে। ডাক ছেড়ে যদি মণ্ডল কিছুদিন কাঁদতে পারতো তাহলে বোধ হয় ভাল ছিল। মণ্ডলের মুখের দিকে চাইলেই বুক ফেটে কান্না আসে। নীরবেই অভ্যর্থনা জানায় দীনু মধুকে। খবর পেয়ে করিমও ছুটে আসে। তিন গুণী একত্রিত হয়। হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে কারো কোন কথা ফোটে না। মধু যেন সকলকেই স্তম্ভিত করে ফেলেছে।

চরফুটনগরে চট করে জমি পাওয়া এখন আর সম্ভব নয়। রাখাল গোসাঁইকে দু'দশ টাকা দিয়ে কাজ হাসিল করার জোও এখন আর নেই। এখন জমি বিলির কর্তা স্বয়ং রমেন্দ্র নারায়ণ। জলো জমিই এখন বিলি হয় চড়া দরে। তদুপরি মোটা নজরানা। মধুর তো সম্বল বলতে কিছুই প্রায় নেই। টেনেটুনে শতাবধি টাকাও হবে কিনা সন্দেহ। এত অল্প টাকায় বাস ও চাষের জমি পাওয়া খুবই মুশকিল। গয়নাগাটি বেচলে অবশ্য আরো শ দুই টাকা হতে পারে। কিন্তু মোক্ষদার যা কিছু ছিল সে সবই তো দুর্গাকে ও দিয়ে দিয়েছে।

এখন দুর্গার কাছে কি করে এ প্রস্তাব করা যায়? এ অঞ্চলে পালাগান গাইতেই বা ওকে কে ডাকবে? দশ পাঁচ টাকা হয়তো তা থেকেও আসতো। আবার খেতে পরতেও কম টাকা লাগবে না। দীনু বৈরাগী অবশ্য যথেষ্ট সম্মান দিয়েই তার বাড়িতে রেখেছে। বৈরাগী বউয়ের যত্ন-আত্তিরও ত্রুটি নেই। ময়নাকে তো নিজের মেয়ে করেই নিয়েছে কুসুম। দক্ষিণ কোণের বড় ঘরখানাই ছেড়ে দিয়েছে ওদের তিনজনকে থাকার জন্য। কিন্তু হলে কি হবে! যত আদর আপ্যায়নই হোক—মানুষ অন্যের ঘাড়ে চেপে ক'দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে? মধুর খাওয়া পরার ত্রুটি নেই। কিন্তু মনে সুখ নেই। রোজই এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়ায়। ফাঁক ফুঁক দেখলে জমির দর জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ট্যাঁকের কড়িতে নাগাল পায় না। দীনু করিম আসরে বসে সান্ত্বনা দেয়, ঘাব্‌রান ক্যান মণ্ডলের পো? বিপদে যিনি ফেলচেন তিনিই কূল দিব।...

কূল সত্যি সত্যি একদিন পায় মধু। চরের পশ্চিমদিক ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। রামকান্তকে ধরে অনেক তোষামোদের পর বিঘা-তিনেকের মতো একটু সুবিধাতেই পাওয়া যায়। উঁচু দিকটায় একখানা চালা বেঁধে দিন কোন রকমে কাটানো যাবে। পলি যদি ধরা যায় তাহলে চাষাবাদেরও কিছুটা সুবিধা হতে পারে। হাতের সর্বস্ব পণ করেই জমিটুকু কিনে ফেলে মধু। দীনু করিমের সম্মতি নিয়েই কেনে। ওরা ছাড়া এ চরে কে আর ওর আপনজন আছে? মোহনপুরের জলো জমি বিক্রি করে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। হাতেও জমানো ছিল গোটা চল্লিশেক টাকা। বাকীটা নিবারণের মার খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার বেচে হয়েছে। বুদ্ধিমতী দুর্গাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে হয়নি। নিজের থেকেই ও ঝাঁপি খুলে শ্বশুরের হাতে গুঁজে দিয়েছে সব। শাশুড়ীর ছাড়া নিজের গলার সোণার হারছড়াও দিয়েছে। নইলে তিনশ টাকা হলো কি দিয়ে?...স্বামী হারিয়েছে নিজের নিদানের সম্বলও খোয়ালে বেচারা। বুকের পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যায় মধুর। তবু ওকে কঠিন হয়েই হাত পেতে সব নিতে হয়। ভিটে না হলে দাঁড়াবে কোথায়?...জমির দাখিলাখানা কোঁচার খুঁটে বেঁধে চোখের জল মুছতে মুছতেই কাছারি থেকে বেরিয়ে আসে।

দীনু সান্ত্বনা দেয়, কাইন্দেন না মণ্ডলের পো। তিনির কৃপা অইলে সব পাইবেন। ছ্যাহেন নাই, কি ফাপরে পড়চিলাম? আপনাগ আশীর্ব্বাদে দয়াল চান বাচাইয়া রাখচে ত। প্যাট ভইরা এহন দুইডা খাইবার পারচি ত।...

পাষাণে বুক বেঁধেই চরে ফিরে আসে মধু। দীনুর পরামর্শ মতোই পলিধরার

কাজে মন দেয়। পাটকাটির বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে ছোট্ট একখানা ডেরা বাঁধে অপেক্ষাকৃত উঁচু অংশে। দীনু বাধা দিয়েছিল, এবারের বর্ষাটা ওর বাড়িতেই কাটিয়ে যেতে। কুসুম তো কিছুতেই ছাড়বে না। এক রত্তি ময়না। ভিজে মাটিতে অসুখ করে যদি! কিন্তু সব চেষ্টাই ওদের নিষ্ফল হয়। নিজের ভিটের চেয়ে স্বর্গও মধুর কাছে বড় নয়। ময়নার কোন অসুখই ওখানে করতে পারে না। উঁচু করে মাচা বেঁধেচে। ভিজে মাটিতে কি করবে? তাছাড়া চর ছেড়ে তো আর কোথাও যাচ্ছে না। যখন খুশি কুসুম ওকে দেখতে পারবে। হৃদয়ের আবেগ দিয়েই সকলকে বোঝাতে সক্ষম হয়। দীনু কুসুম গুছিয়ে দেয় ঘর-গৃহস্থলী।

ভক্তের ফাঁদে পা রাখেন মা লক্ষ্মী। দু'বছরের বর্ষায় বেশ পুরু হয়েই পলি ধরা পড়ে। সামান্য জমি। ধান পাটের চাষ এখনো সম্ভবপর নয়। মুগ-কলাই যা ওঠে তার সঙ্গে দুটো দুধেল গরু পুষে দিন কেটে যাচ্ছে। মধুর দেখা-দেখি আরো কয়েক ঘর এ অঞ্চলে সমানে যুঝছে। সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম পাড়াও দিন দিন বেশ পুষ্ট হয়ে উঠছে। মধুর চেয়ে জমির পরিমাণ অনেকের বেশী। লোকবল অর্থবলেও অনেকেই বড়। তবু এ-পাড়ার মাতব্বর মধুই। মধুর নাম অনুসারেই পাড়ার নাম মণ্ডলপাড়া। সকলে খুশী হয়েই এ-নাম ধার্য করেছে। টাকাই তো মানুষের জীবনের একমাত্র কথা নয়। মধুর মতো এমন শিষ্টাচারী মানুষ চরে ক'জন আছে? অষ্টপ্রহর ভজন-পূজন নামগান করে। কোনরূপ মিথ্যা বজ্জাতীর মধ্যে কখনো থাকে না। কারো সঙ্গে স্বার্থ নিয়েও কখনো ঝগড়া করে না। এমন মানুষ মাতব্বর হবে না তো কে হবে?

বছর পাঁচেক বয়েস ময়নার। মাত্র দু'বছর চরে এসেছে। কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ছোট বড় সকলকেই ও মায়ায় ফেলেছে। এপাড়া ওপাড়া সর্বত্র ওর অবাধ গতি। সকলেই ওকে ভালবাসে—স্নেহ করে। গায়ের রংটা একটু কালো। কিন্তু এ কালো যে জগতের আলো। কি সুন্দর টানা টানা চোখ জোড়া! কুসুম একদণ্ডও ওকে চোখের আড়াল করতে পারে না। নিজের পেটের মেয়ে নেই কুসুমের। বড় ছেলের বউ পার্বতী সে খেদ অনেকটা পূরণ করেছে। কিন্তু ময়নাকে পেলে বোধ হয় সে সাধ ওর ষোলকলায় পূর্ণ হয়।

নিশি অপেক্ষা ময়না বছর তিনেকের ছোট। তবু গলায় গলায় ভাব দু'জনার। একসঙ্গে খেলা করে একসঙ্গে খায়। কুসুম একবাটিতে দুধভাত মেখে দুজনকে

নিজের হাতে খাইয়ে দেয়। দুষ্টুমী করলে জুজুবুড়ীর ভয় দেখায়। রূপকথার গল্প বলে বলে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। দু'বছর তো ওর কাছেই আছে ময়না। বাড়িতে মা দাদুর কাছে আর কতক্ষণ থাকে? শুধু যা রাতটুকু। ভোর হতে না হতেই আবার ছুটে আসে নিশির খোঁজে। কুসুমের মনে হয়, নিশির বাপ তো দিনরাত ছোট পোলার বিয়ের জন্য পেড়াপীড়ি করছে। তা মন্দ কি, ময়নার সঙ্গে নিশির বিয়ে হোক না? এমন মেয়ে খুঁজলে ক'টি মিলবে ওদের সমাজে?...আবার ভাবে, না এত ছোট বয়সে বিয়ে দিয়ে কাজ নেই। এখন বিয়ে দিলে নিশির আর লেখাপড়া কিছুই হবে না। হলোই বা চাষার পোলা, সামান্য পুথিপত্রখানা লিখতে পড়তে না পারলে পুরুষ মানুষের চলে কি করে? আর না হোক, করে-কম্মে খেতেও তো মোটামুটি হিসেবের প্রয়োজন। অশ্বিনীর তো কিছুই হলো না। দিনরাত কেবল হালের গুটিই ঠেলছে। না না, বিয়ে এখন কিছুতেই হতে পারে না। দিব্যি দুটিতে মনের আনন্দে হেসে খেলে কাটাচ্ছে। বিয়ে দিলেই তো ময়না কলাবউ হয়ে ঘরে ঢুকবে! তাছাড়া ঠাকুর করলে এ-বিয়ে তো হয়েই আছে। মণ্ডল কীর্তনিয়ার সঙ্গে তো গলায় গলায় ভাব পোলার বাপের। কেউ কারো কথা ফেলতে পাববে না। নিশি এখন দিন কতক পড়াশুনো করুক। ময়না যেমন আছে থাক।...

ময়না প্রত্যহ বৈরাগী বাড়িতে আসে। সময়ে নিশিও মণ্ডল বাড়িতে যায়। দুর্গার বড় ভাল লাগে নিশিকে। কি সুন্দর নিটোল স্বাস্থ্য। গায়ের রং তো রীতিমতো ফর্সা। দোষের মধ্যে মাথায় একটু খাটো। তা ওর ময়নাও এমন কিছু ধেরাং লম্বা নয়। বৈরাগীরা বড় লোক। নয়তো ঘরে জামাই আনতে হলে এমন জামাই-ই কাম্য। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখে দুর্গা। নিজের শ্বশুরকে পর্যন্ত বলতে ভরসা পায় না। বরাত তো সব দিক থেকেই মন্দ। বৈরাগী-গিন্নী কি আর তার কোলের পোলার বিয়ে কালো মেয়ের সঙ্গে দেবে? তা রং যতোই ময়লা হোক দেখতে ময়নাও ফেলনার নয়। নাক, মুখ, চোখ, ভুরু, চুল সবই তো নিখুঁত সুন্দর।...অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে দুর্গা নিশির দিকে। বাড়িতে এলে কিছু না কিছু ওকে খেতে দেবেই। নিশি কখনো একা খায় না। বেশীটাই ময়নাকে দিয়ে দেয়। তারপর, পরস্পর পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে পড়ে। কখনো বা ধলেশ্বরীর চড়ায় কখনো বা মাঠে ঘাটে। দেখে দেখে মধুও হাসে। বুকভরা আশা নিয়েই ভাবে, এখন যা ছেলেখেলা, দুদিন বাদে তাই হবে হয়তো জীবন-সত্য। মানুষ তো এমনি

করেই পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ে। মায়া—সব মায়া। রাধারমণ সুখে রাখুন ওদের।···

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল মাথায় ময়নার। দু'বছর চরে এসে খাসা গোলগাল হয়েছে। রূপোর দু'গাছা মোটা বালা সুডোল দুই বাহুতে। পায়ে বল দেওয়া খাড়ু। ঝুমুর ঝুমুর শব্দে এবাড়ি ওবাড়ি আসে যায়।

সেদিন দাওয়ার ওপর বসে একটা পেয়ারা খাচ্ছিল নিশি। ময়না হন্তদন্ত হয়ে কাছে ছুটে এসে বায়না ধরে, এই নিশা, হব্রি-আম দে ?

দাঁত খিঁচিয়ে উত্তর করে নিশি, অস আমার অল্লাদিস, হব্রি-আম দিব অরে! যা যা, ছাই দিমু তরে।

কি কলি, ছাই দিবি! দাঁড়া তর মজা দেহাই, রাগে গজ গজ করতে করতে দুপা এগিয়ে যায় ময়না।

হ, এইডা দিমু তরে—ছোঁচা কোহানকার, জিভ ভেংচিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় নিশি—।

ময়না আরো খানিকটা কাছে এসে উল্টো ভেংচি কাটে ঃ

নিশি ঋষি ভাঙা শিশি—
কান মইলা দেয় পদ্মা পিসি।

দ্যাখ রাইক্ষসী, তীব্র প্রতিবাদ করে নিশি।

কি দেখবরে, বলতে বলতে এসে এমন জোরে ধাক্কা মারে যে বেচারা নিশি ডিগবাজী খেয়ে মুখ থুবড়ে উঠোনের ওপর গিয়ে পড়ে। ময়না একটু দূরে সরে গিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে থাকে।

খুব লাগে নিশির বাঁ হাঁটুতে—নাকের ডগায়। তবু মনের রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে উঠে এসে ময়নার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কচ্ করে কামড়ে দেয়।

যন্ত্রণায় ডুকরে ওঠে ময়না। হেঁশেল থেকে ছুটে আসে কুসুম। সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে ক্ষতস্থানে। নিশি সামনেই দাঁড়িয়েছিল। ওর দু'গালে দুটো ঠোকনা দিয়ে ধমকাতে থাকে।

বেচারা নিশি, থ বনে যায়। ওকে যে আগে ধাক্কা মারলে সেকথা একবারও বলছেন না উনি। ঠোঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে কেঁদেই ফেলে।

অতি রাগেও হাসি পায় কুসুমের। কোন রকমে নিজেকে চেপে পুনরায় হেঁশেলের ভেতরে যায়। একটা বাটিতে করে তাড়াতাড়ি খানিকটা দুধের সর

তুলে নিয়ে আসে। দুজনকে কাছে বসিয়ে ভাগ করে খাইয়ে দেয়। মিটমাট হয়ে যায় ঝগড়া। তক্ষুনি দু'জন দুজনের গলা জড়িয়ে ধরে ছোটে ধলেশ্বরীর বাঁকে।

এমনি দিনে দশবার ভাব দশবার আড়ি। মনে মনে হাসে কুসুম। নিজের বাল্যস্মৃতি মনের কোণে উঁকি মারে। একরত্তি মেয়েই বৈরাগী বাড়িতে এসেছিল। নিশির বাপের সঙ্গে ঝগড়াও বড় একটা কম হয়নি। তবু তো···

মধুর যত না বয়েস পুত্র-শোকে তার চেয়ে বেশী কাবু হয়ে পড়েছে। পালা গান করতে গিয়ে এখন আর দম পায় না। আসরে উপস্থিত থাকলেও প্রধান দোহার বৃন্দাবনই এখন মূল গায়েনের কাজ করে। ভাবাবেগে কখনো-সখনো দু'একটা কলি ধরে টান দিতে গিয়েও অস্থির হয়ে পড়ে। কাশির দমকে দম আটকে আসে। কখন কি হয় বলা যায় না। ময়না তো সাতে পা দিলে। পিতৃপিতামহের ধারা বজায় রেখে কাজ করতে হলে এই-ই বিয়ের উপযুক্ত বয়েস। আটের ভেতরে গৌরীদান করতে না পারলে সাতপুরুষ নরকে যাবে।···দীনুর বাড়ি কীর্তনে এসে মধু আজ একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ে। আসরের আর কেউ তখনো এসে জড় হয়নি। তামাক খেতে খেতে একটু জোর দিয়েই দীনুর নিকট কথাটা পাড়ে মধু, পুত্রা, ময়না নিশির চাইর হাত এক কইরা ছাও। আমার শরীলের অবস্থা ভাল না।

দীনু হাসতে হাসতে হুকোটায় টান দিয়ে উত্তর করে, ঘাবড়াও ক্যান ভালই, সব ত ঠিক অইয়াই আচে? দয়াল চান করলে এত শিগ্গীর আর তুমি আমাগ ছাইরা যাইবার পারবা না। আর কয়ডা দিন সবুর কর। নিশার মায় যে আবার হ্যার পোলাগ ভদ্দর নোক বানাইবার চায়?

হ, নিশি ত দেহি রোজই গঞ্জের ইস্কুলে যায়। তা শিকলনি কিছু?

হ্যা কতা অর মায়রে জিগাইয়। চাষার পোলার আবার নেকাপড়া! আরে বাবা, একটু ধম্মে কম্মে মতি থাকলেই অইল। নেকাপড়া শিকা আমাগ কি অইব?

মধু বাধা দেয়, না না পুত্রা, ওকথা কইয় না। গ্যাহ না, ভাগবতখানা পড়বার গেলেও নেকাপড়া জানা চাই, দু'হাত কপালে তুলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মধু।

হ, তা পারলে ত বালোই অয়। এহন তোমাগ দশজনের আশীর্ব্বাদ।
তা তুমি দেইখা নিয়, তোমার ও পোলা একজন অইব।
কথা আর বেশীদূর এগোয় না। ইতিমধ্যে আসরের আরো অনেকে এসে জড় হয়। সংসারের চিন্তা ছেড়ে কীর্তনেই মন দেয় উভয়ে।

॥ ১০ ॥

নিশির ওপর কড়া নজর কুসুমের। চেষ্টা যত্নের ত্রুটি নেই। মনের কোণে স্বপ্ন-মায়া। পাঠশালার সময় এগারোটায়। নিশিকে ডিঙিতে উঠতে হয় দশটায়। কুসুম ন'টার মধ্যেই খাইয়ে দাইয়ে বই শ্লেট গুছিয়ে দেয়। চরের আরো চার পাঁচটি ছেলে যায় নিশির দেখাদেখি। বড় বড় হরপের ওপর হাত ঘুরোয় নিশি। স্বরবর্ণ পরিচয় হয়ে গেছে। ব্যঞ্জনবর্ণও সোজাসোজি পড়তে পারে। তবে উল্টো-পাল্টা ধরলে বলতে পারে না। কুসুমের আনন্দ আর ধরে না। ওর কল্পনা অঙ্কুরিত হয়েছে। দয়াল হরি দয়া করলে নিশি মানুষ হবে। বাবুভুইঞাদের মতোই কথাবার্তা বলতে পারবে! চিঠিপত্র লেখাতেও আর অন্যকে তোষামোদ করতে হবে না।···স্বপ্নে স্বপ্নে বিভোর হয় কুসুম। ঠাকুর যদি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন তাহলে সোয়া সের বাতাসার হরিলুট দেবে। সন্ধ্যায় তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে এসে গলবস্ত্র হয়ে মানত করে।

বছর খানেকের ভেতর থিতিয়ে থিতিয়ে—'অজ, আম, ইট, ইহ···' পড়তে পারে নিশি। এখন আর ওকে তাড়া দিতে হয় না। পাঠশালার আকর্ষণ এখন ওর সবচেয়ে বেশী। সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত ক্লাস। দশটায় রওনা হয়—ফেরে বিকেল ছ'টায়। এই সুদীর্ঘ সময় ময়নার আর কাটে না। ইস্, সূর্যি যে ডুবু ডুবু! কখন নিশি আসবে—কখন ওরা খেলা করবে! একবার বাড়ি একবার ঘাট, ময়নার আর স্বস্তি নেই। ডিঙি ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে নিশির গলা জড়িয়ে ধরে। কুসুম দুজনকে একসঙ্গে বসিয়ে দুধভাত খাইয়ে দেয়। নিশির শুষ্কমুখে হাসি ফোটে। শুরু হয় মজার খেলা। ময়না হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ওকে ধলেশ্বরীর বাঁকে। জলের ওপর থপ্ থপ্ করে পা ফেলে দু'জনে পার হয়ে যায় ওপারে। চড়ার ওপর দাগ কেটে কেটে মস্তবড় একটা বাড়িই তৈরি করে ফেলে ময়না। পরিশ্রমে গলা শুকিয়ে

কাঠ। গিন্নীর মতো সুর নিয়েই আব্দার করে, এই নিশা, একটা কুয়া খোদ। আমি জল খামু।

নিশির হাসি পায়। সমতা রেখেই জবাব দেয়, জল খাবি গাঙের ঘাটে যা না।

না, আমি কুয়ার জল খামু, ময়নার বায়না বেড়ে যায়।

ঠিক খাবি ত? নইলে কইলাম মজা দেহামুনে।

তুই খুইদাই ছাখ, খাই কিনা?

কথায় কথায় ছোট্ট একটা কুয়ো খুদে ফেলে নিশি। বেশী গভীর না হতেই বালি চুইয়ে জল বেরুতে থাকে। নিশি উল্লাসে হাঁক ছাড়ে, এই মইনি, জল খাবি আয়।

অন্যমনস্কভাবেই উত্তর করে ময়না, বারে, আমি বলে এহন রাঁনবার নৈচি!

কি, তুই জল খাবি না? ক্রোধে গর্জে ওঠে নিশি।

না, আমি খামু না, ঠোঁট উল্টিয়েই উত্তর করে ময়না।

তবেরে রাইক্ষসী, ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনে নিশি ময়নাকে কুয়োর কাছে।

ময়না দৃঢ় থেকেই শাসায়, ছাড় বলচি? বালো অইব না কইলাম।

কি বালো আইব না ল?

ছাড় বলচি?

আগে তুই জল খা?

না, আগে তুই ছাড়?

ছাড়লে খাবি ত?

হ, খামু।

নিশি ছেড়ে দেয় চুলের মুঠি। ময়না এক লহমায় কুয়োর ওপর উপুড় হয়ে দুহাতে কাদা জল ছিটাতে থাকে। নিশির গা, মাথা, কাপড় মুহূর্তে কাদা মাথামাখি হয়ে যায়। দিশেহারা হয়ে ময়নাকেও ও জোর করে ধরে কুয়োর মধ্যে চুবিয়ে দেয়। ছুটে গিয়ে পা দিয়ে ভেঙে দেয় ওর তৈরী ঘর-বাড়ি। সারা চরময় চলে দু'জনের দৌড়ঝাঁপ ছুটোছুটি। সন্ধ্যা হয় হয় ভয়ে দুজনেই কাঁপতে থাকে। এভাবে বাড়ি ফিরলে কারো আর রক্ষা থাকবে না। ভেবে-চিন্তে ধলেশ্বরীর স্বচ্ছ জলে গিয়ে নামে। উভয়ে উভয়ের গা, মাথা, কাপড় পরিষ্কার করে ধুইয়ে চুপি চুপি বাড়ির দিকে রওনা হয়।

নিশির দেখাদেখি ময়নাও বায়না ধরে পাঠশালায় যাবে। বুড়ো দাদু মধু আব্দার শুনে হাসে। তবু আদরের নাতনীর মর্জি মাফিক বই, শ্লেট, পেন্সিল কিনে দেয়। দিন তিনেক ডিঙ্গিতে চড়ে যায়ও ময়না গঞ্জের পাঠশালায়। নিশির ভারি মজা লাগে। কিন্তু গুরু মহাশয় রাজী হন না। মেয়েদের সময় সকালে। পড়তে হলে ময়নাকে সকালেই আসতে হবে। একত্র পড়া চলবে না। একা একা যেতে আর উৎসাহ বোধ করে না ময়না। দিন কতকের চেষ্টায় দাদুর কাছেই বর্ণ পরিচয় হয়ে যায়। নিশির চেয়ে ময়নার মাথা ভাল। নিশি এক বছরে যা শিখেছে ময়না ছ'মাসেই তা শিখে ফেলে। নিশিকে নিয়ে কুসুমের উৎসাহ দমে যায়। ছেলের চেয়ে ছেলের বউ বেশী লেখাপড়া শিখবে নাকি ? কাজ নেই আর কারো লেখাপড়া শিখে। পুথি পাঁচালি তো নিশি এক রকম পড়তেই পারে। পুরুষ মানুষের এখন কাজ-কর্ম শেখা দরকার। সংসারও এখন বেশ বড় হয়েছে। একা পার্বতীকে দিয়ে আর চলছে না। ময়নাও সংসারে আসুক। মেয়ে মানুষের ধিঙ্গীপনায় কোন লাভ নেই। বয়েস তো শুনছি সাত পেরিয়ে চললো। এই তো বিয়ের উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তো ও বৈরাগী বাড়ির হেঁশেলে এসে ঢুকেছে...নিশি ময়নার বিয়ে দিতেই উদ্যোগী হয় কুসুম। প্রস্তাবটা দীনুর নিকট পেশ করতেই দীনু দাঁত বার করে হাসে। বলে, কি গ পোলার মা, তোমার পোলারে না ভদ্দর নোক বানাইবা ?

কথাটা কুসুমের ভাল লাগে না। তবু নিজের পক্ষ সমর্থন করেই উত্তর করে, হ, ভদ্দর নোক ত বানাইচিই। চ্যাষ্টা করচিলাম বইলাই না নিশা এহন বই পড়বার পারে। তোমাগ বংশে কেরা কবে লেকাপড়া শিখচিল ?

হ হ, তাত ঠিকই। তবে ভয় পাইলা ক্যান ?

ভয় আবার পামু ক্যান ? বই পড়বার শিখচে এহন কাম শিকুক।

আমাগ মতন অশিক্ষিতের কাছে কাম শিকলে কি আর কাম করবার পারব ? তার থনে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দ্যাও, শিক্ষিত অইয়া আইব।

কতায় কতায় বাপের বাড়ির খোঁটা দ্যাও ক্যান তুমি ? তারা কি কেউ তোমাগ খাইবার পরবার আহে ?

না, খোঁটা আবার দিলাম কই ? তাগ গুণগানই ত কল্লাম !

তাগ গুণগান করনের আর কাম নাই। সামনের হাটেই ময়নার লেইগা গয়না গড়াইবার দ্যাও। তালইর যদি অমত না অয় তাইলে সামনের মাসেই আমি নিশির বিয়া দিমু।

মহু তালইত এক পায়ে খাড়া। তুমিই ত পোলারে ভদ্দর নোক বানাইবার চাইচিলা।

হ, আমি ত মোন্দ মানুষ, মোন্দ কামই করচি।

মোন্দ কাম আর কি করচ! তবে আমারেই যা মোন্দ করচ, হাসতে হাসতেই কুসুমের আঁচল টেনে ধরে দীনু।

কি ঘিন্না! বুইড়া মদ্দারে ভীমরতিতে ধরচে নাকি! আঃ ছাড়, ঐ যে নিশা আসচে?

দীনু আঁচল ছেড়ে পুনরায় হুঁকোয় মন দেয়।

করিম ফকির বা'র বাড়ির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছে। নিশির সংবাদে হুঁকো হাতেই সেদিকে এগিয়ে যায় দীনু।

॥ ১১ ॥

পাঠশালা ছেড়ে কাজে ভর্তি হয় নিশি। হাল-গরু নিয়ে নিয়মিত মাঠে যায়। দীনু অশ্বিনী ক্ষেতের কাজ করে। নিশি কমলীকে নিয়েই ব্যস্ত। সঙ্গে থাকে আরো একপাল গরু বাছুর। মাস তিনেক হয় একটি বাচ্চা হয়েছে কমলীর। কালোর ওপর সাদা ছিট ছিট—হৃষ্টপুষ্ট হাম্বা। মায়ের বাঁটের অঢেল দুধ খেয়ে প্রাণ চঞ্চল। লেজ তুলে একবার এমাথা ওমাথা ছোটে আবার তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে এসে মায়ের বাঁটে মুখ লাগায়—মাথা দিয়ে গুঁতোতে থাকে বাঁটে। কিন্তু অসময়ে মধুভাণ্ড রুদ্ধ। বিরক্তিতে লেজের ঝামটায় ফুঁসে ওঠে কমলী। তাড়া খেয়ে হাম্বা ছুট দেয়। আবার আসে।

নিশিও বাটি ভর্তি কমলীর দুধ খায়। অটুট স্বাস্থ্য। বাবরি বাবরি চুল মাথা ভর্তি। বড় সুন্দর লাগে ওকে দেখতে। ব্রজের মহাজনেরা বোধ হয় অতীতে ওর মতোই আর একটি রাখাল বালককে দেখে লীলা কীর্তন কেঁদেছিলেন।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পান্তা খেয়ে মাঠে আসে নিশি। পরনে আধ ময়লা একখানা আটহাতি লাল পাড় ধুতি—খালি গা। ডান হাতে গরু তাড়াবার নড়ি। বাঁ হাতে বাঁশের বাঁশী। অশ্বিনী ভাল বাঁশী বাজাতে জানে।

নিশি দাদার কাছেই বাঁশী শিখেছে। কিন্তু ওর মুখের বাঁশী যেন কথা বলে। ব্রজ-রাখালই যেন বাজায় বাঁশী। উদাস প্রাণ মাতানো সুর-লহরী। নিজের সুরে নিজেই তন্ময় হয়ে পড়ে নিশি। রোদে ক্লান্ত হয়ে পডলেই ছুটে আসে বুড়ী বটের ছায়ায়। ঝিরঝিরে বাতাসে খানিক গা এলিয়ে দিয়ে বাঁশীতে মুখ দেয়। এপারে তো কোন গাছ-ই নেই। তাই ধলেশ্বরী পার হয়ে ওপারেই যায়—চরখল্লার বুড়ীবটের ছায়ায়। ইচ্ছে হলে ডালে উঠেই বসে! উদাস সুর-ঝঙ্কার অনুরণিত হয় চরময়। ঘাস খেতে খেতে কমলী মুখ তুলে চেয়ে থাকে। হাম্বার লাফানোও থেমে যায়। কৃষাণরা কাজ করতে করতে দীনুকে লক্ষ্য করে মন্তব্য করে, মোড়লের পো, তোমার ঘরে কিষ্ট ঠাকুর আইচে—ছানা ননী খাওয়াইয়।...

বাঁশী দীনুর প্রাণেও সাড়া জাগায়। ছেলের জন্য গর্বই অনুভব করে। কে জানে, হতেও পারে। মানুষের বেশে তো ভগবান বারকয়েক এসেছেন এই ধরণীতে। হেসে হেসে জবাব দেয়, কিষ্ট না হউক, বাঁশী কেমুন শুনচ তোমরা ?

বালো— বালো। আর বাঁশী কানে আইলে সব কাম বুইলা যাই, উত্তর করে দীনুর সমবয়েসী এক চাষী।

আর একজন ধমক দেয়, তুমি কও কি মিয়া! অর বাঁশী হুনলে তো আমার বেশী কইরা কাম করবার ইচ্ছ করে!......

নিশির পাগল-করা বাঁশের বাঁশী ঘরে থাকতে দেয় না ময়নাকে। কোঁচড় ভর্তি গুড় মুড়ি নিয়ে চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় বুড়ীবটের ছায়ায়। মুখোমুখি বসে দু'জনে থাবায় থাবায় খায়। মনের আনন্দে গান করে—মাঠময় দৌড়ঝাঁপ। সময়ে পাকুড় পাতার মুকুট তৈরী করে পরিয়ে দেয় ময়না নিশির মাথায়। খেয়াল হলে নিশিও ধলেশ্বরীর বাঁক থেকে থোকা থোকা কাশ ফুল তুলে এনে ময়নার খোঁপায় গুঁজে দেয়। আবার কখনো বা গাছের ডালে উঠে পাশাপাশি বসে দুজনে। আপন খেয়ালেই একটা গৎ বাজিয়ে খানিকটা দম নিতে যায় নিশি। কিন্তু ময়না দমে না, বায়না ধরে, আর একটা—সেই :

"রাধে তোর তরে কদমতলায় বসে থাকি।
পরান আমার কাঁদে রাধে বিপিনে একাকী॥

আবার বাঁশীতে ফুঁ দেয় নিশি। আবার শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ময়নার বায়না বেড়েই চলে। একে একে তিন চারখানা গৎ বাজাবার পরও যখন ময়না থামে না তখন নিশির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। হাতের বাঁশী দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দেয় ময়নার পিঠের ওপর। ময়না ডুকরে ওঠে, ঝুপ করে ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

নিশির চোখ দিয়েও জল বেরুতে চায়। ময়নার হয়তো খুবই লেগেছে। নিজেও লাফিয়ে পড়ে ডাল থেকে। কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে, খুব লাগচে মইনি ?

যা, তুই আমার লগে কথা কইচ না, কাঁদতে কঁদতেই উত্তর করে ময়না।

কান্দিচ্ না। আর তরে মারুম না। এই বাঁশী ছুঁইয়া কই, নিশি ব্যাকুল ভাবেই সান্ত্বনা দেয়।

চোখ ঢেকেই জিজ্ঞেস করে ময়না, ঠিক কচ্ ত ?

হ, ঠিক কই।। আর কোন দিন তরে মারুম না।

ময়না ফিক করে হেসে ফেলে আবার বায়না ধরে, তবে আর একটা গৎ বাজা ?

নিশি আবার বাজাতে থাকে ঃ

রাধে তোর তরে ছল করে বাজাই বাঁশী।
জটিলা কটিলা আছে নয়ন জলে ভাসি ॥

দূর থেকে ওদের ছেলেখেলা দেখে দেখে অশ্বিনীর হাসিই পায়। আপন মনেই ভাবে, হ্যাঁ, ময়নাকে শিগ্‌গীর পার্বতীর জা করে ঘরে নিতে হবে। ওদের আর বেশী দিন দূরে রাখা ঠিক নয়......আশায় আনন্দে দিল ভরে ওঠে অশ্বিনীর। শক্ত করে হালের গুটি ধরে। হুঁকো টানতে টানতে দীনুও স্বপ্ন দেখে।

মা লক্ষ্মীর কৃপায় সংসারে এখন দু'পয়সা সঞ্চয় হচ্ছে। পঁচিশ ভরির ওপর রূপো দিয়ে গঞ্জ থেকে খাড়ু, বাজু, চন্দ্রহার তৈরী করে আনে দীনু ময়নার জন্য। এখন বাকী কোমরের বিছা, নাকছাবি, আর হাতের রুলি। কুসুম গামছার বাঁধন খুলেই দীনুর ওপর ফুঁসে ওঠে, কোলের পোলার বিয়া দিমু মুটে ঐ তিন পদ গয়না দিয়া নাকি ? তোমার আক্কল কি! ভাত খাও না ছাই খাও ?

দীনু হাসতে হাসতেই উত্তর দেয়, যা দ্যাও তাই খাই। তবে মহু তালইয় ত কিছু দিব।

হ্যায় গরীব মানুষ। দেয় দেউক—না দেয় না দেউক। আমি হ্যার ভরসায় থাকমু নাকি ? বাড়ি ভইরা ইষ্টি কুটুম থাকব। তাগ কাছে আমার নাক কাটা যাইব না !

বেগতিক দেখে দীনুও সায় দেয়, হ হ, তুমি ঠিকই কইচ। সামনের হাটে সব আনন যাইব। এহন খাইবার দ্যাও। বড় খিদা পাইচে।

আনন যাইব না। আনন লাগবই। আর নাকছাবিটা সোনার আনবা। কত আর দাম অইব ? আমি ঐডা দিয়াই বউয়ের মুখ দেহুম, হাটের সওদা গুছাতে গুছাতে পুনরায় ঝংকার তোলে কুসুম।

আইচ্ছা—আইচ্ছা—তাই অইব। তামুক কি অইল ? তাড়াতাড়ি তামুক দ্যাও এক ছিলুম।

আনচে তামুক ! বাবারে বাবা, কইলকার গোয়া আর জুড়াইবার পারে না, দিনের মদ্দে চৈদ্দ বার কইরা তামুক খাওয়ন !

কুসুমের কথা শেষ হতে না হতে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে হাজির হয় পার্বতী।

দীনু হাতে যেন স্বর্গ পায়। আর কোন কথা না বাড়িয়ে ফুরুক ফুরুক শব্দে অবিরাম টানতে থাকে।

কুসুম হাটের সওদা গুছিয়ে রেখে খাবার বাড়তে যায়।

সামনের মাসেই নিশির বিয়ে। কুসুম তাড়া দিয়ে বাড়ির উঠোনে আরো দু'খানা ঘর ওঠায়। ছোট ছেলের বিয়ে। বলতে গেলে এই তো শেষ কাজ। আত্মীয়-কুটুম কাকেও বাদ দেওয়া যাবে না। সকলে যদি আসে তাহলে উপস্থিত যা ঘর আছে তাতে কুলাবে না। কুসুমের ইচ্ছে, পাকা টিনের ঘরই হোক। কিন্তু দীনু সাহস পায় না। খাওয়া-দাওয়া বাড়ি খরচায় একগাদা টাকার দরকার। তাছাড়া গয়নাগাটিতেও নেহাত কম খরচা হলো না। এরপর আছে নিকট আত্মীয়দের ব্যবহারের কাপড়-চোপড় দেওয়া। নানাদিক ভেবে খড়ের ছাউনি আর চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে উঠানের ওপর দু'খানা কাঁচা ঘরই তোলে দীনু, বেশ বড়সড়। কুসুম এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। হাজার হোক, ও তো আর অবুঝ নয়। এই তো মাত্র বছর সাতেকের কথা জলের

ওপর ভাসছিল। ঠাকুরের অশেষ দয়া যে একটু কূল পেয়েছে। একা মানুষ, অতো না পেরে উঠলে করবে কি? খুব খুশী হতে না পারলেও বেশ যত্ন করেই কুসুম ঘর দু'খানার মেঝে লেপে পুঁছে তকৃতকে ঝকঝকে করে তোলে। মুড়ি ভাজা, খৈ ভাজা, হলুদ লঙ্কা কোটা—কোন কিছুই বাদ থাকে না। আর তো মোটে কয়েকটা দিন। তারপর সারা বাড়ি উৎসবে মেতে উঠবে। অশ্বিনীর বিয়েতে সখ আহ্লাদ কিছুই হয়নি। আত্মীয়স্বজনও কাউকে তেমনভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেনি। এবার সব সাধ—সব বাসনা ভালভাবেই মেটাবে। গোছগাছের কাজে সাহায্য করবার জন্য মাসখানেক হয় মাকে লোক পাঠিয়ে আনিয়েছে। বুড়ো মানুষ, বসে বসে নির্দেশ দিলেও অনেক সুবিধে হবে। নিজের পেটের দশটি ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কোন কিছুতেই ভুল হবার নয়। তাছাড়া নিশি তো আজীমা বলতে অজ্ঞান। একমাত্র আজীমা আর পার্বতীর কাছেই তো মনের কথা খুলে বলতে পারবে ও। আর তো সকলেই সম্ভ্রমের পাত্র। আজীমাকে অনেক আগে কাছে পেয়ে নিশিও বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

মধুরও তোড়জোড়ের অন্ত নেই। দীনুর সঙ্গে নিজের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে তো আর একমাত্র নাতনীর বিয়েতে চুপচাপ বসে থাকার জো নেই। মনের সাধ আহ্লাদকে তো আর সব সময় অবস্থার গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। ময়নাকে কেন্দ্র করেই ঘর সংসার। নইলে আর কিসের বন্ধন? যেদিকে খুশি চলে যেতে পারে। দুর্গা মা-কে নিয়ে তো কোন ভাবনাই নেই। ভোগ সুখ ত্যাগী—সন্ন্যাসিনী। ও আছে তাই। নইলে একাকিনী পথ চলতেও ভয় পাবে না দুর্গা মা।...নানাদিক ভেবে সাধ্যাতীত ভাবেই বিয়ের উৎসবে মাতে মধু। চরফুটনগরের মোড়ল দীনু বৈরাগী। তার কোলের ছেলের সঙ্গে ময়নার বিয়ে। দু'পক্ষেরই শেষ কাজ। বরযাত্রীর সংখ্যাও নেহাত কম হবে না। চরফুটনগরের সকলে তো আসবেই। তাছাড়া চরধল্লা থেকেও কেউ কেউ আসছে। বিশেষ করে পলান ব্যাপারী আর তার বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো নিশ্চয়ই। ব্যাপারীর সঙ্গে বৈরাগীর গলায় গলায় ভাব। তাছাড়া চরফুটনগরের নতুন কুটুম হয়েছেন ব্যাপারী সাহেব। ধরতে গেলে তো দীনুর নিজেরই মেয়ে মেহেরা। করিম আর দীনুতে হরিহর আত্মা। দীনুই তো মধ্যস্থ হয়ে কাজ করে দিলে। আর কেউ না আসুক মেহেরা তো আসবেই। বড় ঘরের বউ হয়েছে। ওর খাতির যত্ন না করলে চরের মান থাকবে না।

দিনের পর দিন ভেবে ঠিক হয়, আর যাই হোক, সকলের মুখ উঁচা রাখতে হলে গতানুগতিক ভাত-মাছ খাওয়ানো চলবে না। বৈরাগী তো শুনছি তিন মিঠাইয়ের ফলার দেবে। তা দিক, সে বড় মানুষ। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া চলবে না। কিন্তু এক পদ মিঠাই না খাওয়ালে কি

রসগোল্লা যদি না-ই পারা যায় অমৃতি তো করতেই হবে। সস্তায় বেশ খাবার। চরের মানুষ বড় বড় ঢাকাই অমৃতি খুবই পছন্দ করবে। সঙ্গে কান্দনী ঘোষের চন্দনচূড় দই। এতে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয় তবু করতে হবে। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলে ক্ষেত-খামার টাকা-কড়ির আর তেমন দরকারই বা কি। ওকে দিয়ে থুয়ে যা থাকবে তাই যথেষ্ট। তাতে যদি না চলে, দুর্গা মাকে সঙ্গে করে কোন তীর্থ ক্ষেত্রে গিয়ে থাকবে। সেখানে তো আর ভাতের অভাব হবে না। দু'বেলা নামগান করো—পেট ভরে প্রসাদ পাও।···মধু বাড়ি খরচ নিয়ে দীনুর সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করে তলায় তলায় রামকান্তর শরণাপন্ন হয়। করিতকর্মা রামকান্ত যেন হাতে আকাশের চাঁদ পায়। তার পরামর্শে কুমার বাহাদুর ক্ষেত-খামার বাঁধা রেখে নগদ দু'শ টাকা কর্জ মঞ্জুর করেন। রামকান্তর সঙ্গে চুপি চুপি একদিন কাছারিতে গিয়ে টাকা দু'শ নিয়ে আসে মধু। পথে পা দিয়ে মনটা একটু খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু মধু সে ভাবনাকে আমল দেয় নি। জীবনে কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেনি। দয়াল চানের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে এক বছরের শস্য বেচেই এ ঋণ শোধ দিতে পারবে। হাতে বিশেষ কোন টাকা ছিল না। নগদ দু'শ টাকার করকরে নোট পেয়ে উৎসাহ বেড়ে যায় দীনুর মতো মধুও ঘরদোরের কাজ গুছাতে থাকে।

প্রতিবেশীরা নিমন্ত্রণের জন্য দিন গুণতে থাকে। মোড়ল বাড়ির বিয়ে, শুধু শুধু মাছ ভাত কেউ খাবে না। কিন্তু কথাটা দীনুর কানে দেয় কে ? একমাত্র ভরসা রামকান্ত। সে বললে মোড়ল কিছুতেই তার কথা ফেলতে পারবে না। উৎসাহী জনকয়েক রামকান্তকেই ধরে। চরে তো এ পর্যন্ত কেউ পাকা ফলার দিলেই না। আর মোড়ল ছাড়া দেবার ক্ষমতাই বা কার আছে ? কথাটা রামকান্তরও মনে ধরে। প্রতিশ্রুতি দেয়, আজকের আসরেই সে উত্থাপন করবে।

সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠের পর খোল বাজিয়ে অনেকক্ষণ নাম সংকীর্তন চলে। আজকের আসর বেশ জমেছে। হরিলুটের ব্যবস্থার মধ্যেও আজ একটু নতুনত্ব রয়েছে। বাতাসার সঙ্গে কিছু ফল মিষ্টি। নিশির বিয়ে উপলক্ষেই দীনু এ

ব্যবস্থা করেছে। লুট হয়ে যায়। জয়ধ্বনির পর আসর ভাঙে ভাঙে, রামকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হাসতে হাসতেই আরম্ভ করে, আপনারা যাবেন না। দীনুকাকার কাছে আমার একটা আর্জি আছে। আপনারা বসুন।...

রামকান্তর চরিত্রে যত দোষই থাক ভাগবতের আসরে সে ভাব-গম্ভীর। কখনো কোনরকম বাচালতা করে না। কিন্তু আজকের তার এই বাচন ভঙ্গীতে দীনু একটু বিচলিতই হয়। হাঁ করে রামকান্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। জনতার মধ্যেও অনেকের অবস্থা তদ্রূপ। কেবলমাত্র যারা ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তারাই বসতে গিয়ে পরস্পর পরস্পরের গা টেপাটেপি করতে থাকে।

রামকান্ত সমতা রেখেই পুনরায় আরম্ভ করে, না না, চিন্তা-ভাবনা করবার মতো এমন কিছু আমি বলবো না মোড়লকাকা। তবে এঁরা সব বলছিলেন, নিশির বিয়েতে কেউ ভাত মাছ খাবে না।

হ হ তালই, তোমার কোলের পোলার বিয়াতে মিঠাই না খাওয়াইলে আমরা কেউ খামুই না, পড়শী মদন বিশ্বাস আরো জোর দিয়েই রামকান্তকে সমর্থন করে।

দীনু যেমন বিস্মিত হয়েছিল প্রস্তাব শুনে তেমনি খুশী হয়। তবু বিনয় সহকারেই আমতা আমতা করে বাধা দেয়, দশজনেরে মিঠাই খাওয়াইবার ভাগ্যি কি আমার অইব ?

না, অইব না! বলি বৈরাগীর পো, আমাগ এক প্যাট মিঠাই খাওয়াইলে আর তোমার গোলা ফুরাইয়া যাইব না, আবার নিজের কথায় জোর দেয় মদন।

দীনু মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। রামকান্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলে। পাল্টা রামকান্তকেও দু'চার কথা বলতে দেখা যায়। তারপর জাঁকিয়েই ঘোষণা করে রামকান্ত, আপনারা শুনে খুশী হবেন। মোড়লকাকা আপনাদের প্রস্তাবে রাজী আছেন। পদ হবে লুচি, অমৃতি, দৈ।

সমস্ত সভা উল্লাসে ফেটে পড়ে। ঘরের ভেতরে কুসুমের কানেও কথাটা পৌঁছোয়। ওর মতো খুশী বোধ হয় আর কেউ হয়নি। নিশির হাতে তাড়াতাড়ি বাটা ভর্তি পান সেজে পাঠিয়ে দেয় সকলের জন্য। এই তো শেষ কাজ। অশ্বিনী নিশি যদি বাঁচে, ঠাকুরের দয়ায় যদি ওদের ঘরে কাচ্চা-বাচ্চা হয় তবেই না আবার বাড়িতে ঢোল সানাই বাজবে! কিন্তু সে তো অনেক

পরের কথা। তদ্দিন কে থাকবে কে থাকবে না তা ঠাকুরই জানেন। ঐ তো পার্বতী এক ফোঁটা মেয়ে। ময়নাকে তো দুধের শিশু বললেই হয়। ওদের আবার ছেলে মেয়ে, তাদের আবার বিয়ে থা···না না, যা হয় এখনি হোক। নিশির বাপ তো আর বে-হিসেবী মানুষ নয়! কোমরের জোর বুঝেই চরসুদ্ধ লোককে মিঠাই খাওয়াতে চেয়েছে। ···পার্বতীর নাচতে ইচ্ছে করে। দয়াল হরি আবার তাহলে মুখ তুলে তাকালেন! আর তো মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই তো আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে যাবে। প্রত্যেকের পাত জুড়ে পরিবেশিত হবে সুগন্ধি গাওয়া ঘিয়ের গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন ভাজা। বেগুন আর ডাল নিজেদের ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু গোটা কয়েক ফুলকপি আর মশলাপাতি গঞ্জ থেকে নগদ পয়সায় আনতে হবে। হ্যাঁ, ফুলকপি চাই-ই। ফুলকপি কি জিনিষ তা এ তল্লাটের কেউ কোনদিন চেখেও দেখেনি। কি করে রাঁধতে হয় তাও কেউ জানে না। এই জিনিষই সকলকে পেট ভরে খাওয়াতে হবে। বাপের বাড়ির দেশে সইদিদির বিয়েতে সর্বপ্রথম খেয়েছে ও এই সুস্বাদু তরকারি। কি চমৎকার রান্না! গঞ্জের অমূল্যঠাকুর তো শুনি ভাল রান্না জানে। তাকে দিয়েই যত্ন করে রাঁধাতে হবে। মাছ দিয়ে কাজ নেই। মাছের বদলে ফুলকপিই হোক। শীতের নতুন তরকারি চরের মানুষ খেয়ে তারিফই করবে। তবে মিষ্টিই যদি খাওয়াবে বলে স্থির করে থাকে নিশির বাপ—তাহলে শুধু অমৃতি নয়। ছানার মিষ্টি এক পদ করতেই হবে। কলাইর ডাল আর চাল বাটার মিঠাই আবার একটা মিঠাই নাকি? কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে কখনো শুধু এ মিঠাই খাওয়াবে না। মানুষ তো আর দশ দিন ওদের বাড়িতে খেতে আসছে না! একদিন খাবে ভাল করেই খাক।····ভাবতে ভাবতে ডুবে যায় কুসুম স্বপ্ন-মায়ায়।

বাটা ভর্তি পান সুপুরি পেয়ে আবার সরগরম হয়ে ওঠে আসর। যাদের সম্পর্কে আটকায় না তাদের কেউ কেউ নিশিকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা আরম্ভ করে। কেউ কেউ কুসুমের সুগৃহিণীপনার তারিফেও পঞ্চমুখ হয়। মদন দীনুকে লক্ষ্য করে টিপ্পনী কাটে, কি তালই, আইজ থেইকাই জুলাপ নিমু নাকি?

দীনু মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে। নিশি পানের বাটা রেখে পালায়। রাত এগারোটা নাগাদ আসর ভাঙে। পাকা ফলার খাওয়ার আনন্দ বুকে করে পড়শীদের সকলেই গদগদ হয়ে বাড়ি ফেরে। একরাত্রের মধ্যেই সমস্ত চরময়

খবরটা রাষ্ট্র হয়ে যায়। স্বামী পুত্রকে রাত্রের ভাত বেড়ে দিতে দিতে সবিস্ময়েই ভাবতে থাকে গিন্নী-বান্নিরা, পাকা ফলার খাওয়ানো কি সহজ কথা! মুঠো ভর্তি টাকা চাই! বৈরাগীর না জানি কত টাকা হয়েছে! ···বিস্ময়ে আনন্দে যে যার মতে ঘুমিয়ে পড়ে। শুধু ঘুমোতে পারে না একজন। সে ক্ষ্যান্তমণি। খিটখিটে মেজাজ ক্ষ্যান্তর। বয়েস পঞ্চাশের ওপর, বালবিধবা। শুচিবাই। হাতে পায়ে থক থক করছে পাকুই হাজা। জলে নামলে উঠবার নাম নেই। চৌষট্টিবার ডুব দিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় নিশি কোমরে গামছা বেঁধে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। স্নানার্থি অনেকের গায়েই তাতে জলের ছিটা যায়। বিরক্ত হলেও মুখে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু ক্ষ্যান্ত গর্জে ওঠে, মর মর মুখপোড়া। যম তরে চখে দেখে নারে? মর মুখ পোড়া, মর,···নিশির মাথাটি পারে তো চিবিয়ে খায়।

ভরা কলসী কাঁকালে করে কুসুমও সে সময় জল থেকে উঠে আসছিল। ক্ষ্যান্তর গালাগালে থমকে দাঁড়ায়। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়ের প্রাণ টনটনিয়ে ওঠে। কলসীর জল ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে নিশির দু'গালে দুই ঠোকনা বসিয়ে দেয়। অন্য সকলে এসে না ধরলে হয়তো জলে চুবিয়েই ও মেরে ফেলতো নিশিকে। কেন ও যার তার সঙ্গে ঝগড়া বাধায়? রাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলে কুসুম। ক্ষ্যান্তর মুখে অনর্গল তুবড়ী ছুটতে থাকে। কুসুমের সাধ্য নেই ওর সঙ্গে ঝগড়ায় এঁটে ওঠে। অন্য দশজনেই যার যা মুখে আসে ক্ষ্যান্তর গালাগালের প্রত্যুত্তর দেয়। সেই থেকেই ক্ষ্যান্তর সঙ্গে কুসুমের কথা বন্ধ।

বন্ধ তো বন্ধ। ক্ষ্যান্ত কাকেও তোয়াক্কা করে না। বৈরাগী বউয়ের মতো অমন ঢের বড় মানুষ ওর দেখা আছে। ও কারো বাড়ি হাত পাততে যাবে না···

ছ'মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি একটি দিনের জন্যও বৈরাগী বাড়ি-মুখো হয়নি ক্ষ্যান্ত। ঘাটে পথে কুসুমের চোখে চোখেও কোনদিন চায় নি। কিন্তু আজ যে বড় বিপদ! আর ক'টা দিন পরেই তো পাকা ফলারের ধুম লাগবে বৈরাগী বাড়িতে। চরের সকলেরই নিমন্ত্রণ হবে। একা শুধু ও-ই যা বাদ যাবে। হায়রে কপাল! ঝগড়া কি কখনো পড়শীতে পড়শীতে হয় না! রাগের মাথায় না হয় দুটো কথা অন্যায়ই বলেছি, তাই বলে কি তার কোন ক্ষমা নেই! মাথার ওপর চন্দ্র সূর্য আছে। তারাই এর বিচার করবে। এত দেমাক

ভাল নয় ।···কথাটা কানে যাবার পর থেকে সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে ক্ষ্যান্ত ।

পরের দিন কুসুম জলের কলসী কাঁখে করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ক্ষ্যান্ত হুঁকোর গুলে দাঁত মাজতে মাজতে এসে হাজির হয়। বার বার তাকাতে থাকে তলচোখে। দেখে দেখে হেসেই ফেলে কুসুম। সাহস পেয়ে ক্ষ্যান্তই প্রথম মুখ খোলে, কিগ বইন্, তোমার ছোট পোলার বলে বিয়া ?

কুসুমও ঝগড়ার কথা ভুলে যায়। সোৎসাহেই উত্তর করে, হ দাদী, যাইয় কইলাম ? তোমরা পাঁচজনে না দেখলে আমারে আর কেরা দেখব ?

হ্যাহচে কি কয় ! আমাগ পাড়ার কাম আমরা না দেখলে কেরা দেখব ? বালোমোন্দ কিছু অইলে পাড়ার দুন্নাম অইব না !—একটু দম নিয়ে আবার আরম্ভ করে, তা নিশারে কয়দিন দেহি না ক্যান ? গাছ ভইরা হব্রিআম পাইকা রইচে। আইজ বিকালে পাঠাইয়া দিয় অরে।

কুসুম গদগদ হয়েই বাধা দেয়, না দাদী, অরে আর তোমরা আস্কারা দিয় না। তোমার গাছের ডালপালা ভাইঙ্গা কিছু রাখব না। বড় দুষ্ট ওডা।

তাই কি, পোলাপানে দুষ্টামী করব নাত কি করব ? তুমি আর বিকালে পাঠাইয়া দিয়।

আইচ্ছা, হাসতে হাসতেই কুসুম অগ্রসর হতে যায়।

ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়, পাকা ফলার নাকি দিবা ?

তাইত ইচ্ছা আচে। এহন ঠাকুর জানে কি অইব। কামের কয়দিন কইলাম বাড়িতে রানবার পারবা না। আমাগ ঐহানেই খাইয়া লইয়া কাম কুলাইয়া দেওয়ন লাগব।

আইচ্ছা আইচ্ছা, আমারে আবার নিমন্তন করবার কি আচে ? আমি ত গরের (ঘরের) মানুষই।

না, ও-কতা কইলে ছাড়ুম না। বিয়ার দিন হকালেই যাইবা। এহন আহি। নিশার বাপ আবার গঞ্জে যাইব। জিনিষপত্রের জায় দেওয়ন লাগব।

হ, যাও। যগ্যি কাম, মুকের কতা নয়। শরীল বালো থাকলে নিচ্চয় যামু।

শরীল বালো-মোন্দ বুজি না। যাওয়ন তোমারে লাগবই, ভিজে কাপড়ে সপসপ করতে করতে কলসী কাঁখে বাড়ি ফেরে কুসুম।

ক্ষ্যান্তর ঘাড় থেকেও একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে যায়। বাব্বা, কাল থেকে কি ভাবনাই না চলেছে! ঠাকুরের দয়ায় এখন পেটটা দুটো দিন ভাল থাকলে বাঁচি। সেই ছোটবেলায় একবার পাকা ফলার খেয়েছি আর এই বুড়ো বয়সে আর একবার সুযোগ আসছে…ক্ষ্যান্ত ঝটপট গিয়ে জলে নামে।

॥ ১২ ॥

সাতই অঘ্রান নিশির বিয়ের দিন। চৌঠো অঘ্রান গোপীনাথের আখড়ায় ভোগের ব্যবস্থা হয়। আধমণ চালের অন্ন-ভোগ। কেবল মাত্র সাধু সন্তদের নিমন্ত্রণ করা হবে। পঞ্চাশজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব প্রসাদ পাবেন। শ্রীধর খোলী, গোবিন্দ কীর্তনিয়া, অখণ্ড সাধু গাইবেন ভোগ-আরতি। মধু মণ্ডলও সদলবলে উপস্থিত থাকবে। সামান্য এই ব্যাপারে স্বজাতি জ্ঞাতি কুটুম কাকেও বলা হবে না। তারা সকলে পাকা ফলার খাবে বৌভাতের দিন। শুভকাজের আগে বৈষ্ণব-সেবা বৈরাগী বংশের রীতি। অশ্বিনীর বিয়েতে তো কেবল মাত্র নিয়ম রক্ষা হয়েছে। মাত্র পাঁচজন বৈষ্ণবকে সিধে দেওয়া হয়েছিল। সে তো গেছে এক চরম দুর্দিন। সখ আহ্লাদ তো দূরের কথা ভাল করে খাওয়া থাকার ঠিক ঠিকানাই ছিল না। আজ মা লক্ষ্মী কিছুটা মুখ তুলে চেয়েছেন। তাছাড়া এই তো শেষ কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনের সকল সাধ এবারেই মেটাতে হবে। কুলগুরুকেও বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। ফকির বাড়িতেও আসর বসছে আসছে পূর্ণিমার দিন। তার ঝাড় ফুঁকেই তো নিশি বেঁচে উঠেছে। দয়াল চানের দয়ায় এখন বেশ সবল সুস্থই আছে। কে ভেবেছিল নিশি বাঁচবে তার আবার হবে বিয়ে? রোগ বালাই তো জন্ম থেকেই লেগে থাকতো। সাতটি কড়ির বিনিময়ে ফকিরের কাছে বাঁধা আছে নিশি। ফকিরেরই ছেলে নিশি। যদি তার দয়ায় রক্ষা হয়। তিন বছরের রোগা ছেলে কোলে করে ফকিরের আসনের সামনে এসে বসে কুসুম। দু'চোখ দিয়ে টসটস করে জল ঝরে পড়ছে। ডাক্তার কব্রেজ সাফ জবাব দিয়েছে, আশা নেই। হাড় জিরজির করছে সারা অঙ্গে। মায়ের প্রাণ দণ্ডে দণ্ডে মরছে। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে পাঁচ পাঁচটাকে তো যমকে দিয়েছে। তবে কি নিশিও বাঁচবে না?…না বাঁচারই কথা ছিল। কিন্তু করিমের হাতে পড়ে সে-যাত্রা বেঁচে যায় নিশি। শুধু বেঁচেই যায় না, দেহও পুষ্ট

হতে থাকে। সেই থেকেই তো ফকিরের কাছে বাঁধা আছে। করিম বলে, দয়াল চানেরই ছেলে ও। দশ বছর পার হলে ফল-মিষ্টি দিয়ে ওজন দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ দশ বছর ভীষণ ফাঁড়া আছে।

দশ পার হয়ে বারোও পার হতে চলে। কুসুম ছাড়াবার কথা মুখেও আনে না। থাক না ফকিরের কাছে বাঁধা—তবু তো ছেলে ওর বেঁচে আছে! মায়ের বুক ঠাণ্ডা আছে!

বিয়ের আগে করিমই প্রস্তাব করে ছাড়িয়ে নিতে। আর কোন ভয় নেই। এখন চুল কাটতেও আপত্তি নেই। এ ক'বছর তো মাথায় ক্ষুর কাঁচি ছোঁয়ানোও নিষেধ ছিল। নিশির বিয়ে তো করিমের নিজের ছেলেরই বিয়ে। সুতরাং শুভকাজের আগে দয়াল চানের আসর তো বসবেই। সমস্ত রাত্রি গান হবে, একুশ মোমবাতি জ্বলবে, নানা উপকরণে হবে শিন্নী নিবেদন। তারপর ফল-মিষ্টি একদিকে আর একদিকে নিশিকে বসিয়ে ওজন দিতে হবে। আশ-পাশের আরো দশ বিশজন গুণীকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। সকলে মিলে এক সঙ্গে দয়াল চানরে ডাকবে। নিশির বিয়ে ধুমধামের সঙ্গেই হবে। আতসবাজীর ফোয়ারা ছুটবে। হাউই-এর রঙে আকাশে ফুটবে লক্ষ তারার কুসুম। সারা বাড়ি সারা চর ঝলমল করবে রংমশালের রোশনাইতে। শুধু ঢোল সানাই-ই বজবে না। ইংরেজী ব্যাণ্ডও বাজবে। পলান ব্যাপারী তার পোলার সাদীতে যে ব্যাণ্ড আনিয়েছিল তাই আসবে। ···আহ্লাদে ডগমগ করিম। মনের কথা একদিন দীনুকে খুলেই বলে।

সখ দীনুরও হয়। কিন্তু কোথায় পলান ব্যাপারী—আর কোথায় দীনু বৈরাগী! কিসে আর কিসে। পলান ব্যাপারীর সঙ্গে কি আর ওর তুলনা হয়? উচ্ছ্বাস চেপেই দীনু বলে, কি য্যান্ কও ফকিরের পো? ব্যাপারী সাবের লগে কি আর আমরা পাইরা উঠুম?

দীনুর উত্তরে করিমের টনক নড়ে। সে ঠিকই। চরধল্লার সমস্ত লোক অতিথিসহ তিনদিন সমানে ব্যাপারী সাহেবের বাড়িতে খেয়েছে। চরফুট-নগরের সকলেও স্ত্রী পুরুষ অতিথি অভ্যাগতসহ একদিন খেয়েছে। খাওয়া নয়তো যেন পেটে জ্বালা বাঁধা। মাছ, মাংস মিষ্টির বিপুল আয়োজন। মিতা দীনু আর কি করে পারবে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে। রূপোর গহনা ক'খানাই না হয় আমি দিয়েছি কিন্তু সোনার তিন পদ তো ব্যাপারী সাহেবই দিয়েছেন মেহেরাকে। গলার বিস্কুট হারছড়া পাঁচ ভরির কম হবে না।

অগুনতি পয়সার মালিক ব্যাপারী সাহেব। তার সঙ্গে কি আর আমাদের চরের মানুষের তুলনা হয়?...গলার স্বরটা একটু খাদে নামিয়েই করিম উত্তর করে, না পারি না পারুম। তাই বইলা সক আহ্লাদ করুম না নাকি বাপজানের সাদীতে?

হ, করবা। তবে ঢোল সানাই দিয়াই সারন লাগব।

ইস্, কি য্যান কও তুমি! ইংরাজী বাজনা তোমার আননই লাগব!

খালি বাজনাই হুনবা, খাইবা না কিছু?

খামু না ক্যান্? পাকা ফলারের জায় না তুমি ধইরাই থুইচ?

পাকা ফলারও খাইবা আবার ইংরাজী বাজনাও হুনবা?

হ, তাই খামু—তাই হুনুম।

তাইলে তোমার ঘরে সিঁদ কাটন লাগব।

পাইবা এই কলাডা, ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা উঁচু করে দেখায় করিম।

কথা আর উভয়ের মধ্যে এগোয় না। যাকে নিয়ে এতক্ষণ কথা হচ্ছিল সেই পলান ব্যাপারীই আজ একটু সকাল সকাল এসে হাজির হয়! প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যাবেলা আসে পলান। কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাণের আবেগে দয়াল চানরে ডাকে। পায়ের বেদনাটা এখন ঢের কম! অমাবস্যা পূর্ণিমায় একটু চাগাড় দেয় বটে। তবে করিম বলেছে, আসছে ধামাল উৎসবে বিশেষ ক্রিয়া করবে। আশা করা যায় সম্পূর্ণই সেরে যাবে। যদি যায় তো ভালই। না গেলেও ক্ষতি নেই। চলাফেরা এখন একরকম করে করা যাচ্ছে! উঠোনে পা দিয়ে করিমকে বুড়ো আঙুল উঁচাতে দেখে হাসতে হাসতেই রসিকতা করে পলান, ভর সাইন্‌জ্যা বেলাই (সন্ধ্যা বেলা) যে কলা দেহাইলেন, বরাতে আইজ কলাই আছে নাকি?

তোবা—তোবা—কি য্যান কন্! আপনারে কলা দেহামু ক্যান? কলা দেহাইলাম এই ইনিরে, দীনুকে দেখিয়ে উত্তর করে করিম।

মোড়লের পো'রে কলা দেহাইলেন!

না দেহাইয়া আর করুম কি? উনি যে ঘরে সিঁদ দিবার চায়! ঘরে ত ওডা ছাড়া আর কিছু নাই।

সিঁদ দিব!

হ, সিঁদ দিব। নাইলে নাকি পোলা বিয়ার পাকা ফলারের খরচ জুটব না।

তোবা—তোবা! দীনু মোড়ল পোলার সাদীতে পাকা ফগ্গার দিব তা একবার ক্যান, দশবার দশ গাঁয়ের নোকরে দিবার পারে। সিঁদ দিবার যাইব কোন দুখ্যে?

হেই কতাডাই কন ওনারে। উনিত এহন থেইকাই ওল্লার গোয়ার থনে (পিঁপড়ের পাছা থেকে) গুড় টিপবার নৈচে, পলানের কথার জবাব দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে করিম।

ব্যাপারী সাব ত নিজের মতনই হগলেরে ভাবেন। বলি একবারের ঠেলাতেইত পাছা দিয়া ধুমা বাইরইব তার আবার দশবার, করিমকে ডিঙিয়ে দিনু উত্তর করে।

পলান হাসতে হাসতেই বাধা দেয়, আরে যান্! কি য্যান্ কন্! আল্লার মর্জিতে ক্ষ্যাতের লক্ষীত দিন দিনই ফাইপা উঠচে আপনার ঘরে। মুটে দশ টেকা লাগব। দিমুনে ইলাহিরে কইয়া। তিন দিন ভইরা মাৎ কইরা রাখবনে চরের। বড় বালো (ভাল) বাজায় ইলাহির দল।

দ-শ টে-কা! বিস্ময় ঝরে পড়ে দীনুর কণ্ঠে।

হ, দশ টেকা। এমুন কিছু বেশী না। দশজন নোক তিন দিন ধইরা সমানে বাজাইব।

আমি কই, আপনে ঠিক কইরা ফালান। বৈরাগীর পো'র ত সবটাতেই দোন্দর মোন্দর (দ্বিধা) করন চাই; করিম জোরের সঙ্গেই সায় দেয়।

পলান বলে, হ হ বৈরাগীর পো, টেকা পয়সা জমাইবেন কার লেইগা? লগে কইরা আহেনও নাই লগে কইরা যাইবেনও না। দয়াল চান যা দ্যান দশজনেরে লইয়া ফুর্তি কইরা যান।

ধন দৌলতের ভাবনা দীনুও বেশী ভাবে না। তবে হিসেবের বাইরে খরচ করতে ভয় হয় ওর। কারো কাছে হাত পাততেও লজ্জা বোধ করে। সংসারের খরচা তো দিন দিনই বাড়ছে। মাত্র তো ঐ বিঘা কয়েক জমি। জমানো তো দূরের কথা সব দিক বজায় রাখাই দুঃসাধ্য। কিন্তু সকলেই যখন বলছে তখন হোক ইংরেজী বাজনা। নিশির মা'ও খুশী হবে'খন। ছোট পোলার বিয়েতে তো কি করবে ঠিকই করতে পারছে না বেচারা। যাই কেন হোক না, বিয়েতে ব্যাণ্ড পার্টি না হলে জমেই না।...ভাবনা রেখে প্রকাশ্যেই সায় দেয় দীনু, তবে তাই ঠিক কইরা ফালান। আপনাগ দশজনের কথাত আর ফেলবার পারি না। ঠেকলে আপনাগই চালাইবার লাগব।

পলান বলে, আরে চালাইবার যে মালিক হে-ই চালাইব। আমরা কেরা? আহেন, এহন দয়াল চানরে একডু ডাকি। ফকির সাব, একতারাডা লন।

একতারা আসে—সঙ্গে পান সুপুরি। তিনজনে মৌজ করে পান তামাক খেয়ে প্রাণ খুলে গাইতে থাকে :

(ও মন) আছে আপন ঘরে-রে তোমার
আছে আপন ঘরে।
জ্ঞানের একটা বাতি জ্বালিয়ে
তালাস কইরে দেখলি নারে ॥
ছয় কোনাতে ছয় জন চোরা
পেইতে আছে বিষম মোড়া—
ফাঁকে জুখে পাইলে পরে
ঠাইসা বুঝি ধরব তরে ॥

॥ ১৩ ॥

আজ বহু প্রত্যাশিত সাতই অঘ্রান। গতকাল ভোর থেকেই দীনুর বাড়িতে পলে পলে ব্যাণ্ড বাজছে। সমস্ত চরফুটনগরই যেন তালে তালে নাচছে। দীনুর বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়ার ধুম নেই। কেবল বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াটুকুই সম্পন্ন হবে। আর যারা বরযাত্রী যাবে তাদের সময় মতো ডাক খোঁজ করা। আজকের যত ঝক্কি ঝামেলা মধুর বাড়িতে। মঙ্গল উষায় ময়নার গায়ে-হলুদ হয়েছে। পুরনারীরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করেছে। ঘাটে গিয়ে জল-ভরা, বরণ-ডালা সাজানো, ময়নার মুখে ক্ষীর চিনি দেয়া—সবই একে একে করে চলেছে এয়োতিরা।

শেষ রাত থেকে মণ্ডল বাড়িতে শুরু হয়েছে নহবত। মধু নাম-করা কীর্তনিয়া। লীলা কীর্তন করে করে কাব্য-রসে রসিক। চারুকলায় কোথায় কি প্রয়োজন সে রসবোধ ওর আছে। বিয়েতে নহবত ওর মনের মতো বাজনা। পলে পলে রাগ রাগিনীর সমতা রেখে বাজবে সানাই—কাড়া নাকাড়া। এর চেয়ে সুসঙ্গত বাজনা আর কি হতে পারে? দীনু ইংরেজী ব্যাণ্ড করেছে করুক—ও কোন মন্তব্য করেনি। কিন্তু নিজের বাড়িতে বাজবে শুধু ঢোল, সানাই আর কাঁসর। এ শুধু অবস্থার কথা নয়। রুচির কথা। অবশ্য দীনুর

মতো ও-ও যদি পাঁচজনের পাতে রসগোল্লা দিতে পরতো তা হলে খুশীই হতো। মিষ্টি বলতে তো ছানার মিষ্টিই বোঝায়। অমৃতি, বুদে, আবার একটা মিষ্টি হলো নাকি? কিন্তু কি করা যাবে? হাতে আর একটিও বাড়তি টাকা নেই। টায় টায় ফর্দ করা হয়েছে। লুচি, অমৃতি, আর রসকরা। বুদে ওর দু'চক্ষের বিষ। বাঙ্গালীর খাবারই নয় ও। টেনেটুনে রসগোল্লা অবশ্যি হয়ে যেতো। কিন্তু বরযাত্রীকে পাকা ফলার খাইয়ে তো আর ময়নাকে খালি গায়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো যাবে না। বৈরাগী না হয় তার নিজের উদারতা দেখিয়েছে। একটা কানা কড়িও যৌতুক চায়নি। কিন্তু তাই বলে বিয়ের কনেকে কিছু না দিয়ে পারা যায় কি করে? পাঁচজনেই বা বলবে কি? অগ্রপশ্চাৎ ভেবেই মধু তালিকা থেকে রসগোল্লা বাদ দিয়েছে।

দক্ষিণ ভিটির বড় ঘরখানায় বসেছে ভিয়েন! তিন মণ ময়দার লুচি ভাজা হবে। অমৃতি মন দেড়েক। এছাড়া—রসকরা, ডাল, ডালনা, বেগুন ভাজা। কান্দনী ঘোষের চন্দনচূর দইও প্রচুর পরিমাণে সকলকে দেয়া হবে। চরের প্রায় সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তবে দীনুর মতো চরধল্লার সকলকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। বেছে বেছে মাত্র কয়েক ঘরকে। পলান ব্যাপারী আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা তো এমনিতেই বরযাত্রী হয়ে আসছে। তবু নিজের তরফ থেকে নিমন্ত্রণ করে মুখ রক্ষা করা। নয় তো ব্যাপারী সাহেব কি মনে করবেন।...

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। অঘ্রানের বেলা খুবই ছোট। তড়িঘড়ি সব গুছাতে গিয়েও সময়ের সঙ্গে পারা যায় না। কিন্তু দীনু বৈরাগী যে রকম খুঁতখুঁতে মানুষ তাতে পাঁজি-পুথি ঠিক রেখে কাজ করতে না পারলে ঝগড়াই বাঁধবে। মধুর দম নেবার ফুরসত নেই। পাড়া প্রতিবেশীরা অবশ্য যথেষ্টই সাহায্য করছে। কিন্তু সেতো শুধু হাঁটা খাটার ব্যাপারে। একটা বিয়েতে আনুষ্ঠানিক ঝামেলাই কি কম? সে সব তো ওর নিজেরই করতে হচ্ছে। বিকেল চারটে না বাজতেই কনে সাজতে তাড়া দেয় মধু। চমৎকার মানিয়েছে ময়নাকে লাল টুকটুকে চেলী খানায়। চন্দন কাজলে চলচলে মুখখানা খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে। তবু তো সারাদিন উপোস যাচ্ছে। সারা দিনে খেয়েছে মাত্র একবাটি দই আর খই। যে মানুষ দিনে অন্ততঃ সাত আটবার খায় তার পক্ষে এ কম কথা নয়! কিন্তু ময়না

আজ লক্ষ্মী মেয়ে। এতটুকুও গোলমাল করছে না। নতুন গয়নাগুলো শরীরের সঙ্গে লেপটে ধরেছে। যেন পটে আঁকা ছবি।

বিকেল তিনটে বাজতে না বাজতেই বরযাত্রীদের মধ্যে সাজ সাজ রব ওঠে। ব্যাণ্ড বাজতে থাকে তালে তালে। চরথল্লা থেকে পলান ব্যাপারী আর কাশেম আসে। মেহেরা সকালেই এসেছে। নিশির বিয়ে তো ওর ছোট ভাইয়েরই বিয়ে। বউমার হাতে পলান একখানা আলপাকার শাড়ী পাঠিয়েছে। নতুন কুটুম্বিতা—আলপাকার না দিলে ইজ্জৎ থাকে না। গঞ্জের হাট থেকে সাত টাকা বারো আনা দিয়ে এনেছে এ শাড়ী। চাষীর ঘরে এত দামের শাড়ী দেখে হয়তো অবাকই হবে অনেকে। তা হোক। সামান্য এটুকু না দিলে ইষ্টতা থাকে কি করে? কুটুমের কুটুম দীনু বৈরাগী। শুধু শাড়ী নয়, শাড়ীর সঙ্গে এক হাঁড়ি মিঠাইও পাঠায় পলান।

ধরতে গেলে কাশেম তো দীনুর জামাই-ই। নিশির চেয়ে বছর তিনেকের বড়। শালার বিয়েতে বরযাত্রী যাচ্ছে ও, সুতরাং কোনরকম খুঁত থাকলে চলবে না। একে চরথল্লার আদুরে গোপাল, তাতে আবার হালে সাদী হয়েছে। সাজগোজের বাহার কাশেমেরই বেশী। বুটিদার বিলেতী অর্গেণ্ডীর পাঞ্জাবীর নীচে জাপানী সিল্কের জালি গোলাপী গেঞ্জী। পরনে কালো ইঞ্চি পাড়ের সিমলাই কোরা ধুতি। পায়ে ডারবি সু। চিকন করে চুল ছাটা। ভুরভুর করছে লেবুর তেলের খুশবু। বুক পকেটে লাল সিল্কের রুমালখানা কিঞ্চিৎ মস্তকের দিকে উড্ডীন। ঠিকরে বেরুচ্ছে অগুরুর উগ্র গন্ধ। এক শিশি অগুরু গঞ্জ থেকে আনিয়েছিল কাশেম। অর্ধেক রুমালে ঢেলেছে। বাকীটুকু খরচ হয়েছে বরযাত্রীদের আর দশজনকে বিলোতে। পলানও কয়েক ফোঁটা দাড়িতে বুলিয়ে নিয়েছে। বিয়েতে একটু রং মশলা খরচ না হলে আবার বিয়ে কি? মজাদার গন্ধই অগুরুতে। নিজের দাড়ির সুবাসে নিজেই মাতোয়ারা। কাশেমের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে করিম আর দীনুর গালেও কয়েক ফোঁটা মাখিয়ে দেয় পলান। খুশীর বান ডাকে চোখে মুখে। করিমকেই মানিয়েছে ভাল। সাদা লুঙ্গি, সাদা আলখাল্লা, মাথায় বেতের টুপি। পলান পরেছে সবুজ লুঙ্গি আর সাদা ঢোলাহাতা পাঞ্জাবী। দীনু তার বরাবরের বৈশিষ্ট্যই বজায় রেখেছে। হাফ হাতা বুক কাটা নিমার ওপর ঢাকাই সাদা চাদরখানা কাঁধের ওপর থোপানো।

ব্যাণ্ড এবার আরো জোরালো সুরে বাজতে থাকে। মদন, আনন্দ, রহিম,

ইলাহি বরযাত্রীদের প্রায় সকলেই এসে জড় হয়। আজ আর বৈরাগী বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পাট নেই! শুধু পান, বিড়ি, তামাক। ডান হাতের ব্যাপার আজ মধুর বাড়িতে। মদনের আর তর সয় না। সকলের চেয়ে সে-ই বেশী উৎসাহী বরযাত্রী। পেট নয় তো যেন একখানা খুদে জালা। আলৃ থেকে গরু আনতে গিয়ে মণ্ডল বাড়িতে রান্নার খুশবু শুঁকে এসেছে। গরম গরম গাওয়া ঘিয়ের লুচি—সঙ্গে ডাল ডালনা দই মিষ্টি।...না, আর কত দেরি করবে এরা! খিদেয় যে পেট জ্বলছে...

সকলের সঙ্গে বসে হুঁকো খাচ্ছিল দীনু, মদন কাছে এসে তাড়া দেয়, কৈগ কাকা, তোমরা আর কত দেরি করবা? বেলা না গেল, ইআর পর গিয়া কি আর লগন পাইবা?

দীনু হুঁকো খেতে খেতেই বলে, হ বাপ, তর কাহীরে (কাকীমাকে) একটু তাড়া দে ত। শিগগীর নিশারে বাইর কইরা দেউক।

দীনুর সমর্থন পেয়ে মদন তক্ষুনি ভেতর বাড়িতে ছোটে। আর বেশী দেরি হয় না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই নিশি এসে পালকিতে ওঠে।

চমৎকার মানিয়েছে নিশিকে। হলুদ মাখানো লালপাড় ধুতি পরনে। গলায় নতুন কাঠের মালা। গায়ে বৃন্দাবনী ছাপার রেশমী চাদর। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে আরশি, ছুরি ও কচি কলার-মাজ। চন্দন চর্চিত ললাট-কপোল। সাদা সোলার টোপর মাথায়। মুখখানা হাসি হাসি।

এয়োতিদের বরণ হয়ে যায়। কুসুম আসে মাতৃধারা দিতে। ডান হাতের তালুতে দুধ রেখে কনুই চুইয়ে তা নিশির মুখে দেয়। একে একে তিন বার। ভাবখানা, আমি তোমাকে মাতৃধারা দিলাম, তুমি প্রতিজ্ঞা কর আমার সেবার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছ।...চিরাচরিত প্রথায় প্রতিজ্ঞা করে নিশি। কুসুম প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে ওকে। নিশি এসে ওঠে পালকিতে। ব্যাণ্ড এবার আরো জোরে বাজতে থাকে। তালে তালে চলে শোভাযাত্রা। চ্যাংড়া বরযাত্রীরা সব আগে আগে—মাঝখানে পালকি। সর্বশেষ অভিভাবকেরা। কুসুমের ভাইপোদের হাতে রংমশাল। মাতুল পুলিন আর মদন ছাড়ছে তুবড়ী। হাউইয়ের ভার কাশেমের ওপর। খুব সতর্ক হয়েই একটার পর একটা ছেড়ে চলেছে কাশেম। আকাশে লক্ষ তারার দীপালি।...

বিয়ে গোধূলি লগ্নে। কিন্তু সমস্ত চর ঘুরে, শোভাযাত্রা মণ্ডল বাড়িতে পৌঁছুতে এক প্রহর রাত হয়ে যায়। পরের লগ্ন সেই রাত তিনটেয়। বর-

কনের খুব কষ্ট হবে। তা আর করা কি? পাঁচজনকে নিয়েই কাজ। কাউকে কিছু বলা যাবে না। এখন খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।...

বরযাত্রীরা পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলবাড়ি উচ্ছল হয়ে ওঠে। সেখানকার ব্যাণ্ডপার্টিও সমানে পাল্লা দিয়ে বাজাতে থাকে। সকাল থেকে শুধু ঢোল, কাঁসর, নহবত-ই বাজছিল। এবার শুরু হয়েছে ব্যাণ্ড।

নিশিকে পালকি থেকে বরণ করে তুলে নিয়ে যায় এয়োতিরা প্রতীক্ষাগৃহে। যতক্ষণ বিয়ে না হবে ততক্ষণ বর-কনের চোখোচোখি হতে নেই। বাসরঘরে একা শুধু ময়নাই আছে। ওর খেলার সাথীরা সারাদিন ঘিরে ছিল ওকে। এবার বরকে পেয়ে সকলে এসে জড় হয় প্রতীক্ষাগৃহে। এ কথায় সে-কথায় চলে হাসি-তামাসা। নিশিকে বাঁশী বাজাবার জন্যও কেউ কেউ আব্দার করে। কিন্তু নিশির মুখে সাড়াশব্দ নেই। শুধু থেকে থেকে একটুখানি মিষ্টি হাসি খেলে যাচ্ছে ওর নিম্ন ওষ্ঠে। ঠাকুরমা দিদিমা সম্পর্কের বর্ষীয়সীরা ফোঁড়ন দেয়, তরা কচ্ কিলো ছুঁড়ীরা! নিশি তগ বাঁশী হুনাইব! তরা কি অর রাদা (রাধা)?

রাদা না অইলে বুঝি আর বাঁশী হুনা (শোনা) যায় মা ঠাকুমা? বিশ্বাস বাড়ির তুলসী মুচকি হেসে আড় নয়নে বাধা দেয়।

অল ছুঁড়ী—না। বাঁশী যদি হুনবার চাস তয় কদমতলায় যাইচ্—যমুনায়। কিগ নাগর, তাই না? তুলসীর কথার জবাব দিয়ে নিশিকে প্রশ্ন করে ঠাকুরমা।

নিশি হেসে হেসেই স্বকীয়তা রক্ষা করে।

তর তর করছে মণ্ডলবাড়ির মেটে উঠোন। উপরে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। চার কোণে জ্বলছে চারটে গ্যাসের আলো। বরযাত্রীরা দাওয়ার ওপর বসে পান তামাক নিয়ে ব্যস্ত। কলার পাতা আর মাটির গ্লাস দিয়ে সারবন্দী জায়গা করা হয়েছে। স্বজাতি সকলে এক বৈঠকেই বসে। করিম, পলান, কাশেম, রহিম প্রভৃতি মুসলমান অতিথিরা বসে পৃথক বৈঠকে। ফকিরের আসরে একত্র পান ভোজনে কারো কোন আপত্তি না থাকলেও সামাজিক ব্যাপারে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেখানে সকলে গুরুবাদী। সে গুরু হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক সকলেই তার মন্ত্রশিষ্য। কোনরকম

ভেদাভেদ নাই তাদের মধ্যে। গুরুর আচার আচরণই সকলের আচার আচরণ। কিন্তু যেখানে সামাজিক ব্যাপার সেখানে ধর্মীয় রীতি না মেনে উপায় নাই। বিশ্বাস পাড়ার মোড়ল গোষ্ঠ বিশ্বাস একসময় এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। শুধু দীনুর সমর্থন না থাকাতেই আন্দোলন দানা বাঁধতে পারেনি। কিন্তু গোষ্ঠর কোন সমর্থক ছিল না একথা বলা যায় না। ফকিরের যে যত বড় ভক্তই কেন হোক না সামাজিক ব্যাপারে কেউ কারো গণ্ডী ভাঙতে রাজী নয়। অন্ততঃ এখনো সে ক্ষেত্র তৈরী হয়নি। জীবনের শেষ সীমান্তে উপনীত হয়ে এ বাস্তব উপলব্ধি দীনুর হয়েছে। সুতরাং ও চায়-না নিজের মতবাদ কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়। তাতে আর যা-ই হোক বিভেদ দূর হবে না। বিভেদের বীজ অন্তর থেকেই মুছে ফেলতে হবে। এবং তা সম্ভবপর হবে পরস্পরের মেলামেশায়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যার যার সামাজিক রীতি মেনে চলাই স্থির হয়। গোষ্ঠ আর মাথা তুলতে পারে না। কাশেমের বিয়েতে পলানও তার হিন্দু অতিথিদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করেছিল। তাতে প্রীতির সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়াতেই সম্পন্ন হয়েছে। মধুও সেই রাস্তাই ধরেছে। পলানের চেয়ে মধুর ঝামেলা আরো কম। পলান খাইয়েছে মাছ, মাংস। মধু খাওয়াচ্ছে লুচি, মিষ্টি। কে কবে এ নিদান জাহির করেছে জানা যায় না। ঘৃতপক্ক দ্রব্যে নাকি কোন দোষ নেই। বিশেষ করে লুচি মিষ্টিতে। সুতরাং বৈঠকই শুধু আলাদা—পরিবেশনকারী এক এবং অভিন্ন। উঠোনে সামিয়ানার নীচে বসে খাচ্ছে স্বজাতিরা আর দক্ষিণ ভিটির বারান্দায় বসে খাচ্ছে ভিন্ন সম্প্রদায়ের অতিথি-বন্ধুরা। পরস্পর দেখছে পরস্পরের মুখ, তবু আছে ব্যবধান। এ যেন একই নদীর দুই তীর। প্রত্যেকেরই পৃথক সত্তা রয়েছে আবার প্রত্যেকেই একাত্ম।

লুচি ভেজে কুল পাচ্ছে না দু'জন ময়রা। গরম গরম পাতে পড়ছে কি নাই। তরকারি আসে তো লুচি নাই। লুচি আসে তো তরকারি সাফ। পরিবেশন করছে দু'জন ঠাকুর। গঞ্জের জনকয়েক বাবু ভুইঞাদের নিমন্ত্রণ করেছে মধু। সুতরাং সতর্ক হয়েই হাঁড়ি হেঁশেলের ছোঁয়াচ বাঁচাতে হচ্ছে। প্রথম কিস্তিতে বরযাত্রীদের হয়ে গেলে দ্বিতীয়বাবেই সব চুকে যাবে।

বড় ভাল হতো যদি গোধূলি লগ্নে বিয়েটা হয়ে যেতো। মেয়েদের বৈঠক উঠতেও রাত দশটার বেশী হতো না। বাড়ির লোকের খেতে গুছোতে বড় জোর বারোটা। যজ্ঞি বাড়িতে এতো সামান্য রাত। প্রচুর সময় পাওয়া

যেতো ঘুমোবার। এখন সব কাজ শেষ করেও বিয়ের জন্য জেগে থাকতে হবে। তা আর কি করা, কুসুমকে তো আর কিছু বলা যাবে না! কাছের থেকে কাছে, বৈরাগী একটু তাড়া দিলেই হতো।...মধু ময়না-নিশির জন্য ভাবতে থাকে। খিদেয় বড় কষ্ট পাবে বেচারারা!

বৈঠকে ভাজা, ডাল, ডালনা পড়েছে। এরপর পড়বে চাটনী, দই, মিষ্টি। মধু গলবস্ত্র হয়ে যাচাই করে, ঠাকুর, গরম গরম কয়খান লুচি নিয়া আহ। কই ব্যাপারী সাব, কিছু যে খাইলেনই না? রান্দন বুঝি বালো অয় নাই?— পলানকে লক্ষ্য করেই বলে মধু।

পলান দাঁত বার করেই উত্তর দেয়, কন কি মোগুলের পো! প্যাট যে ফুইলা জয়ঢাক অইচে! আর রাখুম কোন হানে?

করিম বাধা দেয়, মোগুলের পো, ব্যাপারী সাবরে ঠকাইবার চাইয়েন না। মিঠাইর ল্যাইগা জাগা রাখন লাগব ত!

মিঠাই আর আপনাগ পাতে দিবার পারলাম কই? আলা চাইল (আতপ চাল) আর কালাইর ডাইলের ডেলা কত খাইবেন?—সবিনয়ে মধু উত্তর করে।

কি কন্ আপনে? আমিত্তি (অমৃতি) কি খারাপ মিঠাই নাকি? আমার কাছে ত খুব বালো মিঠাই, পলান বলে।

কেমুন, কইচিলাম না? লুচি রাইখা গণ্ডা পাঁচেক আমিত্তি ফেইলা ছান উনার পাতে, করিম টিপ্পনী কাটে।

'ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি ত কলা খাই না,' বুজলেননি মোগুলের পো, পাঁচ গণ্ডা মিঠাই কার লাগব?—পলান পাল্টা জবাব দেয়।

আমার গরীবের বাড়ি, আপনারা যে দয়া কইরা আইচেন হেই আমার কপাল, বদান্যতা জানায় মধু।

গরীব! গরীব দনির (ধনীর) কি কতা ইহানে! আমাগ মোছলমানের বিয়ায় আবার কেরা কবে লুচি মিঠাই করে?—পলান বলে।

লুচি মিঠাই আপনারা করবেন ক্যান? আপনারা যে নওয়াব বাদশার জাত। কালিয়া কোরমা খাওয়া অব্বাস (অভ্যাস), হাসতে হাসতে মধু জবাব দেয়।

হ, কেরা কত কালিয়া কোরমা খায় ত্যাহা আচে। পৈঁইজ পান্তা জোটে না তার আবার কালিয়া কোরমা! আপনি ঐ চ্যাংড়াগ দিগে যান। আমাগ

যা লাগব আমরা চাইয়াই নিমুনে। পাক বড় বালো হৈচে, খোলাখুলিই উচ্ছ্বাস জানায় পলান।

মধু হাত জোড় করে এসে দাঁড়ায় পুলিন আর মদনের কাছে। কিছু বলবার আগে মদন ঠেলে দেয় ওকে কাশেমের কাছে। বলে, আমাগ কিছু কওয়ন লাগব না। প্যাট যতক্ষণ আচে আমরাও ততক্ষণ আচি। গণ্ডা দশেক কইরা লুচি টান্‌ছি। এহন মিঠাইডা দেহন লাগব। আপনাগ জামাইর কি লাগব দ্যাহেন। কাশেম ভাই ত কোন কিচু দিবার আগেই জোড়আত কইরা বহে।

পুলিন আর মদনকে ছেড়ে মধু আসে কাশেমের কাছে। বলে, কি বাবাজী, কিছুই ত খাইলা না?

বেচারা কাশেম লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সত্যি, বিশেষ কিছু খেতে পারেনি ও। মাছ মাংস না হলে ওর রোচে না। তবু ভদ্রতা রেখেই জবাব দেয়, আমারে কিচু কওয়ন লাগব না। আপনে বহেন গা (বসেন গিয়ে)।...

একে একে বরযাত্রীদের সকলকে ভালভাবে যাচাই করে মধু অন্যদিকে তাল দিতে যায়। রাত ন'টার মধ্যেই প্রথম বৈঠক ওঠে।

ক্ষ্যান্তমণি বরের পিসী কনের মাসী। মণ্ডল বাড়িতেও নিজের জায়গা ঠিক করে নেয়। এক গাঁয়ে দু'দুটো পাকা ফলার। এ সুযোগ কি জীবনে কোন দিন এসেছে না আর কোনদিন আসবে! মধু কীর্তনিয়া তো সম্পর্কে মামাই হয়। মামাবাড়ির দেশের মানুষ মামা হবে না তো কি হবে? তাছাড়া দিদিমার সই ছিল মধু কীর্তনিয়ার মা। তবে আবার ওরা পর হলো কেমন করে? কীর্তনিয়ার বেটার বউ দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তো আরও নিকটতর। ভাসুর পো'র সাক্ষাৎ শালীকে বিয়ে করেছে দুর্গার আপন মামাত ভাই। কুটুম্বিতা তো আর অমনি অমনি গড়ে ওঠে না। ক্রিয়াকর্মে আসা যাওয়া করলেই কুটুম—কুটুম। নয়তো পরও যা কুটুমও তা!....

ক্ষ্যান্ত সম্পর্কের অলিগলি খুঁজে দিন কয়েক আগে থেকেই ঘনঘনমণ্ডলবাড়ি যাতায়াত শুরু করে। ডাক খোঁজের মধ্যে মধু বর্ষণ করতেও দ্বিধা করে না। বিয়ের দিন তিনেক আগে শনিবারের এক সন্ধ্যায় পৈঠার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ময়নার চুল বেঁধে দিচ্ছিল দুর্গা। ক্ষ্যান্ত রোজকার মতোই হাজিরা দিতে

এসে বাধা দেয়, আঃ, কর কি বিয়াইন, ভর্ সন্দা বেলা পা ঝুলাইয়া বইসা বিয়ার কয়নার চুল বান্‌বার নৈচ! পাও উঠাইয়া বহ। একজন আচেন ই চরে, বাও বাতাস লাগব!

দুর্গা নিজেও সংস্কার মুক্ত নয়। ক্ষ্যান্তর কথাটা ছ্যাঁৎ করে গিয়ে বুকের মধ্যে বেঁধে। মুখ কাঁচুমাচু করে তাড়াতাড়ি মা মেয়েতে পা উঠিয়ে নেয়। থতমত খেয়েই অভ্যর্থনা জানায়ঃ বহেন বিয়াইন।

কথাটা দুর্গার মনে ধরেছে দেখে ক্ষ্যান্ত খুশী হয়। পান দোক্তা চিবাতে চিবাতেই পৈঠায় ওপর বসে পড়ে।

দুর্গা তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, মাটিতে বৈহেন না। এই মইনী, মাঐমারে একটা পিড়ী আইনা দে।

না না, পিড়ী লাগব না। আমি কি পর আইচি নাকি? পিড়ী দিয় তোমার নতুন কুটুম আইলে। একটা কতা বইলা যাই, ম্যায়ারে ই কয়দিন একা একা ঘাটে পথে যাইবার দিয় না। ওনার নজর বড় খারাপ।

শঙ্কায় দুর্গা কেমন যেন জড়সড় হয়।

ক্ষ্যান্ত সমতা রেখেই সাহস দেয়, ভয় কইর না কিচু। উনি যেমুন আচেন আমাগ চম্পও তেমুন আচে। চিনলানি চম্পরে?

হ, গঞ্জের চম্পি জাইলানীর (জেলেনীর) কতা কইবার চান ত?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়, আরে জাইলানী অইলে কি অইব, ও-নাগ সাইক্ষাৎ যম। চম্পর মতো ওজা ই মুল্লুকে নাই। গঞ্জের ক্ষ্যাত্র বাইনার (বেনের) ব্যাটার বউরে বিয়ার দিন রাইত্রেই জিন পরীতে ধরচিল। বউ বালো কইরা কথা কয় না, খায় না, ঘুমায় না। ক্যাবল থাকে থাকে আর হি হি কইরা হাসে। মদ্ধে মদ্ধে ফিট অইয়া যায়। বালো করল ত আমাগ চম্পই। ওনারে এমুন শিক্ষা (শিক্ষা) দিয়া দিল যে ভাঙ্গা জোতা (জুতো) কামড় দিয়া পালাইবার পথ পায় না। বউডা ত হ্যারপর থেইকাই বালো আচে। পোলাপানও ঐচে (হয়েছে) কয়ডা।

দুর্গা বলে, হ হুনচি। চম্পি ত নিজে ঝাড়ে না, নেদু জাইলারে দিয়া ঝাড়ায়।

ছাই হুনচ তুমি। ম্যায়া লোকের ঝাড়ায় ত আর ম্যায়া লোকের ভূত ছাড়ে না! তাই নেদুর মুখ দিয়া চম্প মন্তর পড়ে। যার লেইগা যেমুন আদেশ অয়, ক্ষ্যান্ত বাধা দেয়।

দুর্গা বলে, তা যে ঝাড়ে ঝাড়ুক। আমাগ ফকির সাবের মতন এমুন গুণী ই মুলুকে কেউ নাই।

ছাই গুণী তোমাগ ফকির সাব। হ্যার নীলা (লীলা) খেলা ভাব-ভাবতা লইয়া। ভূত প্যাতের ঝাড়-ফুঁক হ্যায় কিছুই জানে না। তাহ না, দিনে রাইতে কত বড় বড় ঘরের ম্যায়া মদ্দার নাও বান্দা থাকে চম্পার ঘাটে? দুর্গার কথায় কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েই বাধা দেয় ক্যান্ত।

দুর্গা আর কথা বাড়ায় না। ক্যান্তকে বসতে বলে সন্ধ্যা দিতে উঠে যায়। ক্যান্তও ময়নার সঙ্গে খানিকক্ষণ রংঢঙ করে সেদিনের মতো উঠে পড়ে।

বিয়ের দিন স্থির হবার পর রোজই এমন আসে ক্যান্ত। যেদিন যেভাবে পারে ভাব জমায়। পাকা কলার খাবার নেমন্তন্ন একরকম পাকাই হয়ে যায়। এখন আর একটু এগিয়ে গিয়ে যদি আগে পাছের আর দুটো চারটে দিনের অতিরিক্ত ব্যবস্থা করা যায়।...

বিয়ের দিন নিজের বাড়ি থেকে বঁটি বয়ে এনে কুটনো কুটতে লেগে যায় ক্যান্ত। গায়ের শক্তি দিয়ে একগাদা মশলা বেটে দিতেও পেছপা হয় না। দুর্গা ওকে মনেপ্রাণেই যত্ন করে চলেছে। একথা সেকথা নিয়ে আগে দু'চার দিন বচসা হলেও মধু এখন ওর প্রতি প্রসন্ন। নিজে বউমাকে বলে এক বাটি মুড়ি মুড়কি ও দই খাইয়েছে সকালের জল খাবার হিসেবে। দুপুরের ভাত খাবারের সময়েও নেমন্তন্নের রান্না থেকে খানিকটা করে চাখিয়ে দেখিয়েছে। খেয়ে বেশ সন্তুষ্টই হয় ক্যান্ত। এমন সুস্বাদু রান্না জীবনে ও কখনো খায়নি। মুখপোড়া বামুনটা যদি পেছনে না লাগতো তাহলে দই, মিষ্টি, তরি-তরকারি পেট পুরেই খেতে পারতো। কিন্তু গেঁজেলটার হাত দিয়ে যেন কিছু গলতেই চায় না। ওর বাপ চৌদ্দ পুরুষের ধন যেন দিচ্ছে হারামজাদা। ঝাড়া পাঁচ-পাঁচখানা লুচি উনুনে দিলে তবু একখানা পাতে ছোঁয়ালে না। উনুনই যেন ওকে বলে দেবে লুচিতে নুন ময়েম ঠিক হয়েছে কিনা। মুখপোড়ার কাছে আনন্দর পোলার নাম করেও দুখানা লুচি চেয়েছিলাম। কিন্তু তাই কি দিলে?...আচ্ছারে আচ্ছা, বৈঠকে বসন্তে তো আর না দিয়ে পারবিনে!...মধু মামা কাজটা ভাল করেনি। ওদের কি চিনতে বাকী আছে? কাউকে কিছু খেতে না দিয়ে সব গায়েব করবার তালে আছে।...আঃ কি খুশবু ছাড়ছে ঘিয়ের! গাড়লটা যদি দুখানা লুচিও চেখে দেখবার সুযোগ দিতো!...

রাত দশটায় মেয়েদের বৈঠক বসে। জায়গা ক্যান্তই করে। মেঝে

রেহে নিজের পাতাখানা বেশ বড়সড় দেখে নেয়। আলগা পাতও একখানা পাশে রাখে। ভাবখানা—কেউ একটু পরে বসছে, যা দেবার সেখানাতেও দিয়ে যাও। খাওয়ার পর ঝাউ পাওয়া। শীতের দিন নষ্ট হবে না। পুরের দিন বেশ চলবে।

ক্ষ্যান্তর কাঁজে প্রথম প্রথম সব কিছুই পড়তে থাকে। বাইরের নিমন্ত্রিত লোকের খাওয়া হয়ে যাওয়ায় এখন পরিবেশন করছে বাড়ির লোকেরা। তারা ক্ষ্যান্তর চাতুরী সহসা ধরতে পারে না। কিন্তু পর পর খাবার জমে যাওয়ায় দুই পরিবেশনকারী এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্ষ্যান্তকেই ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে। বড় লজ্জায় পড়ে ক্ষ্যান্ত। কেননা, চেয়ে চেয়ে ও-ই সমস্ত তরি-তরকারি নিয়েছে। দই, মিষ্টিটা পড়লেই ল্যাঠা চুকে যেতো। কিন্তু বরাত মন্দ তাই ধরা পড়ল। নিশ্চয় কেউ কান ভাঙানি দিয়েছে।...

দই-ওয়ালার সঙ্গে ক্ষ্যান্তর মন কষাকষি ছিল। জব্দ করবার জন্য তাই সে উঠে পড়ে লাগে। আর একটু হলে হয়তো দক্ষযজ্ঞ হয়ে যেতো, দুর্গা পাতের কাছে এসে দাঁড়ায়।

লজ্জার হলেও ক্ষ্যান্ত কতকটা বল পায়। আমতা আমতা করেই বলতে থাকে, হাহত বিয়াইন, আমার ভাইপোর রাইত্রে আইবার কতা আচে বইলা একটা পারস নিবার নৈচি, তা মুখপোড়া কেমুন তরপাইবার নৈচে!

দুর্গা সবই বোঝে। তাই একটু হেসে দই-ওয়ালাকে ধমক দেয়, ওকি নিমাই, যা দিবার দিয়া যাও না! দিনভর খাটচে ব্যাচারা, ভাইপোর লেইগা পারস না নিলে হায় খাইব কি?...

ভাইপো খাইব না ছাই! ও সব চালাকি আমরা বুজি! রাগে গজগজ করতে করতেই এক চামচ দই থপ করে পাতের ওপর ফেলে দিয়ে যায় দই-ওয়ালা।

ক্ষ্যান্ত আর কথা বাড়ায় না। ধরা যখন পড়েছেই তখন দু'কথা বলে বলুক।...

রাত বারোটার মধ্যে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে হাঁড়ি হেঁশেল গুছোনো হয়ে যায়। তিনটেয় শেষ লগ্ন। ভোর থেকে সানাই বাজছিল। বারোটার কাছাকাছি এসে থেমে যায়। সবে অঘ্রান মাস, তবু চরে শীতের ধকল বেশ। ঠাণ্ডায় বেচারাদের গলা দিয়ে ফুঁ বেরুচ্ছে না। ব্যাণ্ড পার্টির সঙ্গে রাত দশটা

পর্যন্ত থাকার চুক্তি ছিল। কিন্তু গোধূলি লগ্নে বিয়ে না হওয়ায় সব কিছুই পণ্ড হয়ে গেল। বিয়ের সময়েই যদি ব্যাণ্ড না বাজবে তাহলে আর আমোদ হবে কি দিয়ে? ওরা তো কিছুতেই আর থাকতে চাচ্ছে না। আর-এক জায়গায় নাকি রাত এগারোটা থেকে বায়না আছে। সে প্রায় মাইল খানেকের ওপর পথ। ভোর পর্যন্ত থাকতে হবে ওদের ওখানে। মধুর মনটা খিঁচড়ে যায়। সেই পয়সা খরচ হবে অথচ সখ আহ্লাদ কিছুই হবে না। গোধূলিতে বিয়ে হলে সারা বাড়ি লোকজনে জম্‌জম্ করতো। হাউই রংমশালে হতো রূপ-দীপালি। ব্যাণ্ডের তালে তালে ময়না বরণ করতো নিশিকে। কিন্তু এখন এতো হবে সেই ছেলেপুলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে হরিলুট দেয়া।...

রাত একটার পর গোটা মণ্ডল বাড়িই যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বরযাত্রীদের অধিকাংশই ফিরে গেছে। বাতের শরীর বলে পলান ব্যাপারী থাকতে পারেনি। তার বদলে কাশেম অবশ্য আছে। কিন্তু নিশির সঙ্গে অনেকক্ষণ ঠাট্টা মস্করা করে শেষ পর্যন্ত ও-ও টাল সামলাতে পারেনি। বেশ নাকই ডাকছে এখন ওর। চ্যাংড়াদের মধ্যে আরো যা দু'-পাঁচটি আছে তাদের অবস্থাও তাই। দীনু নিজেও একটু আয়াস করতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। অনেক কষ্টে অবশ্যি নিশি ময়নাকে এখনো জাগিয়ে রেখেছে এয়োতিরা। কিন্তু সে শুধু নামেই জেগে থাকা। হাসি নেই—কথাবার্তা নেই—দু'চোখ ঘুমে ঢুলু-ঢুলু।

দুর্গা এতক্ষণ কাজের মধ্যে ডুবে ছিল—বেশ ছিল। কিন্তু বাড়ি নিঝুম হতেই বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। যার আজ সব থেকে প্রয়োজন সেই-ই নেই। শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই। কিন্তু দুর্গা নিজের আঁখিকে বাগ মানাতে পারে না।

কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে মধুও বোধ হয় ছেলের কথাই ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হয়তো পাষাণ চাপা বুকখানায় অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছিল। কিন্তু মধু তা কোনক্রমেই প্রকাশ হতে দেয় না। মায়ার এ সংসার। কে পুত্র, কে কন্যা, কে জায়া এখানে? শুধু কর্তব্য করে যাও...শক্ত করেই বুক বাঁধে মধু। সন্ধ্যা থেকে গ্যাসের আলোগুলো জ্বলছে। হয়তো দম ফুরিয়ে গেছে। নিভে যাচ্ছে কোনটা। কোনটার বা জল প্রয়োজন, মধু উঠে গিয়ে তদারক করে। প্রয়োজন বোধে পাল্টে দেয় গ্যাস। আবার মিটমিট করে জ্বলতে থাকে আলোগুলো। ভাগাড়ে খেঁকী কুকুরগুলি বেশ সতেজ থেকেই বাসর জাগছে। মাঝে মাঝেই খেঁকানী শোনা যাচ্ছে। মধু বার বার উঠে

গিয়ে ঘড়ি দেখে। লগ্ন ঠিক রাখার জন্য গঞ্জের অখণ্ড সাধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে ছোট টেবিল ঘড়িটা।

সারাদিন একটানা উপোস চলেছে। এ বয়সে এরকম উপোস স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তবু মনের জোরেই শক্ত আছে মধু। কি আর করা যাবে, হিন্দু শাস্ত্রে যখন খেয়ে কন্যা সম্প্রদান করার রীতি নেই তখন থাকতেই হবে। অনাচার করে তো আর একমাত্র নাতনীর অমঙ্গল করতে পারে না।···

আর হয়তো ঘণ্টাখানেক বাকী। দূরে প্রহর ঘোষণা করছে খেঁক-শিয়ালীরা। মধুর দু'চোখ জুড়ে আসছিল—ধড়ফড় করে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখতে যায়। কিন্তু কিসে কি হলো বুঝা যায় না। হঠাৎ মাথা ঘুরে মেঝের ওপর পড়ে যায় মধু। দুর্গা নিকটেই বসেছিল, শব্দ শুনে ছুটে আসে। মধুর বুকে হাত দিয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, বাবা—বাবা—

আর বাবা! সব শেষ। বুকের স্পন্দন থেমে গেছে মধুর। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

চেঁচামেচি শুনে পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে এয়োতিরা—ময়না নিশি। দীনুর ঘুম ভেঙে যায়। কাশেমও উঠে বসে। চারিদিকে শুরু হয় ছোটাছুটি। গঞ্জ থেকে আসেন নরেন কবরেজ। চোখ মুখের দিকে তাকিয়েই মন্তব্য করেন, সন্ন্যাস রোগ। পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবায়ু্ বেরিয়ে গেছে।

শাঁখ সানাই-এ যে বাড়ি মেতে উঠেছিল সে বাড়িতে নামে গভীর শোকের ছায়া। দুর্গা কাটা পাঁঠার মতো দাপাতে থাকে। ময়না বেহুঁশ। নিশি ভেবেই পায় না, ওকি জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে।···সমস্ত চর শোকে বিহ্বল। আর কেউ শুনবে না, নৌকোবিলাস, মাথুর, নিমাই সন্ন্যাস মধুর মুখে। এমন মানুষেরও এমন হয়! বেচারা দুর্গা ময়না।···

সংবাদ পেয়ে পলান, করিম সেই রাত্রেই ছুটে আসে। ভোর হতে না হতেই আসে শ্রীধর খোলী, অখণ্ড সাধু, গোবিন্দ কীর্তনিয়া। উদ্‌গত অশ্রুধারার সঙ্গে পড়ে খোলে চাঁটি। আবেগ-বিগলিত-কণ্ঠে চলে নাম সংকীর্তন। পলান করিম আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া মাগে ওদের অভিন্নহৃদয় বন্ধুর জন্য। শোভা-যাত্রার বদলে শবযাত্রা বার হয় মণ্ডল বাড়ি থেকে। ধলেশ্বরীর বাঁকে চিতা সাজানো হয়। কালের নিয়মে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মধু।

॥ ১৪ ॥

ময়নাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ছিল মধুর সংকল্প। কিন্তু ভগবান ওকে সকল সংকল্প থেকেই মুক্তি দিলেন। মধু মুক্ত হলো, পড়ে রইলো ময়না, দুর্গা আর অগুছানো সংসার। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। জমি বাঁধা দিয়ে নাতনীর বিয়ের উৎসবে মেতেছিল মধু। ভেবেছিল, দীনুর সংসারে সুখে থাকবে ময়না। ধনে-জনে লক্ষ্মীলাভ হবে। ময়নার যদি সুখ হয় তাহলে আর ওদের ভাবনা কি? পারে ক্ষেতখামার থেকে টাকা তুলে জমি ছাড়াবে, না পারে দুচোখ যেদিকে যায় চলে যাবে বৃন্দাবন যদিকে খুশি। দুর্গা মাও তো সারাদিন ভজনপূজন নিয়েই ব্যস্ত। ময়না সুখী হলে সংসার ছেড়ে যেতে তবে আর মায়া কি? মন্দিরে মন্দিরে ভজন গাইবে—যা জোটে মা-বেটায় প্রসাদ পাবে। হায়রে আশা হায়রে মানুষ…

ময়না না থাকলে দুর্গারও কোন ভাবনা ছিল না। যদি বিয়েটাও মিটে যেতো। কি মূল্য আছে এ প্রাণের। ধলেশ্বরীর জল তো এখনো শুকিয়ে যায়নি। দড়ি কলসী নিশ্চয় জুটতো। রোগে স্বামী শ্বশুর মরেছে। কিন্তু দোষটা যেন ওরই। ও-ই যেন ওদের মাথা দুটো চিবিয়ে খেয়েছে। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই ওর কলঙ্ক—হতভাগী পোড়াকপালী। না না, আত্মঘাতী হতেই বা যাবে কেন? বৃন্দাবন রয়েছে—নবদ্বীপ, কাশী। গতর খাটালে কি দুমুঠো ভাত জুটবে না? কিন্তু কাল হয়েছে ময়না। কে জানে, বরাতে আরো কি আছে।…

ময়নাও দমে যায়। পাড়ার বুড়িগুলি যেন ওকে দেখে কি সব বলাবলি করে। কত যেন অপরাধ করে ফেলেছে ও। জ্ঞান হবার বয়েস হয়নি। তবু কেন যেন চলায় ফেরায় মন্থরতা এসে যায়। নিশি আগের মতোই গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায়। কিন্তু ময়না পারে না ওর পাশে ছুটে যেতে। বাঁশীর ডাকেও আর সাড়া দিতে পারে না। এ যেন বেঁচে থেকে মরে যাওয়া।

ওদিন স্নান করে ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না। পাশাপাশি আসছিল ক্ষ্যান্তমণি। হয়তো ময়নার ভিজে আঁচল থেকে জলের ছি-টা গিয়ে থাকবে ওর গায়। বাস্, আর কোন কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় গালাগাল শুরু করে ক্ষ্যান্ত, ছাই কপালী—বাপ খাকী—দাদারেও চাবাইয়া খাইচচ্। পথ

ঘাট দেইখ্যা চলচ্ নালো হাবাতী? মাইনষের গায় যে জল আছে, স্থাহচ না?...

ভিজে কাপড়ে দুর্গাও পেছু পেছু আসছিল, ক্ষ্যান্তর গালাগাল শুনে বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে। অবুঝ মেয়ে—একটু না হয় জলের ছিটাই গিয়েছে। ও তো আর বাসি জামা কাপড়ে নেই কিংবা কোন নোংরা ঘাঁটেনি। স্নান করেই না ঘাট থেকে যাচ্ছে! তবু এমন ইতরের মতো গালমন্দ করবে!...এই না সেদিনও কত ইষ্টতা দেখিয়ে চলিয়েছে। তিনদিন ধরে সমানে খেয়েছে নিয়েছে, একটু লজ্জাও কি থাকতে নেই!...ক্ষ্যান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে রাগে গোঁ গোঁ করতে করতেই বাড়ি চলে আসে। কাঁধের ওপর থেকে ভিজা কাপড়ের রাশ নামিয়ে ছুটে গিয়ে ময়নার চুলের মুঠি ধরে। দুম্ দুম্ করে কয়েক ঘা বসিয়ে দেয় পিঠের ওপর। ময়না ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। ঠাকুর ঘরে এসে খিল দেয় দুর্গা। দুচোখ জলে ভরে ওঠে। কত কথাই না মনে হতে থাকে। কুসুম বেয়ান যদি ওদের মুখ থেকে এসব লাগানী ভাঙানী শোনে তাহলে মন খিঁচড়ে যেতে কতক্ষণ? কে অলক্ষুণে মেয়ের সঙ্গে আদুরে ছেলের বিয়ে দেয়? কাল-অশৌচের জন্য পুরো এক বছরই তো অপেক্ষা করতে হবে।...

ময়নার বিয়ের জন্য জমি বন্ধক রেখে দু'শ টাকা কর্জ করে গেছে মধু। রামকান্তর মধ্যস্থতায় কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ দিয়েছেন টাকাটা। মধুর ভরসা ছিল, রবি শস্য বেচে অর্ধেক শোধ করতে পারবে। বাকীটা পরের সন পাট বেচে। হিসেবে ভুল ছিল না মধুর। ফসল যেভাবে বাড়ছিল তাতে হয়তো অর্ধেকের বেশীই শোধ হয়ে যেতো। কিন্তু বাদ সাধলেন প্রকৃতি। অসময়ে বিরাম বিহীন বৃষ্টি শুরু হলো। শীতের সময় এরকম বৃষ্টি বড় একটা দেখা যায় না। শুঁটি দেখা দিয়েছে মুগ মটরের ডগায়। লক্লক্ করে বেড়ে চলেছে। মহাগুরু পতনের বছর। শাস্ত্রে আছে, গুরুদশার বছরে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সর্বদা আশঙ্কায় থেকেও দুর্গা বুকে বল পাচ্ছিল। শস্য ক'টা ঘরে উঠলে আগে কুমার বাহাদুরের দেনা শোধ করবে। খায় না খায় এ পাপ ও ঘাড়ে রাখবে না। কিন্তু মনের বাসনা মনেই চাপা পড়ে। অবিরত বৃষ্টিতে মুগ, কলাই, মটর পচে সাফ। বৃষ্টির মধ্যেও অন্যেরা শুঁটি কুড়িয়ে এনে কিছু আয়ের পথ করে নিয়েছে। যা আসে দু' দশ টাকা। কিন্তু ও সেদিক দিয়েও সুবিধে করতে পারেনি। মধুর মৃত্যুর পর থেকেই ছোট ভাই আনন্দ সংসারে

আছে। একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে একা একা থাকে কি করে? ক্ষেত খামারই বা দেখে কে? আনন্দর ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে দায়িত্ব আনন্দ পালন করতে পারেনি। খেতে ঘুমোতে হুঁকো খেতেই ওর দিন কাবার। ক্ষেতে যাবার সময় কই? তাও আবার জল বৃষ্টি মাথায় করে! ও তো আর কাজ করতে আসেনি এ বাড়িতে। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলে দিদির কাছ থেকে যদি জমি-জায়গাটুকু লিখিয়ে নেওয়া যায়।....

চৈত্র মাস, গোলায় টান পড়ে। গত সনের মজুত শস্য যা ছিল টেনেটুনে তা দিয়ে এপর্যন্ত কোনরকমে চলেছে। মুড়ি, মুড়কি, ছাতু খাবার বলতে যা কিছু প্রায় সবই ফতুর। অথচ প্রত্যহ সকালে ময়না আনন্দর জন্য কিছু না হলেও এক বাটি করে গুড়-মুড়ি চাই। নিদেন এক সানকী করে নুন-পান্তা তো না হলেই নয়। কিন্তু দুর্গা এত খাবার পাবে কোত্থেকে? আনন্দকে ক্ষেত খামারে গিয়ে কাজ করবার কথা বলেও কোন লাভ নেই। ঠেলেঠুলে পাঠালেও ও দিনভর ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়েই কাটিয়ে দেয়। ওকে নিয়ে এক জ্বালাই হয়েছে। ছোট ভাই, মুখ ফুটে তাড়াতেও পারে না, সইতেও পারে না। এতদিন যাও বা ছিল এখন তো ভাত দেওয়াই মুশকিল হয়ে পড়লো। চার বেলা চার থালা না হলে মুখ চোখে আষাঢ়ের মেঘ থমথম করবে। একটুতেই রেগে যায়। শুধু কি খাওয়াই? ঘণ্টাখানেক বসে বসে গায়ে তেলই মাখবে ছটাকখানেক। অবশ্য চললে কিছু বলতো না ও। কিন্তু এখন যে উপোস দেওয়া শুরু হবে। আনন্দ পারবে কেন এত কষ্ট সইতে?...ঘরের পাশেই রয়েছে নতুন কুটুমেরা। তাদের আর যা-ই হোক খাওয়া-পরার কোন কষ্ট নেই। লোকে গিয়ে যদি সাত পাঁচ কান ভাঙানী দেয় তবে কি আর ইজ্জৎ থাকবে?...ভাবনায় ভাবনায় আহ্নিক করতে বসে দুর্গার দু'চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

হাঁড়িতে চাল আজ সত্যি বাড়ন্ত। কিন্তু দুর্গা নিরুপায়। কোথায় পাবে টাকা? একি আর একদিন আধদিনের ব্যাপার? রোজ চাই, চার বেলা চাই। একা ময়না থাকলে কোন কথা ছিল না। যা জুটতো মা-মেয়েতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। কিছু না জুটতো জল খেয়েই কাটিয়ে দিতো। কিন্তু আনন্দকে নিয়ে তা চলবে না। ওদের দু'জনের চেয়েও ওর একার খোরাক ঢের

বেশী। বলতে গেলে প্রতি বেলায় আধ সের চাল ওর একারই চাই। এখন করে কি ও?...

বিয়ের সময় নতুন বউয়ের মুখ দেখে আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ দুটো একটা রূপোর টাকা ওর হাতে দিয়েছিল। এতকাল তা পেটরায়ই তোলা আছে। প্রতি বছর ভাদ্রমাসে কাপড় রোদে দেবার সময়—পেটরা খুলে একটা একটা করে গুণে দেখে। কতই বা আর হয়? সব মিলিয়ে দশ টাকাও নয়। অনন্যোপায় দুর্গা সেই টাকাই আজ কাপড়ের নীচে হাত গলিয়ে বার করে। দুটো টাকা আনন্দর হাতে গুঁজে দেয় গঞ্জ থেকে চাল কিনে আনার জন্য। হ্যাঁ, শুধু চাল, আর কিছুই নয়। নুন যা আছে তাতে আরো দুটো দিন চলে যাবে।

সকালে বরাদ্দ মতো খাবার পায়নি বলে মুখ ভার করে বসেছিল আনন্দ। টাকা হাতে পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। দিদির নিকট বায়না ধরে, চাইর পয়সার জিলাপি আনবার চাই, কি কও তুমি? ওদিন দেইখা আইলাম কান্দনী ঘোষের দোকানে বড় বড় কইরা জিলাপি ভাজবার নৈচে। তুমি গইনা পয়সা দ্যাও আনুম কোহান থনে? মইনীরে আইহা কইলাম, অর ত জিব্বা দিয়া জল পড়বার থাকে।...

অতি দুঃখেও হাসি পায় দুর্গার। সম্মতি না দিয়ে পারে না। বয়েস হলে কি হবে আনন্দটা সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেছে। ছেলে মেয়ে দুটো বেঁচে থাকলে তো এতদিন প্রায় ময়নার সমানই হতো। বউ বেচারাও মরে বেঁচেছে। নয়তো দুঃখের সীমা থাকতো না।...

আনন্দ ক্ষেতের আল ধরে গঞ্জের পথে মিলাতে থাকে, দুর্গার বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়। কি আর ওদের এমন বায়নাক্কা? সামান্য দুটো নুন ভাত নয়তো মুড়ি চিঁড়ে। দিতে পারছে না এ ওর নিজের অক্ষমতা। আনন্দ না থেকে নিজের পেটের আর একটা থাকলেও তো তাকে খাওয়া-পরাতে হতো! ...ভাবতে ভাবতে দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতেও সংসারে অভাব ছিল। এমন কি নিবারণ বেঁচে থাকতেও। কিন্তু সে অভাব অন্য ধরনের। হয়তো হাল বলদের জন্য টাকা চাই। পাটের নিড়ানী পড়বে তার জন্য চাই টাকা। কোনরকম আকস্মিক বিপদের মুখে পড়েও দায় দেনার দরকার হতো। কিন্তু তাই বলে দুটো ভাতের ভাবনা কখনো এমন করে ভাবতে হয়নি। এ যেন দুর্ভিক্ষ রাক্ষুসী উড়ে এসে চেপে বসেছে।...

ময়না বাসি ঘর-দোর নিকিয়ে একবারে ঘাট থেকে স্নান করেই ফেরে। ওকে দেখে দুর্গা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে সহজ হতে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বলে, ক্যারে, এত সকালে ছান কল্লি সন্দি লাগে যদি?

এত সকাল দেখলা কোন হানে? রৈদ বলে পিঠার উপুর আইহা পল্ল! তুমিও যাও না ডুব দিয়া আহ গা? মিচামিচি বেলা কইরা কি কাম? সমতা রেখেই ময়না জবাব দেয়।

দুর্গা তাই যাবে। এ সময়ে মেয়েটার চোখের সামনে না থাকাই ভাল। এক-ফোঁটা মেয়ে, এতটা বেলা হয়েছে কিছুই মুখে দিতে পারলে না। স্নান করে এলে তো খিদে আরো জোর পায়। কিন্তু কি আছে ঘরে যে তাই দেবে? জিলিপি ক'খানা আনলে আনন্দ ভালই করবে। চার পয়সায় আটখানা জিলিপি পাবে। কোন কোন দিন ফাউও পাওয়া যায় এক-খানা। দু'জনে চারখানা করে মুখে দিয়ে তবু একটু জল খেতে পারবে।... দুর্গা পেতলের কলসীটা কাঁখে করে ঘাটের পথেই পা বাড়ায়।

গঞ্জ থেকে আধ মণ মোটা সেদ্ধ চাল কিনে আনে আনন্দ এক টাকা চৌদ্দ আনা দিয়ে। এক আনার আনে জিলিপি। বাকী চার পয়সার দোক্তা পাতা ও চিটে গুড়। তামাক ফুরিয়ে গেছে। তামাক না হলে পুরুষ মানুষের চলে কি করে? ইষ্টি কুটুম এলেই বা তাকে দেয় কি?...

চার পয়সা অপব্যয় হয়েছে দেখে দুর্গা মনে মনে বিরক্তি বোধ করে। তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। ইচ্ছে করেই বলে না। সংসারে যখন আছে তখন ওকে ওর অভ্যাস মতো জিনিষ দিতেই হবে। তা ছাড়া সত্যিই তো দীনু বৈরাগীও তো এক ফাঁকে এসে পড়তে পারেন। নতুন কুটুম, এক ছিলুম তামাক দিয়ে ভদ্রতা না করতে পারলে ভাববেন কি?...খরচ যদি কমাতে হয় তাহলে তা আসল খাওয়া কমিয়েই কমাতে হবে। চার বেলার পরিবর্তে দু'বেলা খেয়েই দুর্যোগের সঙ্গে লড়া উচিত। তবেই যদি আসে সুদিন।....

ঘরে এক ফোঁটা কেরোসিন নেই। কৃষ্ণপক্ষের ঘুটঘুটে অন্ধকার। কুপি না জ্বালিয়ে রাত্রে রান্না করা অসম্ভব। খাওয়ার পাট না হয় কোনরকমে দাওয়ায় বসে চুকানো যাবে। কিন্তু...সবদিক ভেবে চিন্তে দু'বেলার ভাত এক বেলাই বেঁধে রাখে দুর্গা। শুধু দু'বেলার মতো। তাই পরের দিন আর সকালের জন্য পান্তা থাকে না। একদিন খেয়ে দশদিন উপোস দেওয়ার চেয়ে অল্প অল্প খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাত্র সামান্য ক'টা টাকা পুঁজি।

এ টাকা ফুরুলে গত্যন্তর নেই। বছর না ঘুরতেই যদি ঘর দোর বাঁধা দিতে হয় তা হলে সমাজে বাস করা দুষ্কর হবে। হয়তো কুসুম বেয়াইন বেঁকে বসবেন ছেলের বিয়ে দিতে। বেচা-কেনা ঘরের সঙ্গে কে আর কাজ করতে চায়? লোকে তো এমনিতেই খুঁত ধরতে ওস্তাদ। মইনীকে নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা।...ইতস্ততঃ চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্তও ঘুমোতে পারে না দুর্গা। আনন্দ নিজের ঘরে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। ময়নাও হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। না, মিছে আর ভেবে কি হবে? যা করেন শ্রীমধুসূদন।...হাতে মুখে জল দিয়ে ময়নাকে বুকে জড়িয়ে দুর্গা শুয়ে পড়ে। হয়তো বা ঘুমিয়েই পড়ে।...

ভোরে উঠেই আবার সেই সমস্যা। আনন্দর আর যত দোষই থাক ঘুম থেকে ও খুব ভোরেই ওঠে। হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে। খালি পেটে হুঁকোও টেনেছে দু'বার। পেট এখন ফাঁকা গড়ের মাঠ। হু হু করে জ্বলেছে। দেখতে দেখতে রোদ প্রায় পৈঠার ওপর এসে পড়লো। কিন্তু দিদি যে খাবার কথা মুখেও আনছে না। লোকে কি না খেয়ে মরবে নাকি?...

পেছন ফিরে ঠাকুর ঘর নিকোচ্ছিল দুর্গা, আনন্দ ফেটে পড়ে, অ দিদি, এত বেলা অইচে কিচু খাওয়ন লাগব ত?

আব্দার শুনে দুর্গার বড় বিরক্তি বোধ হয়। এত বড় জোয়ান মরদ, ঘটে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে! একরত্তি মেয়ে, কই আমার ময়না তো কিছু খেতে চাচ্ছে না? ওর হলো কি!...রাগে ঝংকার দিয়েই উত্তর করে, খাইবার দিমু ঘরে আচে কি? রান্দন হউক ভাত খাইচনে।

বারে, হ্যাত দুপইরে খামু। এহন কি দিবা? দুইডা পান্তাও রাখ নাই?

না, গলার স্বর গম্ভীর করেই উত্তর করে দুর্গা।

জানইত সকালে দুইডা পান্তা খাই। রাইত্রের চাইল দুইডা বেশী কইরা নিবার পারলা না, অভিমানের সুর আনন্দর কণ্ঠে।

বেশী কইরা নিমু চাইল আছে কোহান থনে? ক্ষ্যাত খামার কি তুই কিচু থ্যাহচ?

হ্যার লেইগা তুমি খাইবার দিবা না? দুইডা বাসি ভাত, তাও না!

না, দিমু না। ইহানে বইহা তর চাইর বেলা গিলনের কাম নাই।

আনন্দ বোধ হয় এবার সত্যি সত্যি ব্যথা পায়। মুখখানা কাঁচুমাচু করে দিদির দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু ব্যথাটা আনন্দর চেয়ে দুর্গাই বেশী পায়। ছি ছি ছি, সামান্য দুটো

খাওয়া-থাকা নিয়ে এমন করে বলতে পারলে ও ! ছোট ভাই, ঘরে মা বাবা ছেলে বউ কেউ নেই। একরকম নির্বোধ বললেই হয়। নয়তো এতটা বয়সে কেউ কখনো খাবার জন্য এ রকম করতে পারে ?...নারী হৃদয় মোচড় দিয়ে ওঠে দুর্গার। বাঁকে করে দই চিঁড়ে, গুড় নিয়ে বাড়ির উঠান দিয়েই হরিচরণ ঘোষ যাচ্ছিল। দুর্গা ওকে ডাকে। গঞ্জ থেকে প্রায় প্রতিদিন সকালেই ফেরি করতে আসে হরিচরণ। দই, চিঁড়ে, গুড়, সন্দেশ, জিলিপি নিয়ে প্রায় মণ দুই হবে। অধিকাংশ দিনই চরস্ফুটনগরে কাবার হয়ে যায়। কোনদিন চরথল্লা পর্যন্তও যেতে হয় হরিচরণকে। চরথল্লায় অবশ্য অন্য ফেরিওয়ালা আছে। তবু হরিচরণ গেলে কেউ তাকে ফেরাতে পারে না। যে এক সের নিয়েছে তাকে দু'সের গছিয়ে আসে। দাম—তা দামের জন্য ভাবনা কি ? আজ না পারো কাল দিয়ো। কাল না পারো পরশু...

হরিচরণ কাঁধ থেকে বাঁক নামিয়ে জিরোতে থাকে। দুর্গা পেটরা খুলতে ঘরে ঢোকে। আনন্দর সকল ভাবনা উবে যায়। মহাখুশী হরিচরণকে দেখে। আহা, কি স্বাদ ঘোষের পো'র 'মাক্কইনা দইয়ের'। রসনার রস চেপে এক কলকে তামাক সেজে এনে হরিচরণকে দেয়। হরিচরণ যেন হাতে স্বর্গ পায়—আনন্দও। আরো একখানি মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে মুখ ময়নার।

পেটরা খুলে একটা টাকা বার করে এনে আনন্দর হাতে দেয় দুর্গা। টাকা হাতে নিয়ে আনন্দ জিজ্ঞেস করে, এক টেকার দই চিড়াই রাকুম ?

নারে, চাইর আনার রাক। তুই আর ময়না খাবি, দুর্গা উত্তর করে।

তুমি খাইবা না ?

না, আমার সর্দি লাগচে। ভাত অইলে আমি ভাতই খামু।

আনন্দর মাথায় আর বেশী প্রশ্ন যোগায় না। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বাঁকের সামনে। মাফ জোখ সব ভাল করে দেখে নিতে হবে।

হরিচরণ তাড়া দেয়, কওনা পুত্রা, কি দিমু ?

আরে রাক, দই তোমার কেমুন আগে চাইখা দেহি, নিজের ডানহাত খানা বাড়িয়ে দিয়ে হরিচরণের প্রশ্নের জবাব দেয় আনন্দ।

হরিচরণ চামচে দিয়ে কিছুটা দই ওর হাতের ওপর দিতে দিতে মন্তব্য করে, একটু ফাউ খাইবার চাও খাও। হরিচরণের মাক্কইনা দই আবার চাইখা ছাহন লাগে নাকি ?

আনন্দ সে প্রশ্নের কোন সরাসরি জবাব না দিয়ে ভ্রূ কুঁচকিয়ে বলে, তা চলবার পারে কোনরকমে। এহন ভাও কি কও?

তোমার আর ভাও জিগাইবার লাগব না। কত দিমু কও?

না না, দর ভাও না কইলে আমি নিমু না। হেষে যে তুমি গলা কাটবা তা অইব না।

দুইআনা স্যারইত (সের) বেচবার নৈচি। তা তুমি যহন তামুক খাওয়াইলা তহন তোমার থনে আর নাব না-ই করলাম। ছও পয়সা স্যারই দিয়।

ইস্, টানা দুদের দই, তা আবার ছও পয়সা স্যার! কাইল বাজারে দুদের দর কি গেচে তা বুজি আমি জানি না ভাবচ?

আরে রাকত তোমার বাজার ভাওয়ের কতা! আদার ব্যাপারির আবার জাহাজের খবর!

আনন্দ হয়তো আরো কিছুক্ষণ দর কষাকষি করতো। কিন্তু দুর্গা এসে বাধা দেয়, দর ভাও রাকত। ঘোষ মশয়, এক স্যার দই, এক স্যার চিড়া আর আধ স্যার গুড় দ্যান।

হরিচরণ তাই মেপে দেয়।

দাঁড়ি পাল্লার দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে আনন্দ। মাপা হয়ে গেলে চীৎকার করে ওঠে, কই, হর (সর) দিলা না?

হরিচরণ চামচে দিয়ে দইয়ের সর কিছুটা তুলে দেয়।

আনন্দ আবার চীৎকার করে ওঠে, ফাউ দ্যাও?

হরিচরণ উত্তর দেবার আগে দুর্গা এবার ধমক দেয়, একবার ত ফাউ খাইচস। আবার কতবার ফাউ দিব তরে?

দুর্গার কথার কোন জবাব না দিয়ে হরিচরণকেই পুনরায় বলতে থাকে আনন্দ, কি গ ঘোষের পো, কওত, দুদে হাত পড়ব নাকি? জলের উপুর দিয়াই যাইব না?

হাসতে হাসতে হরিচরণ উত্তর দেয়, না, পুত্রার লগে আর পারন যাইব না। নেও—ধর, বলে আর এক চামচ দই ফাউ দেয়।

দাম নিয়ে উঠে যায় হরিচরণ। আনন্দ টাকার ফেরত সাড়ে বারো আনা পয়সা হাতে নিয়ে উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে পরখ করে দেখে। দুর্গা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, পয়সার ঝামেলায় নিজে না গিয়ে দিদির হাতেই ওটা তুলে দিতে

যায়। এক এক করে বারো আনা গুণে দিয়ে দু' পয়সা হাতে রেখে আবার বায়না ধরে আনন্দ, বিড়ি ফুরাইয়া গেচে, পয়সা দুইডা নিমু?

আগে হলে হয়তো দুর্গা ঝাঁজিয়ে উঠতো, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই কোমল প্রাণে কাঁটা ফুটেছে। তাই আর না বলতে পারে না।

আনন্দর আজ পোয়া বারো। একসঙ্গে দই, চিঁড়ে, বিড়ি। উল্লাসে ময়নাকে ডাকতে থাকে, এই মইনী, খাবিত শিগ্‌গীর আয়। ফুরাইয়া গেলে কইলাম আমি জানি না।

ময়না আসে। মামা-ভাগনীতে মিলে খাওয়ায় মন দেয়। দুর্গা দেখে দেখে হাসে। ভাবে, কত অল্পে এরা সন্তুষ্ট। ভগবান, তাই আমি জোটাতে পারছিনে। তুমিই জানো কি আছে অদৃষ্টে।...ঘর দোর নিকিয়ে কলসী কাঁখে ঘাটের দিকে রওনা হয় দুর্গা।

॥ ১৫ ॥

বিয়ের সামান্য ক'টা মুখ-দেখা টাকা, ক'দিনেই উবে যায়। কিন্তু রাক্ষুসে অভাব মেটে না। মাত্র তিনটে প্রাণীর সংসার। তবু এই তিনজনকেই এক একটা খুদে রাক্ষস বলে মনে হয়। গোলায় যখন খাবার মজুত থাকতো তখন মনে হতো, ওরা যেন কেউ খেতেই পারছে না। কম খেয়ে খেয়ে শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। ময়নাকে তো সেদিনও ধরে বেঁধে ভাত খাওয়াতে হয়েছে। আর আজ? আজ যেন থালা ভর্তি করে ভাত দিলেও ময়না না বলে না। যত দেবে ততোই যেন খাবে।

গোলার মজুত দিন কয়েকের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেল। অসময়ে জল ঝড় হওয়ায় রবিশস্যও ক্ষেতেই পচেছে। এখন সম্বল মাত্র গোটাকয়েক থালা, ঘটি, বাটি আর চালের টিন ক'খানা। বেচে খেলে দু'দিনেই সাফ হয়ে যাবে।...দুর্গা মহা ভাবনায় পড়ে। চালই হোক আর থালা ঘটি বাটিই হোক—কিছুই আটকাতো না যদি ময়নার বিয়ে হয়ে যেতো। এখন কাল হয়েছে কাল-অশৌচটা। এগুবারও উপায় নেই পেছুবারও উপায় নেই। বৈরাগী-গিন্নী এপর্যন্ত আছেন ভালই। কিন্তু কখন যে কি দেখে কি হবেন তা বলা যায় না। মুখপুড়ী ক্ষেন্তী তো দিন দিনই গজরাচ্ছে। একবার যদি ওর কথা কানে তোলেন উনি তা হলে তো সর্বনাশ। কোন্ ছেলের

মা তার ছেলের অমঙ্গলের সম্ভাবনা জেনেও বিয়ে দিতে রাজী হয়? হোক না পাকা কথা। চরের মোড়ল দীনু বৈরাগী। কার সাধ্য তার ওপর কথা বলে। না না, ঘরের কথা এখন কিছুতেই বৈরাগীর কাছে বলা যেতে পারে না। না খেয়ে মরলেও না।...অনেক ভেবে-চিন্তেই দুর্গা সংকল্পে দৃঢ় থাকে।

কিন্তু যুক্তি দিয়ে মনকে বাঁধা গেলেও পেটকে বাঁধা যায় না। অপ্রতিহত গতিতেই চলে তার তাড়না। দুটি অপগণ্ড নিয়ে সংসার। একটি মুখ বুজে থাকলেও আর একটি তা পারে না। তার চাই ঘুম থেকে উঠেই বাটি ভর্তি গুড়-মুড়ি—থালা ভর্তি ভাত। ধরতে গেলে নিজের কথাটাই বা কম কি? দিনান্তে সামান্য কিছু মুখে না দিলে বাঁচা যায় কি করে? আর আজ ওই যদি না বাঁচে তা হলে ময়নার কি গতি হবে? কিন্তু সামান্য যা চাই তাইবা আসবে কি করে? রামকান্ত বলছিলেন কোন ভয় নেই। দরকার হলেই যেন ওঁকে জানানো হয়। বেশ, সেই ভাল, ওঁকেই মনের কথা খুলে বলব। শুনেছি, কুমার বাহাদুরের কাছে ওঁর খাতির আছে। যদি আর কিছু টাকা নিয়ে দিতে পারেন উনি।...

সন্ধ্যার পর রামকান্ত আসে। আনন্দ গিয়ে ডেকে আনে। বড় ঘরের দাওয়ার ওপর একখানা জলচৌকি টেনে ওকে বসতে দেয় দুর্গা। গলবস্ত্র হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। আনন্দ আলসের আগুনে যত্ন করে এক ছিলুম তামাক সেজে দেয় তাড়াতাড়ি। খুশীতে ডগমগ রামকান্ত। ফুরুক্ ফুরুক্ শব্দে হুঁকো টানতে থাকে। মধু বেঁচে থাকতে অনেকদিন ও মণ্ডল বাড়িতে এসেছে। কিন্তু সে শুধু মধুর সঙ্গেই বাক্যালাপ। দুর্গার মুখখানাও ভাল করে দেখতে পায়নি। ঘোমটার আড়ালে যেটুকু দেখেছে তাতেই মনে হয়েছে—দুর্গা পরমাসুন্দরী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওর আচার ব্যবহার। মধু মরেছে সেও প্রায় মাস কয়েকের কথা হলো। কিন্তু শ্রাদ্ধ শান্তিতেও ওর মুখখানা ভাল করে দেখা যায়নি। আজ সেই দূরের দুর্গা স্বেচ্ছায় কাছে এসেছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। এখন আর ওর সেই আড়ষ্টতা নেই। মুখ ফুটেই বলতে হবে মনের কথা....ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে এক ঝলক তাকায় রামকান্ত। মনে হয়, একদা শহর জীবনে যাদের কৃত্রিম জলুস দেখে ও মূর্ছা গিয়েছে দুর্গা তাদের চেয়ে অনেক—অনেক বেশী সুন্দরী। হ্যাঁ, দুর্গার কোন বাসনাই ও অপূর্ণ রাখবে না।......

প্রণাম করে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে দুর্গা। ঘরের বউ, কোনদিন বাইরের

কোন পুরুষের কাছে মুখ খোলেনি। আজো পারে না। কি করে কাঙালের মতো ভিক্ষা মাগবে?—দুর্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপিয়ে ওঠে।......

কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখ তুলতেই রামকান্তর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে রামকান্ত, তোমার কি কোন কথা আছে বৌমা? আমাকে আবার এক্ষুনি হরিসভায় যেতে হবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দুর্গার। ঘোমটটা আর একটু টেনে বলে, হ্যা, আপনারে একটা কথা কইবার চাই।

বেশ বেশ, বলো। আমি তোমার ঘরের লোক—আমাকে আবার অতো সংকোচ কিসের? রামকান্ত আবার এক ঝলক চোখ তুলে তাকায়।

দুর্গা আপন মনেই হোঁচট খায়। গোসাঁই ঠাকুর বলে কি গা! এযে দেখছি খাঁটি কোলকাতার কথা! বড় মামার ছেলে গদাইদাও এমনি কথা-বার্তা বলতেন। সাতবছর কোলকাতায় ছিলেন গদাইদা। বেশ মিষ্টি করে কথা বলতেন। কিন্তু বার বার অমন মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন উনি! ...দুর্গা রামকান্তর কথায় সাড়া দিতে পারে না।

রামকান্ত ওকে নিরুত্তর দেখে আবার তাড়া দেয়, কই, কি বলবে বলো?

দুর্গা এবার সংকোচের সঙ্গেই মুখ খোলে, আপনার লগে একটা পরামশ্য আছে ঠাকুর মশয়।

বেশ তো বলো?

দুর্গা তবুও সহজ হতে পারছে না দেখে রামকান্ত বুঝে নেয়, নির্বোধ আনন্দটার সামনে হয়তো ও কিছু বলতে চায় না। তাই আনন্দকে তাড়াবার জন্যই ফন্দী আঁটে, ওরে আনন্দ, একবার দেখে আয় তো কীর্তনের লোক সব জড় হয়েছে কি না? আমার তো দেখছি যেতে একটু দেরিই হবে।

কলকে প্রসাদের জন্য কাছে বসে আঁকুপাঁকু করছিল আনন্দ। কিন্তু রামকান্ত ওকে সেদিক থেকে কোন সুযোগ না দিয়ে তাড়াতে চাচ্ছে দেখে মনে বড় কষ্ট পায়। বার বার ফ্যালফ্যাল করে হুঁকোটার দিকে তাকাতে থাকে।

চতুর রামকান্তর পক্ষে আনন্দর মনের কথা বুঝতে দেরি হয় না। হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নামিয়ে দিয়ে বলে, নে, দুটো টান দিয়ে যা।

আনন্দ তাড়াতাড়িতে দুটো টান দিয়েই ঠোঁট উল্টায়, কিছুই রাকেন নাই দেব্‌তা। কথাতেই আচে, "বাদুর চোষা নারকল আর বামন চোষা হুক্কা", অর মদ্যে আর কিচু পাইবা না।

হ্যাঁরে হ্যাঁ, আর এক কল্কে সেজে খেয়ে যা, হাসতে হাসতেই রামকান্ত জবাব দেয়।

আনন্দ তাই হয়তো সাজতো। কিন্তু দুর্গার চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতেই বলে, না দেব্‌তা, আমি এহন যাই। খবরডা লইয়া আহি।

আনন্দ চলে যায়। রামকান্ত একটু নড়েচড়ে বসে। একটু ইতস্ততঃ করেই জিজ্ঞেস করে, ময়না কোথায়? আর এক কল্কে তামাক হলে সত্যি বড় ভাল হতো। তামাক না হলে মাথায় বুদ্ধি খোলে না।

দুর্গা ঘোমটার ভেতর মুখ রেখেই বলে, ময়না গেচে অর সইয়ের বাড়ি। এহনই আইহা পড়ব। তা আমিই সাইজা দেই।

তুমি তামাক সাজবে! না না থাক, দরকার নেই, বাধা দেয় রামকান্ত।

দুর্গা বলে, হার লেইগা কি? আপনে একটু বহেন।

আনন্দর ঘরের দাওয়ার ওপরই রয়েছে সাজসরঞ্জাম।

দুর্গা বিনা দ্বিধায় গিয়ে সাজতে থাকে। রামকান্ত ভেবে পায় না, কি ওর গোপন পরামর্শ! যে মানুষ ভুলেও কোনদিন ঘোমটা খুলে মুখোমুখি হয়নি সেই মানুষ একা বাড়িতে ডাকছে, তাও আবার রাতের বেলায়, বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

ভাববার বেশীক্ষণ সময় পায় না রামকান্ত। দুর্গা কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। আঃ, কি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ওর ঢলঢলে মুখখানা! রামকান্ত সহসা যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে নিতে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

চোখে চোখ রাখতে পারে না দুর্গা। দৃষ্টি দিয়ে রামকান্ত যেন ওকে ন্যাংটো করে দেখছে। বড় লজ্জা পায়। হুঁকোটা তাড়াতাড়ি রামকান্তর হাত দিয়ে ঘোমটাটা আরো একটু বড় করে টেনে দেয়।

রামকান্ত হয়তো কিছুটা ক্ষুণ্ণই হয়। ডেকে এনে কেন এ অপমান? ওকি যেচে এসেছে কারো কাছে? না না, বুঝবার ভুল। গেঁয়ো বউ—লজ্জা তো একটু থাকবেই। আমাকে ও অপমান করতে যাবে কেন? আপনজন ভেবেই না এমন নিরালায় ডাকতে সাহস পেয়েছে।...

হুঁকো টানতে টানতে বুকে বল পায় রামকান্ত। আবেগ নিয়েই বলে, কি বলবে বলো নাগো গিন্নী?

গিন্নী কি গোসাঁই ঠাকুর া, এভাবে একা বাড়িতে ওঁকে ডেকে আনা ভাল হয়নি। আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। ময়নাটাও যে সেই কখন গিয়েছে ফিরবার নাম নেই। ভয় হতে থাকে দুর্গার।

ওকে নিরুত্তর দেখে রামকান্তও ভাবনায় পড়ে। সম্বোধনটা হয়তো একটু বেফাঁসই হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি শুধরে নিয়ে বলে, আমার তো দেরি করা পোষাবে না বউ-গিন্নী। যা বলবে শিগগীর বলো।

গিন্নী শব্দের বাম তটে আর একটা শব্দ যোগ হতেই দুর্গা নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করে। একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তেই বলে, কইছিলাম কি—আমার একটা উপুকার করণ লাগব আপনার।

বিলক্ষণ, তা এতে এত সংকোচের কি আছে? কি করতে হবে বলোই না?

ভরসা পেয়ে দুর্গা সোজাসুজিই উত্তর দেয়, ঘরের কতা আর আপনারে কি কমু! হাতে একটাও পয়সা নাই। তাই কইচিলাম, দয়া কইরা যদি কুমার বাহাদুরের কাচের থেইকা কিছু কর্জ লইয়া দ্যান।

এ আর এমন কি শক্ত কাজ! তবে উনি কাছারিতে নিজে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নায়েব গোমস্তার কাছ থেকে কিছু হবে না। তা পাঁজিতে যা লিখেছে তাতে জল এবার তাড়াতাড়িই এসে পড়বে। বোশেখের প্রথম দিকেই হয়তো গ্রীনবোট ঘাটে এসে লাগবে।

বৈশাক মাস! হায়রে এহনো অনেক দেরি! দুর্গার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

তা তোমাকে বেশী কিছু ভাবতে হবে না। এ কদিন আমি যা হোক করে চালিয়ে নিতে পারবো।

আপনে চালাইবেন! আপনার ত খুব কষ্ট অইব।

আমার আর তোমরা ছাড়া আছে কে। তোমাদের দিয়েই তোমাদের করবো। আচ্ছা এই আধুলিটা এখন রাখো। সঙ্গে তো আর বেশী কিছু নেই, কাল আবার দেখা যাক।

না না, আইজ আমার না অইলেও চলব। আপনে দ্যাহেন, দুই একদিনের মধ্যে আর কোন ব্যবস্তা অয় কিনা।

এখন আর অন্য কোন ব্যবস্থা হবে না বউ-গিন্নী, আধুলিটা তুমি রাখো। ছেলেপুলেরা এসে পড়লে আবার লজ্জায় পড়বে, হুঁকো হাতে উঠে গিয়ে

দুর্গার হাতের মধ্যে গুঁজে দেয় রামকান্ত আধুলিটা। কোমল স্পর্শে সারা অঙ্গে চলে বিদ্যুৎ শিহরণ।

দুর্গাও থ বনে যায়। ভাবতে পারেনি রামকান্ত এরকম করবে। আধুলিটা হাতে করেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে রামকান্ত, তোমার কোন দ্বিধার কারণ নেই। কর্জ পেলে তুমি না হয় এ পয়সা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো।

যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আজ সেই কাজই দুর্গাকে করতে হয়। তেজ দেখিয়ে রামকান্তকে পয়সা আট আনা ফিরিয়ে দেয়া যায় বটে কিন্তু তাতে ওর নিজের ক্ষতি ছাড়া আর কারো কোন ক্ষতি হবে না। রামকান্ত ছাড়া ধারে কাছে এমন কেউ নেই যার কাছে মনের কথা খুলে বলা যায়। রাত পোহালে তিনটে প্রাণীর মুখের গ্রাস ওকে যোগাতে হবে। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। মেয়েমানুষ এর চেয়ে আর ও কি করতে পারে? পয়সা তো এমন চীজ্ যে চাইতে গেলে আত্মীয়ও পর হয়ে যায়। সেই ভাল, কর্জ পেয়ে রামকান্তর এ ঋণ ও সুদে-আসলে শোধ করে দেবে।...মনে মনে চিন্তা করে খোলাখুলিই বলে দুর্গা, তাহলে খাতায় লেইখা রাইখেন। কুমার-বাহাদুরের টেকা পাইলে আপনারে দিয়া দিমু।

রামকান্তর মনে খুশীর বান ডাকে। নিজের মনের মতো করেই ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে থাকে। স্বপ্নজড়িত কণ্ঠেই বলে, বেশ লিখে রাখবো। তবে জানো কি বউ-গিন্নী, সংসারে শুধু পয়সাটাই বড় নয়। দেবার এবং নেবার আরো অনেক কিছু আছে।

সহজ কথা সহজভাবে নিয়ে দুর্গা উত্তর করে, তাইত কই ঠাকুর মশয়, কোতায় আপনারে দিমু—তা না আপনার কাচেই হাত পাতলাম।

নারায়ণ জানেন, তোমার হাত যেন আমি ভরে দিতে পারি।

হেই আশীর্ব্বাদই করেন ঠাকুর মশয়।

আশীর্বাদ, নিশ্চয় আশীর্বাদ করবো। তোমরা ছাড়া আর আমার আছে কে সংসারে? আজ উঠি তাহলে। মোড়ল হয়তো আমার জন্য হাঁপিয়ে উঠছে। কাল আবার আসবো।

উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

দুর্গা হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিতে যায়। আর একবার চোখোচোখি হয় রামকান্তর সঙ্গে।

চারদিক জুড়ে থৈ থৈ করছে নিঃসীম অন্ধকার। কেরোসিনের অভাবে কুপি জ্বালা হয়নি। আকাশে শুধু লক্ষ তারার ঝলমলানি। সেই ক্ষীণ আলোতেই সলজ্জ দুটি কালো হরিণ চোখ পঞ্চশর হানে রামকান্তর মনন-মনে। চলতে গিয়েও চলতে পারে না রামকান্ত। থমকে দাঁড়ায়।

দুর্গা হুঁকোটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবতার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে থাকে।

তীরবিদ্ধ রামকান্ত ধীরে ধীরে ওর পিঠের ওপর হাত বুলাতে থাকে।

গঞ্জের পারে ভাঙন লেগেছে। সহসা বিরাট একটা চাপ ধসে পড়ে বংশীর জলে। শব্দ শুনে চমকে ওঠে রামকান্ত। আনন্দকে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখা যায়। রামকান্ত তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেয় বৈরাগী বাড়ির দিকে।

॥ ১৬ ॥

প্রবাদ আছে 'রেস' আর মদের পয়সা ভূতে যোগায়। কথাটা ঘুরিয়ে বললে হয়তো এই দাঁড়ায়, নেশামাত্রই তাই। মদের চেয়েও মাতাল করা মৌতাতে উন্মত্ত রামকান্ত। হিসেব করে দেখতে গেলে নিজের পেট চলাই ওর পক্ষে দুষ্কর। নিয়মিত ভাগবত পাঠ আর পূজা-পার্বন করে যে অর্থ হাতে আসে তা দিয়ে কোনরকমে পেট চলতে পারে—নেশা চলে না। তাই নেশার পয়সা বোধ হয় রামকান্তকেও ভূতেই যোগায়।

রামকান্তর চোখে বড় নেশা দুর্গা। সেদিন সেই যে সন্ধ্যাবেলা দুর্গাকে মুখোমুখি দেখে এসেছে এ পর্যন্ত আর ভুলতে পারেনি। গাঁজার নেশাও সময় সময় ফিকে হয়ে যায় দুর্গার চড়া নেশার কাছে। শয়নে স্বপনে ধ্যানে দুর্গাই ওকে অহোরাত্র পাগল করছে।

প্রেমে পাগল রামকান্ত ইতিপূর্বেও বার কয়েক হয়েছে। প্রথম পাগল করে চিত্রতারকারা—কিশোর যৌবনের সে এক পরম সন্ধিক্ষণ। তারপর চা-বাগানের স্বাস্থ্যবতী খাসিয়া মেয়েরা। ছিটে ফোঁটা আরো অনেকেই করেছে। কিন্তু এই বিপত্নীক জীবনে দুর্গাই ওকে প্রাণে মারছে। তিল তিল করে তুঁষের আগুনে পুড়িয়ে মারছে ওকে দুর্গা।

আয়ের চেয়ে ব্যয়াধিক্য রামকান্তর জীবন-ভর সমস্যা। বর্তমান আয়ে পেট পুরে ডাল ভাত তরি-তরকারি খাওয়া চলে, নেশা চলে না। কিন্তু রামকান্ত

কায়দাকানুন করে সে নেশাও এপর্যন্ত বজায় রেখে চলেছে। নিদেন দৈনিক এক দু'আনি পরিমাণ গাঁজা ওর চাই-ই। দুপুরের আহারের পর একমাত্রা আর বিছানায় যাবার আগে আর-এক মাত্রা। না খেলে পেট ফুলে ঢোল হবে। সারারাত ঘুমই হবে না। শিষ্যদের মাথায় হাত বুলিয়ে এখনো এ ঠাট বজায় আছে। অনুপানের আধ সের টাক দুধও ঠিকমতোই বরাদ্দ আছে। প্রতিদিন ভাগবত পাঠে বসবার আগে কুসুম বেশ ঘন করে জ্বাল দেয়া একবাটি গরম দুধ হাজির করে। সেটুকু চুমুক দিয়েই ও পাঠে বসে।

বেশ আছে রামকান্ত। রমেন্দ্র নারায়ণ উপস্থিত থাকলে দু' একপাত্র রঙিন পানিরও অভাব হয় না। সঙ্গে এটা-সেটা সুস্বাদু ভোজ্য বস্তু। দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল। কিন্তু কাল হয়েছে দুর্গা। কি কুক্ষণে যে ওর সঙ্গে দেখা হলো—এখন দিয়ে থুয়ে কূল নেই। ধার কর্জ করে এ কদিনের ভেতর খুব কম করেও পাঁচ টাকার ওপর দিতে হয়েছে। পাড়া গাঁ, চাইলে এখানে এক সের চাল কর্জ পাওয়া যায়, কিন্তু একটা ফুটো পয়সা কারো কাছে পাওয়া যায় না। নগদ পয়সার বড় কাঙাল এখানকার মানুষ। তবু রামকান্ত যাহোক করে এ পর্যন্ত চালিয়ে এসেছে। বরাদ্দ গাঁজার পয়সায় দিন দুই টান পড়েছে। অনেক দিনের নিয়মিত অভ্যাস। ছেদ পড়ায় রাত্রে ঘুম হয়নি—পেট ফুলে উঠেছে। তবু দুর্গাকে চাহিদা মতো পয়সা না দিয়ে পারেনি। দুর্গাও সরল মনেই সে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে—। এক এক করে দিন গুণছে। ঘাটে জল আনতে গিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে দেখে কাছারির দিকে। গ্রীনবোট ঘাটে লাগলেই ঋণ পাবে। একদিনে শোধ করে দেবে রামকান্তর সমস্ত ধার দেনা।...

স্বপ্ন রামকান্তও দেখছে। দুর্গাকে ঋণ নিয়ে দিতে পারুক আর না-ই পারুক, নিজের জন্য অন্ততঃ কিছু আদায় করতে পারবেই। আর তা যদি পারে তাহলে একদিন রাতের অন্ধকারে সরে পড়বে এখান থেকে দুর্গাকে নিয়ে।... কিন্তু একি হচ্ছে! চোত মাস যে শেষ হতে চললো, জল এক বিন্দু বাড়ছে না! গ্রীনবোট ঘাটে না লাগলে যে আর একটা পয়সাও পাবার উপায় নেই। এখন তো ঘাটে পথে বার হওয়াই দায় হয়ে উঠলো! দু'চার আনার জন্যই লোকগুলো অস্থির করে তুলছে। পাড়া গাঁয়ের ভূত না হলে এমন কখনো হয়! শহরের লোক তো দু'চার আনাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। তাগাদা করা তো দূরের কথা সামান্য এ পয়সা ঋণের মধ্যেই ধরে না কেউ।

না, এ হতভাগা দেশ থেকে পালাতেই হবে। ভদ্রলোক কেউ কখনো এখানে থাকতে পারে?…রামকান্ত দিন দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

দু' রাত্র ঘুম নেই রামকান্তর চোখে। মাথার শিরাগুলো সব ফুলে উঠে দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ কান দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বিছানা ছেড়ে উঠে হাতে পায়ে জল দিয়ে আসে রামকান্ত। না, তবু স্বস্তি নেই। শহর জীবন ছাড়ার পর দুধ কলার অভাবে যে কালনাগিনী ঝিমিয়ে পড়ছিল আজ আবার তার ফোঁস-ফোঁসানি শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ফণা তুলেই জেগে উঠছে নাগিনী। রমেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে ইয়ার্কি আড্ডায় মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙলেও এতদিন বহিঃপ্রকাশের পথ ছিল না। আজ দুর্গাই ওকে সে সুড়ঙ্গ পথের সন্ধান দিচ্ছে। কেন ও ওকে নিভৃতে ডেকে পাঠালো? কেন হাত পেতে সাহায্য চাইলে ওর কাছে? ওকি জানে না, রামকান্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ! অর্থের তাড়নায় চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে শহর ছেড়ে এই নরকে! অর্থ-ই যদি থাকবে তাহলে কি দরকার ছিল ওর আত্মাকে বঞ্চিত করে এই ভণ্ডামী করবার? সুর করে ভাগবত পড়লেই যেন মানুষের সব কামনা বাসনা ধুয়ে মুছে যায়! না না, মিথ্যে এই ভাববিলাস। কেউ আনন্দ পেলেও ওর এতে কোন আনন্দ নেই। ও কখনো চায় না ফোঁটা তিলক কেটে সং সাজতে। হাতে পয়সা থাকলে রমেন্দ্র নারায়ণকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে ও।…

দুর্গার মোহে আচ্ছন্ন থাকলেও এতদিন ভাগবতের আসরে না গিয়ে পারেনি রামকান্ত। নয় তো চলবে কিসে? দু'চারটে পয়সা তো ওখান থেকেই আসে। চোখ বুজলে ভেসে ওটে দুর্গার প্রতিমূর্তি। রঙিন পাখা মেলে দুর্গাই ওর ধ্যান ভাঙছে। ভাগবতের ঠাকুর বাতাসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তবু ওকে মিথ্যা ভাব-গদগদ-চিত্তে বসে থাকতে হয়। তবু কীর্তনের তালে তালে দু'বাহু তুলে নাচতে হয়। ও যেন এক কলের পুতুল।…না, রামকান্ত আর পারে না। সত্যি সত্যিই বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়ল ও। দিন দুই আর আসরে যেতে পারে না। রটিয়ে দেয়, কণ্ঠনালীতে ভীষণ যন্ত্রণা—চেঁচাতে পারবে না। সংবাদ পেয়ে শিষ্যেরা দলে দলে ছুটে আসে। যে যেভাবে পারে প্রভুর সেবায় মন দেয়। রামকান্ত এক জ্বালা থেকে আর-এক জ্বালায় পড়ে। তবু যদি নগদ দু'পাঁচটা টাকা কেউ হাতে দিতো! ওর কি দু'দণ্ড একা থাকারও অধিকার নেই?…আবার ভাবে, আসুক সকলে। ওদের সঙ্গে একদিন হয়তো দুর্গাও আসবে। হয়তো নিভৃতেই

আসবে। এত করছি, সামান্য এটুকুও কি করবে না ও? কৃতজ্ঞতা বলে কি কোন বস্তু নেই সংসারে?···বিছানায় শুয়ে নিশিদিন ছটফট করতে থাকে রামকান্ত। রুগ্ন না হয়ে বিছানায় পড়ে থাকার যে কি জ্বালা তা শুধু ও নিজেই জানে। কিন্তু কই তিন দিন হয়ে গেলো, দুর্গা তো একবারও এল না! তবে কি শুধু পয়সার সঙ্গেই ওর সম্বন্ধ? না না, দুর্গা কখনো এতটা স্বার্থপর হতে পারে না। হয়তো কোন অসুবিধা আছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই হবে। নয় তো চুপি চুপি রাত্রের অন্ধকারেই বা ডেকে পাঠাবে কেন? ক্ষেন্তিটা তো কোটনামীর তালেই আছে। নিজের ছিদ্রের অভাব নেই তবু অষ্ট-প্রহর ব্যস্ত অন্যের ছিদ্র খুঁজতে। নচ্ছারটা আস্ত ছেনাল। দুর্গার পেছনে লেগেই আছে।···শুয়ে শুয়ে শিরদাঁড়া ধরে যায় রামকান্তর। নিরিবিলিতে একটু উঠে বসে। এখন আর কেউ আসবে না। গেঁয়ো ভূতগুলো কীর্তনে মেতেছে! রামকান্ত নিশ্চিন্ত মনেই উঠে বসে।

কৃষ্ণা-চতুর্দশী। রাত্রির হয়তো মধ্য-প্রহর। চারিদিক জুড়ে থম্‌থম্ করছে ঘন অন্ধকার। সমস্ত চর নিঝুম নিস্তব্ধ। গঞ্জের দোকান পাটও সব বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে দোকানীরা। চরধল্লাকে চোখেই পড়ে না। অন্ধকার ভৈরবী গিলে ফেলেছে যেন। রামকান্তর বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জীবনে পেলো কি ও। সবই যে অন্ধকার! সংসারে কে আছে ওর আপন জন? দু'দিন না হয় ভান করে শুয়ে আছে। আর ভানই বা কেন? দেহের না হলেও মনের অসুখ তো বটেই। কিন্তু কে দেখলে ওকে? দীনু বৈরাগী আর ওর ঐ সাঙ্গপাঙ্গরা? কি জানে ওরা? ওরা তো জানে শুধু চাষ-আবাদ করতে আর খেতে শুতে। হৃদয় বলে কোন বস্তু আছে কি ওদের?··· দু'দিন পেটে ভাত পড়েনি রামকান্তর। মাথাটা বোঁ করে পাক দেয়। উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ে।

বসন্তের বাতাস ধীরে বইছে। খানিক জিরিয়ে নিয়ে খিল খুলে বেরিয়ে আসে রামকান্ত দাওয়ার ওপর। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে আরো খানিকক্ষণ। দু'চোখ জলে ভরে আসে। পুঞ্জীভূত অন্ধকার যেন গিলে খেতে আসছে চারদিক থেকে। না না, ও মরবে না—মরতে পারবে না। ঐ তো দেখা যাচ্ছে মণ্ডল বাড়ি। পৃথিবীতে আর কেউ না থাক ওর দুর্গা আছে। দুর্গার কাছেই যাবে ও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো দুর্গা হাত ছানিতে ডাকছে। দুর্গা—দুর্গা—

একসঙ্গে মগজের পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে রামকান্তর। দ্রুত পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে। কিছুটা যেতেই গতি মন্থর হয়ে আসে। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে আছে কলাগাছের আড়ালে? কেউ কি পেছু নিলে ওর? চুপি চুপি বসে পড়ে কাশ বনের অন্ধকারে। একটা কেউটেই না শেষে ছুবলে খায়। উঁকি দিয়ে দেখে রামকান্ত। না না, ও কিছু নয়। মরা কলাগাছ একটা। ঐ তো হাওয়ায় দুলছে শুকনো পাতা। আবার উঠে পা চালায়। এবার আর হন্‌হনিয়ে নয়। পা টিপে টিপে মণ্ডল বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ে। ঐ তো দুর্গার ঘর। ঢেউ টিনের চাল, বেড়া। বাড়ির ভেতর এই একখানা ঘরই পাকা। মেয়ে নিয়ে এই ঘরেই শোয় দুর্গা। কলার ঝাড়কে আড়াল করে উত্তরের জানালায় এসে দাঁড়ায় রামকান্ত। ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। হায়, চাঁদও যদি উঠতো আকাশে! না, ভগবান সব দিক থেকেই বিরূপ। দুর্গা—দুর্গা, ডাকবে কি ওকে? মেয়েটা তো অঘোরেই ঘুমোচ্ছে পাশে। ডাকলে কি সাড়া দেবে না? যদি বলি, মুঠো ভর্তি টাকা এনেছি, তবুও কি না?···ওকি! ওদিকটায় অতো কুকুর ডাকছে কেন? শেয়াল তাড়া করছে বুঝি। যদি এদিকটাতেই এসে পড়ে? এত চেঁচামেচিতে কি আর কারো চোখে ঘুম থাকবে? আনন্দটা একটা আস্ত গোঁয়ার। চোর বলে ঠেসে ধরলেই গেছি।····বুকের ধুকপুকানী বেড়ে যায় রামকান্তর। পা টিপে টিপে খড়ের গাদায় এসে গা ঢাকা দেয়। থাক, কেউটেই ছুবলে খাক। ছি ছি ছি, এমনও মানুষের হয়। যার জন্য মরছি সে তো কিছুই জানলে না। সাহস থাকলে স্পষ্টই তো বলা যায় দুর্গাকে। নিভৃতে যে ডাকতে পেরেছে তার সম্বন্ধে এর চেয়ে আর বেশী কি ভাবা যায়? আমিই আহাম্মক তাই আঁকুপাঁকু করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাল স্পষ্টই শুনিয়ে দেবো, টাকা যদি চাও তবে তার জন্য বিনিময় দিতে হবে। তোমার জন্য শুধু শুধু ভিখিরী সাজতে পারবো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা উপায় করতে হয়। চাইলেই কারো কাছ থেকে অমনি পাওয়া যায় না। ···না না, এত ভাবনার কিছু নেই। মেয়েমানুষ হয়ে দুর্গা অনেকটা এগিয়েছে। শুধু টাকাই ওর কাম্য নয়। টাকা ধার ও চরের অনেকের কাছেই পেতো। নিজের স্বজাতি কুটুমের মধ্যেও রয়েছে অনেক টাকাতে মানুষ। তবু তাদের কাছে না গিয়ে আমাকে ডাকলে কেন? কি আশ্চর্য! এই সহজ কথাটাই এতদিন মাথায় আসেনি।···খড়ের গাদায় মুখ গুঁজে আকাশ-কুসুম ভাবতে থাকে রামকান্ত। কিছুক্ষণ ঘেউ-ঘেউয়ানীর পর পাড়া আবার শান্ত হয়।

রামকান্ত নিঃশ্বাস ফেলে মুখ বার করতে যাবে এমন সময় কানে আসে, এই মইনী, বাইরে যাবি নাকিল? ওঠ না—এই মইনী?…কুকুরের চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে দুর্গার। গা-টা কেন যেন ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে। ঘুম জড়ানো চোখে কিসের যেন খস্‌খস্‌ শব্দ শুনেছে বাইরে। অন্যদিন তাই একা একা বেরুলেও আজ আর সাহস পায় না।

বিপদের উপর বিপদ রামকান্তর। মণ্ডল বাড়ির নিকাশের জায়গা খড়ের গাদার পাশেই। ওরা হয়তো এখানেই আসবে। ছায়ামূর্তি দেখে চীৎকার করে হয়তো গগন ফাটাবে। এদিকে আবার দেহের সবটা গাদার ভেতর সেঁধোতে গেলেও প্রচুর শব্দ হবে। এখন করে কি ও? না, এতদিনের পাপের ফল আজ হাতে হাতেই ফলবে। হাটুরে-কিলে পিঠের হাড়গোড় আর আস্ত থাকবে না।…ভয়ে ভাবনায় ঘন ঘন ঢোক গিলতে থাকে রামকান্ত। দুর্বল দেহ থরথর করে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ খিল খোলার শব্দ হয়। রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। টেনে এক দৌড়। দুর্গাও থতমত খেয়ে যায়। এক পা মাত্র চৌকাঠে বাড়িয়েছে, চোখের ওপর দিয়ে দৌড়ে পালায় ছায়ামূর্তি। চীৎকার করতে গিয়েও কেন যেন পারে না ও। অন্ধকারের মধ্যেও ছায়ামূর্তির বাবরি বাবরি লম্বা চুল ওর দৃষ্টি এড়ায় না। ছি ছি ছি, এমন মানুষও এমন হয়! ভাগ্যিস ময়না জাগেনি! বুকের ভেতরটা তোলপাড় করতে থাকে দুর্গার। সারা রাত আর দু'চোখ এক করতে পারে না।

॥ ১৭ ॥

সাদা মনে বিষের আঁচড় পড়ে দুর্গার। ছি ছি ছি, সন্তানের মা আমি—গুরু পুরোহিত রামকান্ত। নিত্য নিয়মিত ভাগবত পড়েন। কীর্তনের সঙ্গে অঙ্গ দুলিয়ে নাচেন। তাঁর এমন দুর্মতি! মানুষ কি এমন পশুও হতে পারে! কি চান উনি? শুধু সাহায্য করতেই কি চোরের মতো চুপি চুপি এসেছিলেন দুপুর রাত্রে! তাই যদি হবে তবে পালালেন কেন? আজ বুঝতে পারছি, কি ইঙ্গিত করতেন উনি চোখে-মুখে। আমাকে কি এমনিই ভাবলেন? কি দেখলেন উনি আমার মধ্যে? গুরু পুরোহিত ভেবে নিভৃতে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলাতে কি এতই অপরাধ হয়েছে?… ঠাকুর ঘরে

পূজো করতে বসে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকে দুর্গা। পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ছি ছি ছি, এই মানুষের অন্ন আমি মুখে দিয়েছি—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলেছি! নারায়ণ—দয়াময় আমাকে তুমি মার্জনা করো প্রভু। ময়না না থাকলে বংশীর জলে এক্ষুণি আমি আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতাম। আমাকে তুমি পথ দেখাও—পথ দেখাও... বার বার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করতে চেষ্টা করে দুর্গা, বার বার ভুল হয়ে যায়। বিগ্রহের চরণে চন্দন দেয় তো তুলসী বাদ পড়ে।

সেই কোন সকালে মা পূজোয় বসেছে তবু শেষ হচ্ছে না পূজো। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে ময়নার। নেই বলতে কিচ্ছু নেই ঘরে। আনন্দ তো অনেকক্ষণ ঘুরাঘুরি করে রাগের মাথায় চলে গেছে বাড়ি থেকে। না, ও আর এ বাড়িতে থাকবে না। উপোস দিয়েই যদি মরতে হয় তাহলে ভিটেয় গিয়েই মরবে। মিছিমিছি পরের বাড়ি থেকে দশজনের টিটকিরী শুনবে না।...

রোদ প্রায় মাথার ওপর এসে পড়েছে—দুর্গা ঠাকুর ঘর থেকে বেরোয়। বেরিয়েই দেখে, খিদের জ্বালায় দাওয়ার ওপর আঁচল বিছিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ময়না। হয়তো অবশ হয়ে পড়েছে শিথিল দেহ! দুর্গার বড় দুঃখ হয়। ময়নাকে কোলে করে বিধবা হয়েছে। সেই থেকে কঠোর নিয়মের মধ্য দিয়েই চলে আসছে। একটি দিনের জন্যও ব্যতিক্রম হয়নি। তবু পেলো কি ও সংসারের কাছে? একটা মাত্র মেয়ে—উপোস দিয়েই তো মরতে চলেছে। মাথার ওপর বসে ঠোকরাচ্ছে শেয়াল শকুন। এত পূজো অর্চনা ব্রত উপবাস সবই কি তবে মিথ্যে? ঠাকুর কি শুধুই পাথর?... ভরা দুপুরেও আঁখির কোণে ঝড় ওঠে দুর্গার। না না, ও কোন মানুষের সাহায্য চায় না। যদি দাঁড়ায় তো নিজের পায়ের ওপর ভর করেই দাঁড়াবে! নয় তো ডুবে মরবে ঐ বংশীর জলে। ময়নাকেও গলা টিপে মেরে রেখে যাবে! শয়তানের লালসার টোপ ও হবে না—হতে দেবে না।...মা হয়ে যদি দুটি ভাতই দিতে না পারলো তবে বেঁচে থেকে লাভ কি?...আবার ভাবে, না, ময়নার ওপর ওর কোন অধিকার নেই। পরের ঘরের বউ ময়না। গায়ে হলুদ হয়ে যাবার পর আর বিয়ের কিছু বাকী থাকে না। কাল-অশৌচ না থাকলে এখনি ওকে পাঠাতে পারতো বৈরাগী বাড়িতে। চরে যত মন্দাই থাক দীনু বৈরাগীর বেটার বউ কখনো না খেয়ে মরতো না। মরতে পারে না।...কিন্তু সে তো গেলো পরের কথা, এখন উপায় কি? ঘরে যে

একটা দানাও নেই। আনন্দটাই বা গেলো কোথায়? একটু যদি আক্কেল থাকে? নিজের আর কি, এক পেট খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর কেউ খেলে কি না খেলে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমারই হয়েছে যতো জ্বালা।...

জ্বালা আনন্দরও। এতদিন শুধু পেটের জ্বালাতেই জ্বলছিল এখন আবার মনের জ্বালাও শুরু হয়েছে। দুর্গা ভেবে নিয়েছে, পেট ভর্তি খেয়েই রাস্তা-ঘাটে আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও। কিন্তু খাবে কি? ঘরে কি কিছু ছিল? গত রাত্রের ঘটনায় ওর হয়তো মাথারই ঠিক নেই। আনন্দ গিয়েছে গঞ্জে—ধারে যদি কারো কাছ থেকে কিছু আনতে পারে। বাড়ির সওদাপত্র তো দীর্ঘদিন ও-ই আনছে। দোকানীদের সঙ্গে চেনাশুনোও হয়েছে। চাইলে কি আর একদিনের জন্য কেউ ধার দেবে না? কিন্তু অদৃষ্টের বোধ হয় এইটেই চরম পরিহাস, প্রয়োজনের সময় মানুষ কোথাও কিছু পায় না। আনন্দও পেলো না। কিন্তু ও যে সংকল্প নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, খালি হাতে আজ কিছুতেই ফিরবে না! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেই গঞ্জে এসেছে, দিদি যদি মেয়েমানুষ হয়ে দশদিন চালাতে পারে—তাহলে পুরুষ মানুষ হয়ে ও একটা দিন চালাতে পারবেই। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, তা সে যে-ভাবেই হোক। দোকানীরা একে একে ফেরাতে থাকে, আনন্দর জিদ বেড়ে যায়। সামনেই খালাস হচ্ছিল কেরোসিনের 'ফ্ল্যাট' প্রায় পঁচিশজন মুটে কাজ করছে। টিন প্রতি মজুরি এক পয়সা। ফ্ল্যাট থেকে মাথায় করে নামিয়ে মহাজনের গুদামে তুলে দিতে হবে। সর্দারকে বলে মাজার কাপড় শক্ত করে বেঁধে কাজে লেগে যায় আনন্দ। এক এক মোটে ও দুটো করে টিন নামাতে থাকে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে উপায় হয়ে যায় নগদ একটা টাকা। আনন্দর মনে খুশীর বান ডাকে। রোজ ও এ কাজ করবে। সকলের আগে যে দোকানদার ওকে ফিরিয়েছিল বুকে টোকা মেরে তার কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ে ইচ্ছে মতো জিনিষের জন্য হুকুম করে! দোকানদারের সুর পাল্টে যায়। সদাই মাপার আগে একটা বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেয় আনন্দর দিকে। বলে, মোড়লের পো, বউনীর সময় ধার চাইলা তাই দিবার পারিনি। দরকার থাকে ত নিয়া যাও অহন।

না না, তোমাগ কাছে আর ধার চাই না। তোমরা চামার। ক্ষ্যামতা থাকে নগদ পয়সা দিয়াই জিনিষ কিনুম, বিড়ি টানতে টানতে রুক্ষস্বরে জবাব দেয় আনন্দ।

দোকানদার গাল খেয়েও আর রা করে না। হাসতে হাসতেই সওদা মাপতে থাকে।

আনন্দ আবার ধমক দেয়, মাপ ঠিক দিয় কইলাম। চাইলে য্যান্ কোন রকম গন্ধ না থাকে।

এবার দোকানদার মুখ খোলে, আগে জিনিষ খাইয়া তারপর কতা কইয়। হরি সা মাপে কাউরে কোনদিন ঠকায় না।

হ হ, অনেক সাউকাররেই গ্যাহা আচে। কত দাম অইল? পাল্টা জবাব দেয় আনন্দ—

দোকানদার বলে, সাড়ে বার আনা। এই নেও চৈদ্দ পয়সা। জিনিষ কিনবার অইলে এইহানেই আইহ। খাঁটি ওজন, এক নম্বর জিনিষ।

আনন্দ পয়সা এবং সওদা গামছায় বেঁধে উঠতে উঠতে বলে, একটু ত্যাল দিবা নাকি? বেলা অইচে, একটা ডুব দিয়া যাইতাম।

দোকানী মুচকি হেসে বলে, ত্যাল তামুক দোকানীরা সব সময়েই গাহাকের লেইগা খরচ করে, এই নেও, বলতে বলতে এক পলা সরষের তেল আনন্দর হাতের তালুতে ঢেলে দেয় দোকানী।

আনন্দ তেলটুকু মাথায় ঠাসতে ঠাসতে বেরিয়ে আসে। ময়রার দোকান থেকে চার পয়সা দিয়ে আট খানা জিলিপি কিনে ফেলে। সঙ্গে একখানা ফাউ। তারপর ঘাট থেকে পরিস্কার করে হাত, পা, মাথা, রগড়িয়ে একবারে স্নান সেরেই বাড়ি ফেরে। খুশীতে ময়নাকে ডাকতে যাবে, চেয়ে দেখে দাওয়ার ওপর ঘুমিয়ে আছে ময়না। দুর্গা জলভরা চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বেদনায় আনন্দর বুকের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে। সকাল থেকেই দিদির যেন কি হয়েছে। কথা নেই—বার্তা নেই—চাঁপা ফুলের মতো মুখখানায় কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। থমকেই দাঁড়ায় আনন্দ কলার ঝাড়ের আড়ালে!

দুর্গা করুণভাবেই চেয়ে দেখছিল ময়নাকে। কি সুন্দর কচি মুখখানা। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি হরিণ চোখ। দেখলে মায়া হয়। কিন্তু কি বরাত নিয়েই না জন্মেছে মেয়েটা। সামান্য দুটি ভাত তাও জুটছে না। ক্ষেন্তি সেদিন গাল দিলে, রাক্কুসী—হাড়-হাবাতি। একে একে সব গিলছে। বাপ ঠাকুরদাকে খেয়েছ এবার মাকেও খাবে।…শুনে বড় কষ্ট হয়েছিল সেদিন। কত আদরের ময়না, ও কিনা রাক্কুসী! এমন করে কেউ কাউকে গাল দেয়!…

কিন্তু আজ কেন যেন ওর নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে, ময়না কি তাহলে সত্যি অপয়া ? জন্মে অবধিই তো কপালে সুখ হলো না। তবে কি…না না না, ও কেন অপয়া হতে যাবে ? ষাট বালাই। লক্ষ্মী মা মণি আমার! ক্ষেন্তি যদি আর কোনদিন এ-মুখো হয় তো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।…ডাকবো কি ওকে ? না থাক, ঘুমোক। ঘুম ভাঙলে খেতে দেবো কি ? তবুও তো দুদণ্ড শান্তিতে আছে।…কিন্তু সারাদিন তো আর ঘুমিয়ে কাটবে না। জেগে এক সময় উঠবেই, তখন ? ছুটে ঘরের ভেতর যায়। ভক্তিভরে প্রণাম করে মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে। তারপর খুলে ফেলে ঝাঁপি। সিঁদুর মাখানো পাঁচটা টাকা রয়েছে। শাশুড়ীঠাকুরুণ বলে গেছেন, মা লক্ষ্মীর ঝাঁপি যেন কখনো শূন্য করো না মা। এতদিন সে আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ও। শত অভাবেও হাত ছোঁয়ায়নি। কিন্তু আজ যে ওর ময়না উপবাসী—ওর মাণিক—ওর নয়নের মণি। আজ ও কারো কথা রাখতে পারবে না। না-না-না।…দুটো টাকা মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার বাইরে ছুটে আসে দুর্গা। ভীষণ রাগ হয় আনন্দর ওপর। কাম কাজ তো কিছু করবেই না সময় মতো যে দুটো ফাই ফরমাশ শুনবে তাও নয়। ইস্, বাছার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আসুক আজ, দূর করে দেবো।….. ·

আনন্দ ভেবেছিল খাবার নিয়ে মনের উল্লাসে বাড়ি ঢুকবে। ময়নার সঙ্গে মুখোমুখি বসে গদগদ হয়ে প্রথম উপার্জনের পয়সায়-কেনা খাবার খাবে। কিন্তু দুর্গার হাবভাবে মনের সাধ মনেই চাপা পড়ে। শান্ত-ভাবগম্ভীর ভাবেই দাওয়ার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ায় আনন্দ।

এতগুলো জিনিষসমেত ওকে দেখে বিস্ফারিত চোখেই প্রশ্ন করে দুর্গা, ই কিরে, এত জিনিষ তুই কোনহানে পালি ?

আনন্দ সরল মানুষ—সহজভাবেই উত্তর দেয়, কুথায় আবার পামু? পয়সা দিয়া কিনা আনচি ?

কিনা আনচ্! ক্যারা দিচে তরে পয়সা ?

ক্যারা আবাব দিব ? উপায় কইরা আনচি !

ইস্, উপায় কইরা আনচে! অরে আমার ক্যামতার মানুষরে! ঠিক কইরা ক, ক্যারা দিচে তোরে পয়সা ? দুর্গার ভয়, রামকান্তই ওকে পয়সা দিয়েছে। কাল ফিরে গিয়ে শয়তানটা আজ আবার খাবার দিয়ে ভুলাতে চাচ্ছে। গলার স্বরে তাই তীব্র ঝাঁজ।

আনন্দ আর কথা বাড়ায় না। সোজাসুজিই বলে ফেলে উপার্জনের ইতিহাস।

দুর্গার দেহে এতক্ষণ জ্বালা ছিল এবার দুঃখে দ্রব হয়ে যায়। এও ওর কপালে ছিল! আপন মার পেটের ছোট ভাই। ওদের অভাবের জন্য আজ মুটেগিরি করলে! আর সেই পয়সাতে কেনা চাল ডাল ওকে গিলতে হবে!...

দিদির চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখে আনন্দর দু'চোখ দিয়েও অজান্তে জল গড়াতে থাকে! কে জানে, কতক্ষণ কাটতো এভাবে? ভগবানকে ধন্যবাদ যে চেঁচামেচি শুনে ময়নার ঘুম ভেঙে যায়। হাই তুলতে তুলতে উঠে বসে ময়না। একি! ওকি স্বপ্ন দেখছে নাকি? দু'দিন ভাল করে নুন ভাতও জোটেনি—আর আজ জিলিপি! চাল, ডাল, তেল নুন এক-গাদা!...ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ময়না জিলিপির ঠোঙার দিকে।

ময়না ভাল করে জেগে না উঠতেই আনন্দ চোখ পুঁছে নিয়েছে। স্বভাব সুলভ চপলতা নিয়েই বলে, তর চক্ষে রাইত দিন খালি ঘুম। কহন থেইকা ডাকবার নৈচি ঘুমই ভাঙে না। নে, জিলাপি খা, তিনখানা জিলিপি একসঙ্গে ময়নার হাতে গুঁজে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাকে আনন্দ।

চোখের জল দুর্গাও পুঁছে নিয়েছে। ঝড় বইছে বুকের ভেতরে। ধরা গলায় বলে, তুই খালি না?

দুর্গার সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আনন্দ পাল্টা জিজ্ঞেস করে, তুমি?

আমার প্যাটটা বালো (ভাল) নাই, আমি কিচু খামু না।

তবে আমার প্যাটও বালো নাই, আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ? খাইয়া নে।

পাগলামী আমি করচি না তুমি করচ? গতর খাটাইয়া পয়সা উপায় করচি হ্যার আবার দোষ কি?

আনন্দর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে দুর্গা ময়নাকে বলে, যাত মা রান্দন ঘরের থেইকা এক লোটা খাওয়নের জল নিয়া আয়!

ময়না ইঙ্গিত মাত্র উঠে যায়। দুর্গা আবার আরম্ভ করে, গতরই যদি খাটাবি তয় মৌটাগিরি করবার গেলি ক্যা? নিজেগ ক্ষ্যাতের কাম কল্লেই ত অয়। আটে বাজারে যদি মৌটাগিরি করচ তয় কি আর বৈরাগী মশয় তর বাগনীর লগে হ্যার পোলার বিয়া দিব? আমাগ বংশে কি কেউ কোনদিন মৌটাগিরি করচে?

খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে আনন্দর। তাই আর বেশী কোন কথা না বাড়িয়ে গম্ভীরভাবেই সম্মতি জানায়, তা তুমি যদি না কর তয় না কল্লাম।

হ, ও কাম আর করবি না। লোকে নিন্দা করব।

কাম করুম না তয় খাইবা কি ?

হ্যা ভাবনা আমার। তুই এহন খা।

তয় তুমিও খাও।

নারে, আমি এহন কিছু মুখে দিবার পারুম না।

খুব পারবা। নইলে আমিও কিছু খামু না।

কি পাগলামী করচ! খাইয়া নে না ?

হ, আমি পাগলই। তুমি এহন খাইবা নাকি খাও। কইলাম ত, এহন থেইকা ক্ষ্যাতের কামই করুম।

তাই কর আনন্দ। তুই কাম করলে আমাগ আবার দুখ্যু কি ?

করুম—করুম—করুম। তুমি এহন হাঁ করত, আনন্দ একটা জিলিপি তুলে নিয়ে একরকম জোর করেই দুর্গার মুখে পুরে দিতে চেষ্টা করে।

দুর্গা দাঁত চেপে থেকে বাধা দেয়, তুই রাখ, আমি পরে খামুনে।

আনন্দর মেজাজ এবার সপ্তমে গিয়ে ওঠে, বালো অইব না কইলাম! না খাও ত আমি সব কাউয়ারে (কাককে) দিয়া দিমু।

দুর্গা আর আপত্তি করতে পারে না। ধীরে ধীরে মুখ নাড়তে থাকে। মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় ওর।

॥ ১৮ ॥

অসময়ের জল ঝড়ে রবিশস্য নষ্ট হয়েছে। তারই জের চলেছে ভাণ্ডারে—চাষ আবাদে। অভাব অনটন শুধু বিধবা দুর্গার সংসারেই নয়। ছোট বড় চরফুটনগরের সব চাষীর অবস্থাই প্রায় সমান। শুধু চরফুটনগরই বা কেন ? চরধল্লারও বিরাট ক্ষতি হয়েছে। অন্যপর দূরের কথা, পলানের মত চাষীও মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। ১৩৩২ সালে পাঁচ সাত টাকার পাট পঁচিশ ত্রিশ টাকা দরে বেচে চরময় উঠেছে সারবন্দী ঢেউ টিনের ঘর। টাকায় দুটো দর ফজলী আম, দু' তিন টাকা জোড়া ইলিশ মাছ খেতেও কিছুমাত্র আটকায়নি। হাঁড়ি ভর্তি দই, সন্দেশ, রসগোল্লাও খেয়েছে। তিনগুণ চারগুণ দরে নতুন

আবাদী জমি কিনতেও কোন বেগ পেতে হয়নি। নগদ টাকা হাতে কারো থাকেই না। তা না থাক, কি হবে নগদ টাকা দিয়ে? ওরা তো আর সুদখোর নয় যে টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়াবে! টাকার খনি ওদের ক্ষেত-খামারে। পাট ফটু খাটাবে কাঁড়ি কাঁড়ি করকরে নোট হাতে আসবে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকা। ভাবনার কি—চলমান টাঁকশাল ওদের হাতের মুঠোয়।...

ভাবনার সত্যি কিছু ছিল না। এক বছরের পাটে দশ বছরের বকেয়া ঋণ শোধ হয়ে গেছে। এই তো সবে শুরু। পৃথিবীর মানুষের চাই পাট। পাট-ই টাকা পাটই সমস্ত সুখ-ঐশ্বর্যের উৎস। কি হবে ধান ফলিয়ে? এক মণ পাট বেচলে দশ মণ ধান উঠবে গোলায়। পাটের তুলনায় ধান তো বুনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ ওরা আর ধান বুনে জমি নষ্ট করবে না। পাটই বুনেছে—পাটই বুনবে।...

প্রবাদ আছে, অতি আশায় চাষা নষ্ট। চরধল্লা-চরফুটনগর সত্যি সত্যি আজ নষ্ট হতেই বসেছে। চাল, ডাল, তেল, নুন সব কিছুই কিনে খেতে হচ্ছে এখন। তা কিনে খেতেও আটকাতো না যদি না রবিশস্য সমূলে বিনষ্ট হয়ে যেতো। রবিশস্য থেকে কম টাকা ঘরে আসে না। মন্দার ক'মাস ও থেকেই চলে। যায় পাটের নিড়ানি পর্যন্ত। কিন্তু জল-ঝড়ই সব পণ্ড করলে। কে জানে, না খেয়েই মরতে হবে হয়তো।....পাট চাষীর মনে সুখ নেই। দীনুর বাড়িতে প্রাত্যহিক হরিসভাতেও আর তেমন লোক জড় হয় না। সকলের মুখেই হা হুতাশ। করিম ফকিরের বাড়িতে বিগত ধামাল উৎসবেও শিষ্যরা প্রাণখুলে যোগ দেয়নি। বেশ অনটন লক্ষ্য করা গেছে। পলানের গস্তি দু' খানাও মাসেকের উপর ঘাটে বাঁধা রয়েছে। কিস্তি চলাচলের টাকা নেই। পুঁজির সম্পূর্ণই বাজানকে দিয়ে দিতে হয়েছে ওসমানের। পলান তাতেও কূল পাচ্ছে না। বৃহৎ সংসার। চালের খরচাই এক কাঁড়ি। তাছাড়া আছে তেল, নুন, কাপড়-চোপড়। চাষের যোগানও দিতে হচ্ছে আবার। সবে তো বীজ ছিটানো হয়েছে। এরপর আছে নিড়ানি, কাটাই, জাগ, ধোয়া, শুকানো। দফায় দফায় খরচা। ঋণ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গঞ্জের নিতাই সাহা বড় মহাজন। লক্ষাধিক টাকার লগ্নি কারবার। ১৩৩২ সালের পর বছর বছরখানেক রীতিমতো মন্দা গিয়েছে। ১৩৩৩ সালে তো কারবার একরকম বন্ধ বললেই হয়। গণেশ উল্টিয়ে চাষআবাদ

করবে ভাবছিল নিতাই। সহসা চোখ খুলে তাকান মুষিক-বাহন। ১৩৩১ এর রবিশস্য ক্ষেতে পচেছে। চৌতিরিশের গোড়াগোড়িই আবার এসে ঋণের জন্য ধর্ণা দিতে থাকে চরের চাষী। নিতাইয়ের নাইবার খাইবার সময় নেই। ব্যবহারের অভাবে হুঁকোগুলো সব অকেজো হয়ে পড়েছিল। একদিকে খোল আর একদিকে নলচে। সবগুলোই আবার সচল হয়ে ওঠে। বামুনের হুঁকো, স্বজাতির হুঁকো, নমশূদ্রের হুঁকো, মুসলমানের হুঁকো। সব কয়টির জাত আলাদা আলাদা। ভুলে কেউ কাউকে ছুঁয়ে দিলেই সর্বনাশ। গদির বিছানাও দু'রকমের। বাবু মশায়দের জন্য ফরাস বিছানো ঢালা বিছানা আর খাতকের জন্য শুধু এক ফালি চট। স্থানাভাবে কেউ শানের উপর বসলেও নিতাইয়ের কিছু করার নেই। নিজের তাকিয়াটি ঠিক সময় ঠিক জায়গায় থাকলেই সে খুশী। টাকা ধার করতে এসেছ তার আবার কথা কি? আগে সেলাম বাজাও তারপর সোজা চটের ওপর বসো। ইচ্ছে হয় নিজের হাতে তামাক সেজে খাও। তা সে তুমি লাখ টাকার চাষীই হও আর চুনোপুঁটিই হও।

চটেই এসে বসে চরের মানুষ। রাধারমণ ভেণ্ডার তমসুক লিখে কূল পায় না। পাট নিড়ানির আগে চব্বিশ ঘণ্টার আঠারো ঘণ্টাই চলে দলিল লেখার কাজ। নিতাই ছাড়া গঞ্জে ছোটবড় আরো জনকয়েক সুদখোর আছে। রসিক ঘোষের পুঁজি মাত্র শ পাঁচেক। টাকা প্রতি মাসিক দু' আনা দশ পয়সা সুদে প্রথম মরশুমেই হাতখালি করে লাগিয়ে ফেলেছে। এখন সুদের হার তিন আনা চৌদ্দ পয়সা। কপাল চাপড়ায় রসিক। বউয়ের হাতের জমানো দশ বিশ টাকা ও ছোট ছেলে মরণচাঁদের একটা দুটো পয়সা করে জমানো পাঁচ টাকাও লাগিয়ে ফেলে রসিক। সকলকেই বুঝিয়ে শান্ত করে, যা দিলে তার দেড়া পাবে।...

দীনু করিম পোড় খাওয়া মানুষ। ভেবেছিল জীবনে আর ঋণ করবে না। মহাজন কি চিজ তা কাশীপুর থাকতেই টের পেয়েছে। কাশীপুর আর চরধল্লা তো ঘরের কাছে ঘর। দুনিয়ার সব জায়গাতেই সুদখোরদের এক রা। উপুসী ছারপোকাই যেন এক একটি। কিন্তু তবু আসতে হয়। ঋণ করা বোধ হয় বিধাতা ওদের কপালে লিখে দিয়েছে। নিতাইয়ের চটের ওপর এসেই বসে দুজনে। প্রাপ্য সেলাম বাজাতেও কসুর করে না। তামাক সেজে আর একজন চাষী হুঁকো করিমের হাতে তুলে দেয়। নেশার মাদকতায় ফুরুক ফুরুক শব্দে টানতেও দেরি হয় না। তারপর খতে দস্তখত। দীনু করিম দুজনেই

তিনশ টাকা করে কর্জ করে। সুদ মাসিক টাকা প্রতি দু' আনা। মোড়ল বলেই কিছুটা খাতির করলে নিতাই। নয়তো এখন সুদের হার ঢের বেশী।

পলানের দায় শ'তে মিটবে না। কম করেও হাজার তিনেক টাকা ওর দরকার। ব ছেলে ওসমান কর্জ করতে রাজী নয়। পই পই করে নিষেধ করে সে বাজানকে। নিজেদের ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয় তাই হোক। ধার দেনা করে বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে কাজ নেই।

পলান বলে, ঘাবড়াচ ক্যান্ বাজান? তর বাজানের কিছু আচিল্ না। সাহস কইরা কাম কাইজ করচিলাম বইলাই আইজ দুইডা পয়সা হৈচে। পাটের দর ইবারও গরম যাইব। যহন বালো যায় তহন (তখন) পর পর তিন চাইর সালই বালো যায়। মুগ কালাই গ'রে (ঘরে) উঠলে কি আর আমাগ দেনা করন লাগত?

হেইত কই, বরাত যহন ইহার মোন্দ তহন দাঁতে কামড় দিয়া থাকনই বালো, বাধা দেয় ওসমান।

পলান বলে, তর সাহস নাইরে বাজান। ব্যাটা ছাওয়ালের অত ভয়ডর করলে চলে? তিরিশ ক্যান কুড়ি টেকা দরে পাট বেচলেও কত টেকা গরে আইব ক ত?

সুদটাও একবার ইসাব (হিসেব) কইরা দ্যাহ, আবার বাধা দেয় ওসমান।

আরে ধুৎতর, সুদের মাথায় মারি লাথি। ও হালার (শালার) সুদ খোরের টেকা আমি বাছ-পাট বেইচাই দিবার পারুম। আর বোচচ্ না ক্যান, আল্লায় বুজি অগও কিচু দিবার চায়। সুদ খাওয়া ছাড়াত ও হালাগ আর কিচু করণের নাই। গুণায় মরব হালারা, বিরক্তি ফুটে ওঠে পলানের কণ্ঠে।

তা তুমি যা বোজ কর। ধার দেনা করণে আমার মত নাই, ওসমানও সমতা রেখেই জবাব দেয়।

আইচ্ছা—আইচ্ছা, তুই এক সন বইহা থাইকা দ্যাখ আমি কি করি।

পরের হাটেই পলান আসে নিতাইয়ের গদি বাড়িতে। এতদিন বড় অস্বস্তিতেই কাটিয়েছে নিতাই। কে জানে, পলান ব্যাপারী আবার অন্য কোথাও থেকে টাকা নিয়ে বসলে কিনা? পলানকে টাকা দেওয়া মানে তো নিজের সিন্দুককে ধার দেওয়ার সামিল। এ হাট দেখে একদিন নিজে গিয়েই খোঁজ নিয়ে আসবে ভাবছিল নিতাই। তাই পলানের উপস্থিতিতে আশাতীত

খুশী হয়। অন্যান্য খাতকরা নিজের হাতে তামাক সেজে খেলেও পলানের জন্য নিজের চাকরকেই হুকুম করে নিতাই। হুঁকোর জলটাও পাল্টিয়ে দিতে বলে। আদাব জানিয়ে বসে খোলা মনেই তামাক টানতে থাকে পলান।

নিতাই গোঁফের ফাঁকে হাসি টেনে গদগদ হয়েই কুশল সমাচার জিজ্ঞেস করে। যেন কত আত্মীয়কুটুম এসেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাই পাঁচবার জিজ্ঞেস করে।

পলান পরিহাস প্রিয়। সবই বোঝে। ধুঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই জবাব দেয়, বালো খবর আর কৈখনে থাকব? বালো খবর থাকলে কি আর আপনার ঠাঁই আহি?

উত্তর শুনে নিতাই হয়তো খুব খুশী হতে পারে না। তবু হেসে হেসেই জবাব দেয়, আরে আমাদের ভাগে তো অষ্ট-রম্ভা। বাঁধা গরুর টাটা ঘাস। ভালতেও আপনারা মন্দতেও আপনারা···

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে পলান বলে, ওকতা ছাইড়া দ্যান। খোদায় যহন যারে যেমুন রাকে তাই বালো। এহন যার লেইগা আইচি তাই কই।

নিতাই উৎকর্ণ হয়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলুন। কাজ ছাড়া তো আর আপনার দেখা মিলবে না।

তোবা—তোবা, কি য্যান কন্; আমি কি আর আপনাগ পায়ের যুগ্যি মানুষ যে আমার দ্যাহা পাইবেন?

নিতাই বাধা দেয়, কে পায়ের যোগ্য আর কে মাথার যোগ্য তা এ তল্লাটের মানুষ জানে। আপনি ঢাকতে চাইলে কি হবে? এখন বলুন কি কাজ?

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পলান বলে, আজারখানেক টেকার লেইগা আইচিলাম। দয়া কইরা যদি দ্যান?

উত্তরে নিতাই বলে, আপনাকে টাকা দেবে না গঞ্জে কে আছে? তবে আসল কাজ বোধ হয় অন্যত্রই সেরে এসেছেন। নেহাত চক্ষুলজ্জায়—

মুখের কথা শেষ হয় না নিতাইয়ের। পলান বাধা দেয়, না—না, খোদার কসম। একটা টেকাও কারুর থন নেই নাই। আপনার ঠাঁই-ই পেরথম আইলাম।

তাহলে মোটে হাজার টাকা দিয়ে কি করবেন? আপনার যে এককোণের চাষও হবে না, নিতাই উত্তর করে।

হ, কত্তাড়া ঠিকই ধরচেন। হাজার তিনেকের কম কিচুতেই অইত না। কিন্তু কি করুম, ওসমান কিচুতেই কর্জ করবার দিবার চায় না। বলে, পাট বুইনা কাম নাই ইবার।

নিতাই লাফিয়ে ওঠে, কন কি ব্যাপারী সাহেব! এ সন পাট বুনবেন না! পাটের দর যে আগুন হবে। আমার বড় সম্বন্ধী রেলির আপিসে কাজ করে। সেই তো আমাকে কথাটা চুপে চুপে বললে।

ঠিক, ঠিক কইচেন, পাটের দর ইবার আগুন না অইয়া যায় না। তয় গ্যান তিন আজারই। সুদটা একডু কম কইরেন, পলান সোৎসাহেই সায় দেয়।

সুদের ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে না। আমি বলি পাঁচ হাজারই এক খতে নিয়ে যান। খরচা অনেক কমে হবে'খন। দফায় দফায় খতে শুধু সরকারের পেটই ভরবে।

না—না, আপনে ঐ তিন আজারই গ্যান। কেউরে য্যান কইয়েন না। ওসমান হুনলে রাগ করব।

কারো সাধ্য নেই নিতাইর পেটের কথা বার করে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তোমরা যেন আবার কোথাও রটিয়ো না হে, পার্শ্বস্থিত মুহুরী দু'জনকে লক্ষ্য করে বলে নিতাই।

মুহুরিরা মুখ বুজেই লিখছিল। নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক তাকায় মাত্র।

পলান বাধা দেয়, না না, দেওয়ানজী মশয়রে কিছু কওয়ন লাগব না। উনার হ্যা বিবেচনা আচে। এহন সুদ কত কইরা লেখব কইয়া গ্যান।

নিতাই উদাসভাবেই বলে, কিছু বলতে হবে না। বাজার থেকে আপনার কমই পড়বে।

তবু কত কইরা ফ্যালবে একবার হুনাইয়া (শুনিয়ে) গ্যান।

নিতাই হাসতে হাসতেই বলে, বাজার তো এখন তিন আনা, আপনাকে দশ পয়সা করে ফেলছি।

হায় হায়—মইরা যামু। দুই আনা কইরা ফ্যালেন, পলান ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাধা দেয়।

ব্যাপারী সাহেবের শুধু আমাদের মারবার তাল। আচ্ছা, দেওয়ানজী মশায়, ওনার কথাও থাক আমাদের কথাও থাক। ন' পয়সা করে লিখে নিন, নিতাই মাঝামাঝি পথ ধরে।

পলান আবার বাধা দেয়, না না, ই যাত্রা ওয়ার বেশী দিমু না। দুই আনাই লেইখা থোন দেওয়ানজী মশয়।

আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হলো। দেখবেন, পাটের দর উঠলে যেন কিছু পাই।

আশীর্ব্বাদ করেন, আল্লায় দিলে মিঠাই খাইবার লেইগা কিচু নিচ্চয় দিমু।

দলিল লেখা শেষ হয়ে যায়, পলান বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা টিপসই দেয়।

সিন্দুক খুলে করকরে তিন হাজার টাকা গুণে দেয় নিতাই।

টাকা হাতে নিতেই পলানের বুকের ভেতরটা কেন যেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দীর্ঘকাল পর আজ আবার ওকে ঋণ করতে হচ্ছে। কে জানে, কি আছে বরাতে?···নোটগুলো এক এক করে গুণে খুতির ভেতরে রাখে। শক্ত করে বাঁধে কোমরের সঙ্গে।

পুনরায় সেলাম জানিয়ে উঠতে যাচ্ছিল পলান। নিতাই বাধা দেয়, আর এক কলকে তামাক খান।

চাকরকে আর হুকুম করবার আবশ্যক হয় না। ঠিক জায়গায় ওরা ঠিকই থাকে। আলসের আগুনে ঝাঁ করে আর এক কল্কে তামাক সেজে পলানের হাতে দেয়।

পলান অন্যমনস্কভাবেই হুঁকো টানতে থাকে। মাথায় বোধ হয় দুশ্চিন্তা পাক খাচ্ছে। এতগুলো টাকা না নিলেই ছিল ভাল। ওসমান, গণি শুনলে হয়তো রাগই করবে। সিকি জমিতেও তো পাট নেহাত কম হতো না। কি দরকার ছিল যেচে মাথা মুড়াবার?···

পলানকে অন্যমনস্ক দেখে নিতাই বলে, আর কোথাও যাবেন নাকি? কি অতো ভাবছেন? এর চেয়ে কম সুদ কোথাও হবে না।···

তোবা—তোবা, আমার যা কারবার আপনার লগেই। কোনদিন ত আর কারোর ঠাঁই যাই নাই। এহন মারেন কাটেন হেডা আপনার দয়া।···হুঁকো অন্যের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় পলান।

অন্য কোথাও যে যাননি তা আমি জানি। তবে একবার ঘুরে দেখে এলে পারতেন, তারা কি চীজ, নিতাই জোর দিয়েই পুনরায় নিজের পক্ষ সমর্থন করে।

পলান সেলাম জানাতে জানাতেই উত্তর করে, ও কতা কইয়েন না। আশীর্ব্বাদ করেন য্যান আর কারোর ঠাঁই যাওয়ন না লাগে।

নিশ্চয়, আপনাদের সঙ্গে তিন পুরুষের কারবার। আপনাদের কুশল কামনা করবো না তো কার করবো। মাঝে মাঝে আসবেন। চরের যদি আর কারো টাকার দরকার হয় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

পলান ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিতাই মনের খুশীতেই হুঁকো টানতে থাকে। আজ ও কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছে? দিনটা বেশ ভালই গেলো।

চরফুটনগর আর চরধল্লা মেতে ওঠে। নাইবার খাবার সময় নেই কোন পাট চাষীর। চৈত্রের ঝাঁ ঝাঁ পোড়া রোদে টোকা মাথায় যে যার কাজ করে চলে। সকালের 'নাস্তা' বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে। দুপুরের ভাত ঝি-বউরা মাটির সানকিতে করে ক্ষেতেই এনে দেয়! ছোট ছেলেপুলে থাকলে তাদের হাত দিয়েও কেউ কেউ পাঠিয়ে দেয়। যার সময় হয় সে নিজের হাতেই খেয়ে নেয়। যার হয় না তাকে খাইয়ে দিতে হয়। মুখে খায় হাতে কাজ করে। এতে কারো কোন অসুবিধে নেই। এখন খাওয়া তো শুধু পেট ভরানো। তবে হুঁকো কলকের বেলায় সেটি হবার উপায় নেই। যারা খাইয়ে দিলে তারা হাত ধুয়ে সাজে তামাক। হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে গন্‌গনে করে তোলে ঘুঁটের আগুন। এখন টানলেই ভুরভুর করে ধোঁয়া বেরুবে। চাষী মাত্রই কাজ থামিয়ে খানিক জিরিয়ে নেয় । আমেজে রসিয়ে রসিয়ে টানতে থাকে। পেট ভরেছে, এবার একটু আরাম ও চাঙ্গা হয়ে ওঠা। হুঁকো কলকে নয়তো যেন এক সাঁজোয়া বহর। ক্ষেতের কাজে সকলেই যেন মার্চ করে চলেছে। আগুনের আলসে আর হুঁকো কলকে যোগাচ্ছে ওদের কাজের রসদ। তামাক নেই তো কাজও নেই। ঝিমুনীতে ঢলে পড়বে—কাজ যাবে বন্ধ হয়ে। ইংরেজ সরকার বোধ হয় এই কলাকৌশলটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই শোষণের হাতিয়ার রূপে দেশীয়দের ওপর হাজার রকম ট্যাক্স বসিয়ে থাকলেও বিড়ি তামাকের ওপর কোন ট্যাক্স বসাননি। চাষী মনের আনন্দে খেয়েছে তামাক—সোৎসাহে কাজ করেছে। যে যত বড় চাষী তার তামাকের ব্যবস্থা ততো ব্যাপক। ধান, পাট, মুগ কলাইয়ের সঙ্গে জমির এক কোণে কিছুটা তামাকের চাষও তাই প্রত্যেকেরই আছে। প্রয়োজন মতো পাতা সেখান থেকে পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে এ পাতায় ঝাঁজ কম। রংপুরের কড়া মতিহার পাতা মিশাল না দিলে নেশা জমে না। অনেক দাম

মতিহার পাতার। শুধু মতিহার দিয়ে তামাক মাখলে আবার গলায় লাগে। চাষীর সুবিধেই হয়। অল্প মাত্রায় মতিহার কিনে নিজেদের বাড়ির পাতার সঙ্গে মিশাল দিয়ে বেশ সস্তাতেই মনোমত তামাক পাওয়া যায়। সারা বছর এখন মৌজ করে খাও। অন্যান্য খরচার সঙ্গে তামাকের খরচাও চাষীর একটা মোটা খরচা। তামাকের ভালমন্দর ওপরই নির্ভর করে চাষাবাদ। ঢিলে তামাক দিলে কাজও ঢিলে হয়ে যাবে। একদিনের কাজ উঠবে তিনদিনে। আবার বেশী কড়া দিলেও কেশে কেশে নাস্তানাবুদ। বেশ মেজাজসই হওয়া চাই! ভাল চাষীর কায়দাকানুন জানা আছে। বছরের তামাক সময়মতোই সংগ্রহ করে রাখে তারা।

রবিশস্য ক্ষেতে নষ্ট হয়েছে। সময়মতো পাট বুনতে না পারলে সারা বছর উপোস দিয়ে মরতে হবে। কিন্তু পাট চাষে যে চাই এক কাঁড়ি টাকা। রামকান্তর ওপর ভরসা করে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল দুর্গা। গঞ্জের কাছারিতে গ্রীনবোট লাগলেই হাতে টাকা আসবে। নিড়ানির সময় থেকেই প্রচুর টাকার দরকার। বীজ ঘরেই আছে। জমি তৈয়ারীর কাজও আনন্দকে দিয়েই একরকম করে হয়ে যেতো। খুব বেশী হলে দু'পাঁচ দিনের জন্য দু'চারজন ক্ষেত মজুরের আবশ্যক হতো। রামকান্ত তো বলেছিল চালিয়ে নেবে! লম্পট-শয়তান, ধর্মাবতার সেজে চরের সর্বনাশই ওর মতলব। আগে জানলে কে খাল কেটে কুমীর আনতো? সোজা মোড়ল বৈরাগীকে বললেই সব মিটে যেতো। চরের অনেকেই তো তাঁকে জামিনদার খাড়া করে মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করেছে। তবে ওর কেন এ দুর্মতি হলো?···কুকথা তো বাতাসের আগে ধায়। শয়তান হয়তো নিজেই রটাবে কত কথা। না না, বাঁচতে ওকে হবেই। ময়নার জন্যই বাঁচতে হবে। আর তা যদি হয় মোড়লের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। স্বজাতি—কুটুম, সকলের আগে তো তাঁর কাছে যাওয়াই উচিত ছিল। দেরি হলেও তাই যেতে হবে। মোড়ল তো ইসারা ইঙ্গিতে অনেক দিনই বলে পাঠিয়েছেন। কোন কিছুর দরকার হলেই যেন তাঁকে বলি। তবে এ ভুল কেন হলো?···দুর্গা দাওয়ার ওপর বসে ইতস্ততঃ ভাবছিল, আনন্দ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তাড়া দেয়, অ দিদি, ক্ষ্যাতের আগাছা ত সব সাফ কল্লাম, এহন কতডা জমিনে পাট বুনবা কও?

দুর্গা অবাক হয়। আনন্দ—যে আনন্দ পেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছু বুঝতো না সে একা একা ক্ষেত পরিষ্কার করে ফেলেছে! একাই চায় পাট

বুনতে ! তা বেশ। যা পারে একাই করুক। আর কারো কাছে ধার-কর্জের কথা বলে কাজ নেই। কিন্তু খাবে কি বেচারা ? চাষের কাজে যে বেজায় খাটুনী। নুন ভাতের ব্যবস্থাও যে নেই। আনন্দ কি ক্ষেপে গেলো ! তামাক নেই, ভাত নেই, পাট চাষ করবে !...

দুর্গাকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ ঝাঁজিয়ে ওঠে, তোমার কি অইল কওত ! কয়দিন যে তোমার কোন দিশাবিশাই পাই না ?

আনন্দর তাড়ায় দুর্গার সংবিৎ ফিরে আসে। কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ও নিজেই কি জানে, কতটা জমিতে চাষ করলে কত ফসল উঠবে ? আগে দেখতো বাপ-বেটায়। তারপর বাবা একাই। এখন কে বলে দেবে ওকে কত খরচা লাগবে আর কি দিয়ে কি হবে ? আচমকাই উত্তর দেয় দুর্গা, কি আবার অইব ? আমিও ত হেইডাই ভাববার নৈচি, কতডা জমিনে পাট বুমুম।

আর ভাববা কবে—বুনবাইবা কবে ? হগলের কাম না পরায় (প্রায়) অইয়া আইল। জল ত হুনচি ইবার আগৈর (প্রথম দিকে) আসব, আনন্দ আবার তাড়া দেয়।

জল—এই জলের কথা বলেই শয়তান প্রলোভন দেখিয়েছে। জল প্রথম দিকেই আসবে—কুমার বাহাদুরের ডিঙ্গিও এসে ঘাটে লাগবে। সঙ্গে সঙ্গে হাত ভর্তি টাকা। শয়তান—সব ধাপ্পাবাজী।...আনন্দর মুখে জল বাড়বার কথা শুনে আবার মনের কোণে হোঁচট খায় দুর্গা। বুঝিবা খেই-ই হারিয়ে ফেলে।

আনন্দ রেগে যায়, না, তোমারে আইজকাই ফকির সাবের কাছে লইয়া যাওয়ন লাগব। ভূতেই ধরচে তোমারে। কি করুম কইবা ত ?

ফকিকের নাম শুনে দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। আনন্দকে বিশ্বাস নেই। মোটা বুদ্ধি। সত্যি সত্যিই হয়তো ফকিরের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারে। আর তা যদি হয়, ভাববেন কি ওঁরা ! কীর্তনিয়ার বেটার বউ হয়তো পাগলই হয়ে গেছে। পাগলীর বেটির সঙ্গে আবার কে পোলার বিয়ে দেয় ? মোড়ল বৈরাগী হয়তো বেঁকে বসবেন। ময়নার আর বিয়েই হবে না।...গলার স্বর রুক্ষ করেই বাধা দেয়, কি তুই যা তা কচ আনন্দ ! চাষের কাম বিয়ার কাম সমান। ভাইবা ছাহন লাগবনা ? আগা-পাছা না ভাইবা কাম কল্লেই অইল ?

তয় তুমি ভাব, আমার আর কিছু কইরা কাম নাই, আনন্দ গজগজ করতে করতেই স্নান করতে ঘাটের পথে পা বাড়ায়।

গঞ্জে মোট বয়ে সামান্য যা চাল, তেল, নুন এনেছিল আনন্দ তা দিয়েই

এ কদিন চলছে। টেনেটুনে বড় জোর আর দিন দুই চলবে। তারপর? আনন্দ তো কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। মোট বইতেও এখন আর ওর কোন আপত্তি নেই। পরের খামারে দিন মজুর খাটতে বললেও ও রাজী। কিন্তু কুটুমের সঙ্গে একত্র বাস করে তা কি করে সম্ভব। মানই যদি গেলো তবে আর বেঁচে থেকে লাভ কি? কুটুমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নিজেদের বংশেও কেউ কোনদিন যে কাজ করেনি, দুটি ভাতের দুঃখে তাই করবে? মানুষ তো আছে শুধু তামাসা দেখতে। নিশির বাপের কি উচিত ছিল না একবার খোঁজ খবর নেয়া? শুধু ওপর ওপর ছুতো ভাঙালেই হলো! সম্পর্কের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, চরের মোড়লও তো বৈরাগী। কার কি সুবিধে অসুবিধে সেটা দেখাও কি মোড়লের কাজ নয়? কই, নিজেদের কাজ তো কিছুই ঠেকে নেই।···কথায় কথায় দীনুর ওপর বিরক্তি আসে দুর্গার। আবার ভাবে, না দোষ কারো নয়—নিজের বরাতেরই দোষ। কপালে যদি সুখ থাকবে তাহলে অসময়ে ময়নার বাবাই বা যাবেন কেন আর লোকেই বা এত হেনস্তা করবে কেন। কপাল মন্দ বলেই না ময়নার বিয়েটা পর্যন্ত শেষ হতে পারলো না।···

ময়নাই আজ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিচ্ছে। দাওয়ার ওপর একক বসে অকূল পাথারে হাবুডুবু খেতে থাকে দুর্গা। ভাবতে ভাবতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু পথের কোন হদিস মেলে না।

ময়নার ডাকে ঠাকুর প্রণাম করতেই উঠে যাচ্ছিল দুর্গা, দোর গোড়ায় দীনুর হাঁক শোনা যায়, বিয়াই মশয় আচেন নাকি—বিয়াই মশয়···

দুর্গা থতমত খেয়ে যায়। কথা নেই বার্তা নেই সশরীরে মোড়ল এসে হাজির! আনন্দটা সত্যি সত্যি গিয়ে কিছু বললে নাকি! অনেকক্ষণ তো বাড়ি নেই—ওর যা বুদ্ধি!

দীনু ততক্ষণে প্রায় উঠোনে এসে পা দেয়। গলার স্বর আরো একটু উচ্চগ্রামে চড়িয়েই হাঁকে, বিয়াই মশয়—

দুর্গা লজ্জাই পায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এতক্ষণে আলো জ্বালা উচিত ছিল। কিন্তু ঘরে তো এক ফোঁটাও কেরোসিন নেই। অন্ধকারে বসেই ভাত খেতে হয়। কি আর করবে। তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা একটু টেনে সাড়া দেয়, আনন্দ ত বাড়ি নাই। আহেন, বহেন আইহা। আমি কুপা জ্বালাইয়া আনি।

দীনু বাধা দেয়, না থাউক, কুপা জ্বালাইবার কাম নাই। আলো আমার চক্ষে লাগে। আপনার ঠাঁই দুইডা কথা জিগাইবার আইলাম।

আইচ্ছা আপনে বহেন, আমি তামুক লইয়া আহি, দীনুকে একটা জল চৌকি এগিয়ে দিয়ে দুর্গা তামাক সাজতে যায়।

না. না, আপনারে আর কষ্ট করন লাগব না। আমি এহনি তামুক খাইয়া আইচি। দুইডা কতা বইলা উঠি। কীত্তনের সময় অইল। আবার ইদিগে আমাগ ভটচাইয মশয় কয়দিন থেইকা বিছানা নিচেন। তেনারেও একবার দেইখা যাওয়ন লাগব, দুর্গাকে পেছন ফেরাতে চেষ্টা করে দীনু।

কিন্তু দুর্গা সে কথায় কান দেয় না। নতুন কুটুম, তাতে আবার চরের মাথা। যত্ন-আত্তি না করলে মান থাকবে না। কিন্তু সারা দিনে তো আনন্দকে একবারও তামাক খেতে দেখা যায়নি—যদি এক ছিলুমও না থাকে! লজ্জায় যে মাথা কাটা যাবে। ময়নাও তো সন্ধ্যা দিচ্ছে—এখনো ঠাকুর শয়ান দেওয়া হয়নি। ওকে পাঠিয়েও ওর সইয়ের বাড়ি থেকে ছিলুম দুই চেয়ে আনা যেতো। এখন উপায় কি হবে? তাছাড়া শ্বশুরের সুমুখ দিয়ে ভর সন্ধ্যা বেলা বাড়ির বারই বা হবে কি করে ও? এর চেয়ে যে আদর না দেখালেই ছিল ভাল।...ভাবতে ভাবতে আনন্দর ঘরে এসে ঢোকে দুর্গা। না, ভগবান মুখ রক্ষা করেছেন। বাঁশের চোঙ হাতড়িয়ে বেশ খানিকটা তামাক পাওয়া যায়। মনের খুশীতে নিশ্চিন্ত হয়েই তামাক সাজতে থাকে। কিন্তু এক চিন্তা মাথা থেকে না নামতেই আর এক চিন্তা মগজে ঘোঁট পাকাতে থাকে। তবে কি আনন্দই মোড়লকে পাঠালে? সেই জন্যই কি নিজে না খেয়ে তামাকটুকু রেখে দিয়েছে? কি আশ্চর্য! এমন বোকাও হতে আছে! ঘরের কথা কেউ কখনো কুটুমের কাছে বলে?...ভাবতে ভাবতেই হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে আবার এসে দাওয়ার ওপর দাঁড়ায় দুর্গা।

দীনু তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে নিজেই ফুঁ দিতে থাকে। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠেই বলে, ছি ছি ছি, মিচামিচি আপনারে আবার কষ্ট দিলাম। আমার ময়না মা কুথায়? তারে ত দেখচি না!

ও ঠাকুর শয়ন দিবার নৈচে, এহনি আইব, দুর্গা উত্তর করে।

বালো বালো, এহন থেইকাই ঠাকুর দেবতার কাম করন বালো, হুঁকো টানতে টানতে দীনু মন্তব্য করে।

হ, ওত জন্মের থেইকাই ঠাকুর ঘরে আচে। আপনার তালইত অরে

মুকে মুকেই ঠাকুরের শতনাম 'শিকাইচে। সোবার বলবার পারে, দুর্গা ময়নার হয়ে ওকালতি করে।

তা কি আমি জানি না। তালইরত আমার এক শ ঠাকুর। রাদাকিষ্ট, গোপাল, জগন্নাথ, বলরাম, শুভদ্‌রা কত কি। সুকে থাকুক—সুকে থাকুক, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে দীনু সায় দেয়।

দুর্গা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সুক আর বরাতে আইল কই? এহন আপনার ঘরে গিয়া যদি সুক পায়।

দীনু বলে, আইব আইব, ঘাবরান ক্যান্‌? ভাগবতে আচে, কিষ্ট প্রেম যার অয় তার মতন সুকী কে? মার আমার লক্‌খন বালো।

জানেন ঠাকুর, দু'হাত কপালে তুলে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্য প্রণাম করে দুর্গা।

দীনু কথায় মোড় ঘুরিয়ে বলে, যাউক, যে কথা কইবার লেইগা আইলাম। চাষ আবাদের কি করলেন? ইয়ার পর পাট বুনলেত আর মাথা তুলবার পারব না। জলে ডুইবা যাইব।

দুর্গা ভাবনায় পড়ে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। আমতা আমতা করেই বলে, হ, তাইত ভাববার নৈচি। আমার কি কিচু জানা আচে।

মুখ থেকে কথা লুফে নিয়ে দীনু বলে, আমিত বিয়াই মশয়রে কয়দিন কইলাম, কি করবা কও। ঠেকা বেঠেকা থাকে ত হ্যা কতাও কও। গঞ্জের নিতাই সাজি টেকা দিবার চাইচে।

দুর্গার সংকোচ হয়। পুলকও হয় কিছুটা। এত সহজে টাকা পাওয়া যায় অথচ এই টাকার জন্য ও শয়তানটার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে। তবু মনের কথা খোলসা করে বলতে পারে না। গাঁয়ের মানুষের এ এক অদ্ভুত আচরণ। ইষ্টি কুটুম নয়তো যেন এক লজ্জার পাহাড়। ঘরের কোন গোপন কথা কিছুতেই তার কাছে বলা যাবে না। না খেয়ে মরলেও না। এমনিতে আন্তরিকতার অভাব নেই। পরস্পর পরস্পরের বিপদে এসে বুক দিয়ে দাঁড়াবে—সাধ্যমতো সাহায্য করবে। কিন্তু অভাব অভিযোগের কথা কেউ কাউকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না। দুর্গাও পারে না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেয়াই মশায়ের কাছে মুখ বুজে থাকলেও আর চলছে না। লম্পটের হাত থেকে ওকে বাঁচতেই হবে। পাট বুনতে না পারলে তার কোন উপায়ই নেই। আনন্দ বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। ওকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যতে আশা আছে। তাই

দীনুর প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে দুর্গা, আপনেত সবই জানেন, কতডা জমিনে চাষ কল্লে বালো অয় ?

তা পাখী আট দশের কম জমিনে বুনলে খরচ খরচায় কুলাইব না। চক্কেও কিছু দেখবেন না।

খরচ কত পড়ব ?

শ' আড়াই টেকাইত আগে পড়ত। তবে এহন কামলার রোজ দেড়া, তিন শ'র কমে কুলাইবার পারবেন না।

তিন শ' !

হ, তাত চাই-ই।

আইচ্ছা, কাইল আপনারে খবর দিমুনে। আনন্দ আহুক।

বেশ, তাই-ই দিয়েন। ঠেকা বেঠেকা কিছু থাকলে হ্যা কতাও কইয়া দিয়েন। উঠি তাইলে, দীনু হুঁকোটা নামিয়ে রেখে উঠতে যায়।

দুর্গা বাধা দেয়, আর এক ছিলুম তামুক খান। আপনাগ বউমা আইল বইলা ?

না, পূজায় বইচে, অরে আর বিরক্ত কইরা কাম নাই। আর একদিন আহুম।

দীনু উঠে এক পা বাড়াতে যায় ময়না ঠাকুরঘর থেকে বেরোয়।

দুর্গা বলে, ঐ ছ্যাহেন, আপনে আর ফাঁকি দিবার পাল্লেন না।

দীনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই উল্লাস জানায়, আয় মা আয়, তরে একডু দেইখা যাই।

ময়না মাথা নীচু করেই কাছে এসে প্রণাম করে। কে শ্বশুর, কে ভাসুর, কার সঙ্গে কি আচরণ করণীয়, তা ওর বুঝবার কথা নয়। বোঝেও না ঠিক ঠিক। তবু যান্ত্রিক পুতুলের মতো সব ওকে করে যেতে হয়। ও যেন একটি কলেরই পুতুল। মাথা নীচু করে কথা বলছে কারো সঙ্গে—কাউকে দেখে দিচ্ছে ঘোমটা—আবার কারো সঙ্গে পাকা গিন্নীপনা করতেও আটকাচ্ছে না।...

দীনু সস্নেহে ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে।

ময়না মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

দুর্গা তাড়া দেয়, যা, এক কইল্‌কা তামুক সাইজা লইয়া আয়।

ময়না হুঁকো-কল্কে হাতে করে মামার ঘরের দিকেই পা বাড়াতে যায়।

দীনু বাধা দেয়, আর তামুকের কাম নাই বিয়াইন, উঠি এহন।

দুর্গার মুখে হাসি খেলে। বলে, হাদা নক্ষী পায়ে ঠেলবেন ?

হ, তা যা কইচেন। মাগ, একডু তারাতারি আন। কীত্তনের লোক আবার সব বৈহা (বসে) থাকবনে। দুর্গার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ময়নাকে তাড়া দেয় দীনু।

যথাসময়ে তামাক আসে। ঠাকুরের ভোগের জল বাতাসাও এনে হাজির করে ময়না। দীনু সব কিছুর সদ্ব্যবহার করে সেদিনের মতো উঠে পড়ে। দুর্গা আবার নতুন করে ভাবতে বসে।

সন্ধ্যা বেলাই ঘুম পায় ময়নার। না খেয়ে শুলে জেগে উঠে খেতে আর সেই রাত দশটার আগে নয়। হাঁড়িতে দুপুরের রান্না ভাত রয়েছে। গরমে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুর্গা ওকে একবারে খেয়ে শুতেই তাড়া দেয়। আনন্দটা এলেও খেয়ে নিতে পারতো। কিন্তু কোথায় যে গেছে হতভাগা—ফেরার নাম নেই। ভাত নষ্ট হয়ে গেলে খাবেখনে কোন ছাই ?···

একা একাই দাওয়ায় ওপর বসে একথা সেকথা ভাবছিল দুর্গা। ময়না হয়তো ততক্ষণে ঘুমিয়েই পড়েছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে আনন্দ। দুর্গার গা ঘেঁষে এসে বসে বলে, দিদি, আর ভাববার কিচু নাই। কাম গুচাইয়া আইচি।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। জিজ্ঞেস করে, কি আবার কইরা আইলি ! কোনহানে গেচিলি ?

আরে যামু আবার কোতায়—আর গেরামে (গ্রামে) আচেইবা ক্যারা ? ইষ্টি কুটুমের কাচে ত কিচু কওয়ন যাইব না। তাই ভটচায মশইর ওহানে গেচিলাম।

দুর্গার বুকের ভেতরে হঠাৎ যেন কেউটের ছোবল পড়ে। ফুঁসে ওঠে, করচচ্ কি তুই ? ক্যান গেলি হেহানে ? ক্যারা যাইবার কইচিল তরে ?···

ক্যারা আবার যাইবার কইব ? নিজের থেইকাই গেচিলাম।—আনন্দ সমতা রেখেই জবাব দেয়।

ক্যান গেলি আমারে না জিগাইয়া ? তর কি আর একটা দিনও সবুর সইল না ?

তোমারে আবার জিগামু কি ? জিগাইলে কি তুমি কোন উত্তর দ্যাও ?

বেশ, আমি যহন কিচু না তহন যা খুশি কর। আমি কাইলই ইহান থনে চইলা যামু।—দুর্গা প্রায় কেঁদেই ফেলে।

আনন্দ ভ্যাবাচেকায় পড়ে। বুঝে উঠতে পারে না কি ও এমন অন্যায় করে ফেলেছে। সবিস্ময়েই বলতে থাকে, কি জানি, তোমাগ ভাব-সাব কিছু আমি বুজবার পারি না। এই না কয়দিন ভট্‌চাইয মশইর লগে সল্লা কল্লা। এহন আবার হ্যায় তিতা অইয়া গেল!

দুর্গার কান্না এবার ক্রোধে ওঠে, কি সল্লা করলামরে হ্যার লগে? কি দেখচচ্ তুই?

আনন্দ অধিকতর অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, মিচামিচি রাগ কর ক্যান। না কর আর কোনদিন না যামু হ্যার কাচে।

অপ্রস্তুত দুর্গাও হয়। ভাবে, তাই তো, ওর আর এমন কি দোষ। আমি ডেকে এনেছিলাম বলেই না ও যেতে সাহস পেয়েছে। ও কি করে জানবে ভণ্ডটার মনের কথা?···নিজকে সংযত করে দুর্গা বলে, হ্যা, আর যাইচ না পর লোকের কাচে। নিশির বাপ আইচিল, যা পরামশ্য হ্যার লগেই কর। হ্যাগ—

মুখের কথা শেষ না হতে আনন্দ বাধা দেয়, হ্যারা না কুটুম। ঘরের কতা হ্যার কাচে কইবা?

আত্মীয় কুটুমের কাচে কমু না তয় কি পর মাইন্‌ষের কাচে কমু? তর বুদ্দি অইব কবে?

ভট্‌চাইয মশয় আইলে হ্যারে তবে কি কমু?

ভট্‌চাইয মশয় আইব! তুই হ্যারে আইবার কইচচ্ নাকি?

না, ঠিক আইবার কই নাই। হ্যা ত পাঁচ ছয় দিন বিছানায় পৈড়া আচে। আইজই নাকি কীত্তনে যাইব। আমার মুখের থন সব হুইনা নিজের থনেই কইল, ফিরবার পথে তোমার লগে দেহা কইরা যাইব।

দুর্গার সর্বাঙ্গ আবার ঝংকার দিয়ে ওঠে। কর্কশ স্বরেই বলে, না না, হ্যার লগে আমার কোন পরামশ্য নাই। তুই হ্যারে এহনি গিয়া বারণ কইরা আয়।

এহন গিয়া কি হ্যারে পামু? হ্যা না এতক্ষণে পাঠে বইহা গেচে।

কথাটা দুর্গার মনেও ধরে। তা ঠিক, ভণ্ডটা এতক্ষণে নিশ্চয় আসনের ওপর গিয়ে জেঁকে বসেছে। এখন আনন্দকে ওখানে পাঠালে আরো কেলেঙ্কারীই হবে। নির্বোধটা কি বলতে কি বলে ফেলবে। তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়াই ভাল। ডাকলে সাড়া না দিলেই হলো। আনন্দর

তো বিছানায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকে। তাই প্রকাশ্যে আনন্দকে সমর্থন করেই বলে, তয় আর দেরি করিচ না, হেই কোন দুপেরের ভাত—নষ্ট অইয়া গেল বুজি। খাইয়া লইয়া হুইয়া পড়।

খিদে আনন্দরও জোর পেয়েছে। দুর্গা এতক্ষণ ওকে না ঘাঁটালে কখন খেয়ে নিত। সোৎসাহেই বলে, কও কি, ভাত নষ্ট অইয়া গেল! তারাতারি ছ্যাও তাইলে, খামুনে কি?

তুই হাত মুখ ধুইয়া আয়, আমি বাইড়াই রাখচি।

অন্ধকার দাওয়ার ওপর বসেই দু ভাইবোনে খেতে থাকে। সামান্য দুটি ভাত ও একটুখানি মিষ্টি কুমড়োর তরকারি। যেন পরমান্নই খাচ্ছে আনন্দ। একটা ভাত ছিটকে মাটিতে পড়লে তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিচ্ছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে আসে দোরে হাঁক শোনা যায়, বড় কুটুম আচ—বড় কুটুম, গাঁয়ের সম্পর্কে আনন্দকে বড় কুটুম বলে ডাকে বংশী।

দুর্গা হকচকিয়ে ওঠে। একি, শয়তানটা এত শিগ্‌গীর ফিরলে! কিন্তু···

দুর্গা কোন কিছু জিজ্ঞেস করার আগে আনন্দ সাড়া দেয়, খাড়ও (দাঁড়াও) বংশীদা, আমার অইয়া গেচে৷

দুর্গা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ও শয়তান নয়, বিশ্বাস বাড়ির বংশী!···এত রাইতে আবার বংশী ডাকে ক্যানরে?—আনন্দকেই জিজ্ঞেস করে।

ঐ যা, তোমারে কইতেই ভুইলা গেচি। বৈরাগীর খালে আমরা মাচ ধরবার যামু। বড় বড় মাচ উজায় ওহানে রাইতে।

না না, আমাগ মাছ মোছ ধরনের কাম নাই, হুইয়া থাক।

বারে, আমি বলে কত কইয়া বুইলা হ্যারে মত করাইচি! আমাগ কি হারিকল (হ্যারিকেন) আচে নাকি যে একা একা যামু?

মাচ না খাইলে কি অয়?

হ, তুমি নিজে খাওনা ত তাই আর কারেও খাইবার দিবার চাও না। মাচ ছাড়া কি ভাত খাওয়ন যায়? দ্যাহ না মইনা দিন দিন কেমুন রোগা অইয়া যাইবার নৈচে!···

আনন্দর কথার জবাব দেবার আগে বংশী এসে উঠানে দাঁড়ায়। বড় ভাল ছেলে বংশী। দুর্গার খুব পছন্দ ওকে। কখনো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলে না। বংশীই বলে, বৌঠান, দেইখনে, কেমুন বড় বড় মাচ ধইরা আনি। বেশী দেরি অইব না। কই গ কুটুম, তোমার হইল?

আনন্দ ইত্যবসরে কোমরে গামছা বেঁধে প্রস্তুত। দুর্গা ওকে আর বাধা দিতে পারে না। রাত দশটার কাছাকাছি দু'জনে বেরিয়ে যায়।

আনন্দ বংশী বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা ভাবে, দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়বে। পাড়া নিস্তব্ধ, ময়নাও ঘুমিয়ে পড়েছে। শয়তানটা যদি সত্যি সত্যি এসেই পড়ে! আনন্দকে যেতে না দিলেই ছিল ভাল। গাটা কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। আবার ভাবে, না, রাত বেশ হয়েছে। কীর্তনের আসর নিশ্চয় ভেঙে গেছে। মুখে যাই বলুক, প্রাণে ভয়ডর আছে নিশ্চয়। সেদিন যেভাবে পালিয়েছে কিছুতেই আর আসছে না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ঘরে যাবারই উপক্রম করে দুর্গা।

জলের বালতিটা ঘরে নিলেই দরজায় খিল দিতে পারে এমন সময় কে যেন আনন্দর নাম ধরে ডাকতে থাকে। চিনেও চিনতে পারে না। এ যেন কেমন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর। রামকান্ত নিশ্চয় নয়। তার তো মাজা গলা, তবে! কান খাড়া করেই খানিক দাঁড়িয়ে থাকে।

আগন্তুক আরো এগিয়ে এসেই ডাকে, আনন্দ আছ—আনন্দ। ঘুমোলে নাকি হে, ও আনন্দ?

এবার আর দুর্গার বুঝতে বাকী থাকে না। এমন জোরালো গলায় এ চরে ঐ একটি জীবই কথা বলে। সে হচ্ছে—সেই লম্পটটা। দোর বন্ধ করতেই যাচ্ছিল দুর্গা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারে না। মনে করে, এই সুযোগ। এই সুযোগেই ওকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। ভয় কি অতো? বাঘও নয়, ভালুকও নয়। গায়ের জোরে কখনো ভণ্ডটা পেরে উঠবে না। সটান বেরিয়ে এসে, উত্তর করে, আনন্দ বাড়ীতে নাই।

এই দেখ, আমাকে আসতে বলে আবার কোথায় গেলো! তা যাক গে, তুমিই তো রয়েছ, যা বলবার সে তো তুমিই বলবে, বলতে বলতে দাওয়ার কাছে এগিয়ে আসে রামকান্ত।

দুর্গা রুখে দাঁড়িয়েই জবাব দেয়, আমার কিচু কইবার বুলবার নাই। আপনে যাইবার পারেন।

আহা-হা, তুমি দেখছি চটে আছো বউগিন্নী! কদিন বিছানায় ছিলেম তাই খোঁজ নিতে পারিনি। একবার তো দেখতেও গেলে না।

বিচানায় ছিলেন! বিচানায় ছিলেন তয় দুপইর রাইতে আইচিলেন কেমুন কইরা?—ফুঁসে ওঠে দুর্গা।

রামকান্ত কণ্ঠের স্বর স্বাভাবিক রেখেই আকাশ থেকে পড়ে, তুমি কও কি বউগিন্নী! আমি আইচিলাম দুপুর রাত্রে! কবে?

কবে হেডা নিজের মনরে জিগাইয়া ত্থাহেন। আমার চক্ষুরে ফাঁকি দিবার পারবেন না।

রামকান্ত এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়ায়। তারপর ঘাড় ঝেঁকেই বলতে থাকে, তবে তো ছিদামের কথা ঠিক। সেও দেখেছে। আচ্ছা, তুমি কি গত মঙ্গল-বারের কথা বলছো?

হ হ, মঙ্গলবারের কতাই। দুপইর রাইতে কুত্তায় ঘেউঘেউ করল, আপনে জানেন না নাকি?

আমি জানবো কেমন করে বাছা! আমি তো তখন বিছানায় শুয়ে—সর্বাঙ্গে ভীষণ বেদনা। নড়া-চড়ারও শক্তি ছিল না।

দুর্গার কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! চুপচাপই দাঁড়িয়ে থাকে।

রামকান্ত বলেই চলে, পরদিন সকালে ছিদাম আমাকে দেখতে এসে বললে, ঠাকুরদা, তাজ্জব ব্যাপার! মাথায় ঠিক আপনার মতোই বাবরি, দৌড়ে এসে জলে নামলো। তারপর যে কোথায় মিলিয়ে গেলো হদিসই পেলাম না। ....ক্ষ্যান্তও আমাকে কতদিন বলেছে, চরে একজন আছে দাঠাকুর, রাত বিরাত সাবধানে চলবেন। না বউগিন্নী, তুমি ঠিকই দেখেছ, এর একটা বিহিত আমাকে করতেই হবে। করিম ফকিরকে দিয়ে হবে না। গঞ্জের চম্পকেই লাগাতে হবে। দেও দস্যির কারবার, কখন কার ঘাড় মটকায় বলা যায় না।

রামকান্তকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিল দুর্গা এখন পারে তো ওকে মাথায় করে রাখে। ভাগ্যিস ওদিন ও উঠানে একা একা বার হয়নি···বুকের ভেতর থরথর করে কাঁপতে থাকে। কোনরকমে জল চৌকিটা এগিয়ে দিয়ে বসতে বলে রামকান্তকে।

ওষুধে কাজ হয়েছে দেখে রামকান্ত মনে মনে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে। জল চৌকির ওপর বসতে বসতে আশ্বাস দেয়, সর্বদা মনে মনে নাম জপ করো। তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। সামনের অমাবস্যাতেই আমি চম্পকে দিয়ে ক্রিয়া করাচ্ছি। ও সব দেও দস্যি চম্পর কাছে কেঁচো।

হ, তাই যা অয় একটা কিছু করান। রাই বিরাইত মাইনষে মরব নাকি?

অতো ভয়ের কি আছে? মনে ভক্তি থাকলে ওরা কিছু করতে পারবে না।

· জানে ভগবান, ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে দু'হাত কপালে তুলে প্রণাম করে দুর্গা। তারপর উপুড় হয়ে ডান হাত দিয়ে রামকান্তর চরণযুগল ধরে কাকুতি জানায়, আমারে আপনে ক্ষেমা করেন ঠাকুর মশয়। না জাইনা আমি আপনার মনে দুখ্যু দিচি।

আরে করো কি করো কি! তোমরা হচ্ছ আমার আপনার জন। তোমাদের কোন কথা কি আমি মনে রাখি? বাধা দিতে গিয়ে দুর্গার হাত চেপে ধরে রামকান্ত। মাথার ওপর দিয়ে একটা নিশাচর বাজ উড়ে যায়। বিকট তার পাখার শব্দ।

দুর্গা তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে হাত ঠেকিয়েই প্রণাম করে।

শুষ্ক গলায় রামকান্ত বলে, এ কদিন একটু সাবধানেই থেকো। আনন্দর সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে—শুয়ে পড়েছে নাকি?

আর কন ক্যান, অরে নইয়াই অইচে আমার জ্বালা। বংশীর লগে মাচ ধরবার গেচে।

না না না, কাজটা ভাল হয়নি! ওদের দৃষ্টি থাকে সদা-সর্বদা মাছ মাংসের দিকে। বাড়ি ফিরলে একটু নুন জল খাইয়ে দিও, দুর্গার ভয় পাওয়া মনে অধিকতর ভয় ধরিয়ে দেয় রামকান্ত।

থাউক—অরে দেও দস্যিতেই খাউক। নইলে আর এত বাড়াবাড়ি অইব ক্যান, অভিমানে ফুঁসে ওঠে দুর্গা।

ছি, ও কথা বলতে নেই। ছোট ভাই, ফেলতে তো আর পারবে না। বলে কয়ে যদি ওকে একবার কাজে লাগাতে পারো তা'হলে দেখবে খুব কাজের হবে ও। গায়ে বেশ শক্তি আছে ছোকরার।

আশীর্ব্বাদ করেন, আপনাগ দশজনের আশীর্ব্বাদেই যদি কপাল ফিরে।

ফিরবে—নিশ্চয় ফিরবে! সদা-সর্বদা ভগবানকে ডেকো। হ্যাঁ, ভালকথা, চিঠি পেয়েছি, কুমার বাহাদুর শিগগিরই আসছেন। ওদিককার খাল বিল সব ছুটেছে। দিন কয়েকের ভেতরেই তুমি টাকা পেয়ে যাবে। এখনকার মতো সামান্য এই টাকা দু'টো রাখো, রোগ শয্যায় দশজনের কাছ থেকে পাওয়া অতিকষ্টের জমানো দুটো টাকা দুর্গার হাতে গুঁজে দেয় রামকান্ত। একরকম না খেয়েই জমিয়েছে টাকা দুটো। মনই যদি অসুস্থ থাকে তাহলে খেয়ে আর কি হবে! প্রবাদ আছে, টাকায় টাকা আনে। কিন্তু ও তা চায় না। ও চায় দুর্গার একটু অনুগ্রহ। না না, মিথ্যাচার এ নয়। সারা

জীবন ও দুর্গাকে নিয়ে থাকবে। চর ওদের ঠাঁই না দেয় দুনিয়ায় স্থানাভাব হবে না।···টাকা দুটো হাতে গুঁজে দিয়ে ইতস্ততঃ ভাবতে থাকে রামকান্ত।

হাত শূন্য। রাত পোহালেই টাকার প্রয়োজন। তবু টাকা দুটো ফিরিয়ে দিতেই চায় দুর্গা। বলে, অসুকে আপনারে কিছুই দিবার পারলাম না, উল্টা আপনার থনেই নিমু! না, তা আমি কিছুতেই নিমু না। আপনে ফেরত নিয়া যান, দুদ খাইয়েন।

দুধের আমার অভাব হবে না বউগিন্নী। নগদ পয়সা-কড়ি বেশী না পেলেও চরে আমরে খাওয়া থাকার কষ্ট নেই। তুমি ও দুটো রাখো।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দুর্গা বলে, খাওয়নের চিন্তার থনে চাষের চিন্তাই এহন বড়। আনন্দ ক্ষেইপা গেচে। একা একা ক্ষ্যাতের আগাছা সব সাফ কইরা ফালাইচে। এহন জমিনে লাঙ্গল দেওয়ন লাগব। হ্যার লেইগা চাই জনকত কামলা আর তাগ রোজের টেকা।

টাকা তো পাচ্ছই। তবে ক'টা দিন সবুর করতে হবে এই যা।

ঐ হানেইত গোলমাল। নিশির বাপ আইজ সন্ধার সময় আইছিল। কি করুম না করুম কাইল বিহানে হ্যারে কওয়ন লাগব। টেকার দরকার অইলে তাও হ্যায় মহাজনের থন লইয়া দিবার পারব কইল।

ছি ছি ছি, তুমি ঘরের কথা সব তার কাছে বলে দিয়েছ নাকি? উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে রামকান্তর কণ্ঠস্বরে।

না, তা কিছু কই নাই। তবে না কইয়া আর উপায় কি। হগলের কাম কাইজত অইয়া গেল আর কবে চাষ করামু। কি করুম, আমার কপালই মোন্দ। নইলে কুমার বাহাদুরই বা ই-সন এত দেরি করব ক্যান?···

না না না, ইষ্টি কুটুমের কাছে তোমাকে ইজ্জৎ খোয়াতে হবে না। যে কোরেই হোক, কালই আমি তোমাকে টাকা দেবো। আনন্দকে তুমি কাজ চালিয়ে যেতে বলো।

আপনি এত টেকা কোনহানে পাইবেন? পরথম কিস্তিতেই যে নগদ পুঞ্চাশ টেকার মতন চাই। রোগা শরীলে খালি খালি ঘোরাঘুরি কইরা শরীল খারাপ করবেন।

সে ভাবনা আমার। অন্তত এটা রেখেও তো কিছু পাবো, হাতের সোনার আংটিটা দেখিয়ে জবাব দেয় রামকান্ত। চা বাগানের প্রে ওকে উপহার দিয়েছিল আংটিটা। সন্তান প্রসব করাতে গিয়ে মারা যায় প্রে। সেই থেকে-

শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও আংটিটা রামকান্তর হাতে আছে। কৃপণের মতোই রক্ষা করে আসছে ও এটা।

কন কি! সোনা রাইখা টেকা লইবেন আর হেই টেকা আমি নিমু! মইরা গেলেও ত না, দুর্গা বলিষ্ঠ কণ্ঠেই বাধা দেয়।

আরে না না, আংটি বাঁধা আমাকে দিতে হবে না। নায়েব মশায়কে বললে ও টাকা আমি দিন কয়েকের জন্য হাওলাত নিতে পারবো।

কিন্তু—

মুখের কথা শেষ হয় না দুর্গার, রামকান্ত বাধা দেয়, তাতে কি হয়েছে? সব টাকা তো তুমি আমাকে শোধ করেই দেবে। দেখলে না, মধুদা কেমন বিচক্ষণ ছিলেন। পাছে রটে যায় সেই ভয়ে কোন মহাজনের কাছ থেকে কর্জ করেন নি। কুমার বাহাদুর কখনো তাগাদায় আসবেন না। এমন কি কাউকে কিছু বলবেনও না। দীনুকাকাকে যেন ঘরের কথা কিছু বলো না। ওতে সম্মানী বাড়ির সম্মানই শুধু নষ্ট হবে।

দুর্গা আর ভাবতে পারে না। রামকান্তর কথাই ওর মনে ধরে। সেই ভাল, কাল সকালে নিশির বাপকে খবর পাঠাবে, টাকার দরকার ওর নেই। শুধু যেন একটু দেখে শুনে দেন উনি।

দুর্গাকে নিরুত্তর দেখে রামকান্ত আবার বলে, ভাবছ কি? আমি তোমার ভালর জন্যই বলছি। রাত হয়েছে শুয়ে পড়গে। আমাকেও আবার একা একা অনেকটা পথ যেতে হবে।

হ, রাইত অইলই। একা একা যাওয়ন লাগে একটা লণ্ঠন নিয়া বাইরইবার পারেন না।

ভয় নেই, আমার গলায় যজ্ঞ উপবীত আছে, দেও দস্যি আমাকে কিছু করতে পারবে না। তুমি শুয়ে পড়ো, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত।

হ, কি আর করুম। কপাল মোন্দ তাই আপনারে এক ছিলুম তামুকও দিবার পাল্লাম না।

দরকার নেই, আমার কাছে বিড়ি আছে। এখন আসি।

দুর্গা গড় হয়ে প্রণাম করে। রামকান্ত ওর পিঠের ওপর হাত রাখতে গিয়েও কেন যেন পারে না। মুখেই শুধু 'কল্যাণ' হোক বলে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে আসে।

॥ ১৯ ॥

চৈত্রের টানে বৈরাগীখাল প্রায় শুকিয়ে যায়। মাঝে মাঝে তলানি কিছু কিছু জমে থাকলেও সে শুধু কাদা গোলা। বাইরের কাজ কোন রকমে চলে তা দিয়ে। রান্না খাওয়ার জল ধলেশ্বরী থেকেই আনতে হয়। চাষী বৌদের এ সময়ে কাজ করে কূল নেই। ঘরের মরদরা ক্ষেতের কাজেই ব্যস্ত। তাদের দিয়ে এদিকের কুটোগাছও সরাবার উপায় নেই। উল্টো ক্ষেতেই তাদের দুপুরের ভাত পৌঁছে দিতে হয়। গোয়ালে গরু থাকলে এ সময়ে তার যাবতীয় কাজও নিজেদেরই সারতে হয়। কিন্তু সকল কাজের সেরা কাজ জল তোলা। কারো বাড়িতেই জলের কোন ব্যবস্থা নেই। ঘর গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ করতে হয় নদীর জলে। দুর্গার সংসার ছোট হলেও জলের ঝক্কি অনেকের চেয়ে বেশী। কেন না, ওরা কেউ খালের জল মুখে দিতে পারে না। একে বিশ্রী গন্ধ তার ওপর কোন বাছবিচার নেই। যার যেমন খুশি ময়লা কাচছে। না না, ও জলে কোন কাজ হবে না। ঘরে ঠাকুর সেবা রয়েছে, নদীর জল ছাড়া উপায় নেই। মা মেয়ের দু'জনের একজন জল টানতেই হিমসিম। আনন্দকে দিয়ে এখন আর এদিকের কিছু হবার নয়। খামারের কাজেই ও ভীষণ ব্যস্ত। রামকান্ত নগদ এককালীন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছে। আরো দিয়ে যাচ্ছে দৈনন্দিনের যৎসামান্য যা। নেশায় মানুষ বুঝি সব কিছুই করতে পারে। দিন টাকা প্রতি দু'পয়সা সুদে নায়েব রাখালের কাছ থেকে কর্জ করেছে পঞ্চাশ টাকা। বুক দুরদুর্ করে কাঁপে রামকান্তর। কুমার বাহাদুর এসে ব্যবস্থা না করলে নির্ঘাত চর ছেড়ে পালাতে হবে। ভগবান বোধ হয় কোথাও ওকে থাকতে দেবেন না। ভাগবত পাঠে বসে এলোমেলো চিন্তায় ডুবে যায় রামকান্ত।....

স্নানের সময় বড় ঘড়ার এক ঘড়া জল দুর্গা আনলেও সংসারের বেশীর ভাগ জল ময়নাকেই টানতে হয়। ঝাঁ ঝাঁ পোড়া দুপুরের সময় খানিক বিরতি থাকলেও সকাল বিকেল কামাই নেই। বেশ মানায় ময়নাকে ছোট পেতলের ঘড়াটায়। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পিঠভর্তি কালো এলো চুল। বাবুর হাটের রঙিন একখানা ডুরে শাড়ী পরনে। 'ডল' পুতুলই যেন একটি। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই আছে। স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতোই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবার জন্য ছটফট করে। কিন্তু এখন তো আর তেমন দৌড়ঝাঁপের সুযোগ নেই। বৈরাগী

বাড়ির বউ ও। রয়ে সয়েই চলতে হবে। ময়নার সময় সময় বড় অতিষ্ঠ মনে হয়। সময় সময় আবার ভালও লাগে। সুডোল দু'বাহুতে ঝলমল করছে রূপোর চুড়ি ক'গাছা। পায়ের 'বল-তোড়াও' নতুন তৈরী হয়েছে। মনের মতো বেশ ক'খানা রঙিন শাড়ীও পরতে পারছে। বিয়ের কনে বলেই না এসব পেয়েছে। নয়তো কবে আর এমন বাহারের জিনিষ পেয়েছে ও।....মনের উৎসাহেই দুবেলা কলসী নিয়ে ঘাটে যায় ময়না। আকুল আবেগে মায়াবী দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে চরধল্লার বুড়ী বটগাছটার দিকে। চঞ্চল হরিণীর মতো মনে মনেই চরময় ঘুরে বেড়ায়। দূর থেকে এক ঝলক নিশির দিকেও তাকাতে চেষ্টা করে। গুরুজনরা কেউ কাছে থাকলে মাথা নীচু করে দেয়। সই, খেলার সাথী, ঠাকুরমা, দিদিমারা ঠাট্টা-তামাসা করে। কলসীর জলের সঙ্গে কানায় কানায় ভরে ওঠে মনের আনাচে-কানাচে। দৈব ওদের আনুষ্ঠানিক মিলনে বাধা দিয়েছে। কিন্তু নিশি তো ওর জীবন-মরণের সাথী ছাড়া আর কেউ নয়। পুতুল-মেয়ে—স্বভাবের চাপে যেন এক পাকা গিন্নী। প্রেম প্রীতি ভালবাসার ও যেন এক মূর্ত প্রতীক।...

চৈতালী প্রভাত। ঝিরঝির করে বইছে মাতাল বাতাস। পূব আকাশে সূর্যি ঠাকুর ধলেশ্বরীতে নেয়ে উঠলেন। কামারশালার টুকটুকে তাওয়াই একখানা যেন। নিশি একপাল গরু নিয়ে মাঠে চলেছে। বিয়েটা এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন ভড়কে গেছে ও। দোষ যেন ওরই। ওরই কপাল দোষে যেন মধুর এ দশা। লোকের কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। পোড়া-কপালে লোককে আর কে সুনজরে দেখে।...মনমরা হয়েই চলে নিশি। এর চেয়ে বিয়ের দিনটা ঠিক না হলেই ছিল ভাল। দিব্যি ময়নার সঙ্গে হেসে খেলে কাটাতে পারতো। এখন তো শুধু লুকোচুরি খেলা। ঘাটে পথে ময়নার সঙ্গে ওর যেন ভাশুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক।...দগ্ধে মরাই সার হয়েছে এখন। যাকে নিভৃতে একক পাবার কথা—সে হয়ে আছে নাগালের বাইরে। কিন্তু—মন যে মানে না। বাঁশীতে ফুঁ দিলেই যে বেজে ওঠে, "রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি।"...আগে হলে দূরের রাধা ছুটে কাছে আসতো। আকুল হয়ে শুনতো একটার পর একটা গৎ। নয়তো হাত থেকে বাঁশী কেড়ে নিয়ে ফিক করে হেসে ফেলতো—মুখোমুখি বসে গুড় মুড়ি খেতো। আর এখন? এখন তো রাধার পথেও সহস্র বাধা। বিয়ের কনে, দৌড়ঝাঁপ আর

চলবে না। কাছে ঘেঁষতেও মানা। শহর নয় যে মন্ত্র যখন খুশি পড়লেও—অবাধ মেলামেশায় দোষ নেই। এ পাড়া গাঁ। এখানে আছে কঠোর সামাজিক শাসন। মন্ত্র পড়ে সাত পাক না দিলে নরনারীর মিলন এখানে অবৈধ। সে তুমি মোড়লের ছেলেমেয়ে হলেও ঠিক তাই! ছোটবেলায় এক সঙ্গে খেলেছ—খেলেছ। এখন যখন বিয়ের বরকনে তখন শাসন মেনেই চলতে হবে।...কিন্তু শাসনের প্রশ্ন এখনো ওঠেনি। মনই নিশির ভেঙে গেছে। মধুর জন্য সময় সময় ভেতরটা বড় পোড়ায়। অমন ধর্মপ্রাণ মানুষ—কি করতে কি হয়ে গেলো। কে জানে, অদৃষ্টে আরো কি আছে। ঠাকুর বোধহয় ওদের মিলন চান না। ময়না কি তাহলে পরই হয়ে গেলো? অপরিণত মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা নিশির...

প্রশ্ন ময়নার মনেও উঠেছিল। কিন্তু এখন আর ওর কোন সংশয় নেই। ঠাকুরদার কাল অশৌচটা মিটে গেলেই আবার মিলন হবে ওদের। এ দিবা রাত্রির মতোই সত্য। বিধাতা ওদের দু'জনকে মিল করেই পাঠিয়েছেন। ধরতে গেলে বিয়ে ওদের হয়েই গেছে। শুধু মন্ত্র পড়াটাই যা বাকী। সে আর এমন কি ব্যাপার। একদিন তা হবেই। অশৌচ মিটে গেলেই হবে।... ময়না নিশিকে স্বামী জ্ঞানেই ভক্তি করে। খেলার সাথী ছিল নিশি, এখন দেবতার আসনে বসেছে। হ্যাঁ, স্বামী তো দেবতাই। মা, ঠাকুরমা, দিদিমারা তো তাই-ই শিখিয়েছে ওকে। স্বামীর অন্য যে রূপই থাক না কেন—দেবতা ছাড়া সে আর কিছুই নয়। অন্ততঃ ময়নার কাছে তো নয়ই। কিন্তু দেবতা তো আর দানব নয়। তবে ওকে ভয় করার কি আছে? কলসীতে জল ভরে ঘাট থেকে উঠে আসছিল ময়না, নিশিকে দেখে ফিক করে হেসে ফেলে। কচকচে বালুর ওপর ভোরের স্বচ্ছ জল। প্রভাতী রোদের কনক আভায় দীপ্ত। ওর ঢলঢলে মুখখানা খুবই উজ্জ্বল দেখায়। দেখে নিশিও হেসে ফেলে। শিস দিতে দিতেই গরুর পাল নিয়ে এগিয়ে যায়। কলসী কাঁখে করে ময়নাও হাসতে হাসতেই জল থেকে উঠে আসে।

ঘাটে আর আর যারা ছিল প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। ময়না নিশির চোখো চাখিতে কেউ কোন সাড়া দেয় না। হয়তো দেখতেই পায় নি কেউ। যদি দেখেও থাকে তাতেও কিছু এসে যায় না। ছোট ছোট দুটি প্রেমিক প্রেমিকার পুতুল খেলা ভালই লাগে ওদের। কি সুন্দর দুটিকে দেখতে!...কিন্তু ক্ষ্যান্তর কথা আলাদা। রিক্তা নারী। আজীবন লাঞ্ছনার

মধ্যেই কেটেছে। কারো এতটুকু সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, রং-তামাসা আদৌ সহ্য হয় না ওর। কি পেয়েছে ও জীবনে? রূপ যৌবনের জৌলুস কি সংসারের কারো চেয়ে কিছু কম ছিল ওর? এই রূপ দেখেই না বিশ্বাস বাড়ির বড় ছেলে ওকে বিয়ে করেছিল। সোনার চাঁদ বর—খাসা চেহারা। কিন্তু নির্মম বিধাতা। মাত্র ন'দশ বছর বয়েস। হয়তো ঐ ময়নার সমবয়সীই হবে তখন। বরের বয়েসও নিশির মতোই। গা ভর্তি গয়না—ভাল শাড়ী—ভাল খাওয়া থাকা। পরীর মতো বউ পেয়ে বিশ্বাস বাড়িতে খুশীর বান ডেকেছে। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। এসিয়াটিক কলেরায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুর্গাপদ খতম। কমলকলির চোখ আর ফুটলো না। যখন ফুটলো তখন অনাহুত ভ্রমরের দংশনে সর্বাঙ্গ জর্জর। শ্বশুরকুলে ঠাঁই নেই ক্ষ্যান্তর। মা বাবাও দগ্ধে দগ্ধে বছর কয়েকের মধ্যেই স্বর্গে গেলেন। দীঘির কমল পানা পুকুরের পাঁকেই ভেসে চললো। সর্বশেষ ঘুরতে ঘুরতে এসে উঠেছে এই চরে। এখন তো বিগত যৌবনা এক বুড়ী মাগী। সামনের চারটে দাঁতই নেই। দগড়া দগড়া মেচেতা পড়ায় কনক বরণ পোড়া কাটে রূপান্তরিত। কপাল আর গালের বলিরেখাগুলোও সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আদরিণী আজ দু'মুঠো ভাতের কাঙালিনী। না, এ সব বেহায়াপনা ও সহ্য করবে না। ঘাটে পথে নাগর নিয়ে কিসের এত ঢলাঢলি? লঘু গুরু জ্ঞান নেই!...পাশেই হুঁকোর গুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল গৌরদাসী। ওকে লক্ষ্য করেই ঝংকার তোলে ক্ষ্যান্ত, দেখলিত গরি, ছাই কপালীর তামসাডা? ছ্যামড়া গরু লইয়া যাইবার নৈচিল, কেমুন চখ্ মারল?

তুমি চুপ কর দাদী। বয়সকালে অমুন একটু-আধটু কইরাই থাকে। তোমরা কর নাই? গৌরদাসী গলার স্বর স্বাভাবিক রেখেই বাধা দেয়।

আল নাল ছেঁড়ী, না। আমাগ কালানে ইসব ছিনালী আচিস না, সমর্থন না পেয়ে ক্ষ্যান্ত রাগে ফেটে পড়ে।

তুমি যে কি কও দাদী, এহন কি আর হ্যা কাল আচে? এহনকার পোলা ম্যায়ারা আগে ভাব করে—পরে বিয়া বয়। ও সব ছাইড়া ছাও, পাশ কাটাতেই চেষ্টা করে গৌরদাসী।

কিন্তু ক্ষ্যান্ত ছাড়ে না। বলে, এত বাড়াবাড়ি বালো নয় ল বালো নয়। সিঁতির আগায় সিন্দুর উঠবার আগেইত দাদারে খাইচে, এহন ভাতারও কপালে থাকে কিনা ছাখ। ছ্যামড়ারে যেভাবে মজাইচে, গিলা খাইতে কতক্ষণ?

গৌরদাসী এবার আর শান্ত থাকতে পারে না। তীব্রভাবেই বাধা দেয়, কি তুমি যা তা কইবার নৈচ! তোমার মুখে কি কিছু আটকায় না? মাতবরের কত সাদের কোলের পোলা, হারে তুমি এই সব কও! যাইট বালাই, বাঁইচা থাউক।...

আল আমিওত হেই কতাই কই। ঐ ডাইনী মাগীর নজরের থন ছুটবার না পাল্লে কি ছ্যামড়া বাঁচব? তুই না দিনের মদ্দে সাতবার যাচ মাতবর বৌয়ের কাচে, কতাডা কানে দিবার পারচ্ না?—ক্ষ্যান্ত গলার স্বর খাদে নামিয়েই জবাব দেয়।

কিন্তু গৌরদাসী এবার সপ্তমে ওঠে, সাতবার আবার যাইবার দেখলা তুমি কোনহানে? দিনে রাইতে তুমিওত কমবার যাওয়া আসা কর না, তুমি কইলেই পার! আমি ইসব মোন্দ কতা কইয়া মোন্দ অইবার যামু কোন দুখ্যে?

আল মোন্দ অবি নাল মোন্দ অবি না। বাড়িতে আবার পাকা ফলার অইলে তর ডাক পরব, ভ্রূ কুঁচকিয়েই জবাব দেয় ক্ষ্যান্ত।

পাকা ফলারের লোবে তোমার মতন ল্যাং-ল্যাং কত্তে কত্তে আমরা মাইনষের বাড়িতে যাই না। অমুন সাত হাত নোলা আমাগ না। মাইনষে আমাগ আপনার থেইকাই ডাকে।...

গৌরদাসী কথা শেষ করতে পারে না। ক্ষ্যান্ত মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফেটে পড়ে, কি কলি, তুই আমারে খাওয়ার খোটা দিলি! তর মতন কবে ল আমি মাইনষের লগে ঢলাইবার যাই? বাড়িতে আইসা নিমনৃতন্ না কল্লে ক্ষেন্তি কারুর বাড়ি হাগতে মুততেও যায় না।

আহা-হা, ছিনালরে আবার মাইনষে পায়ে ধইরা সাদবার আহে। মাইনুষের বইয়া গেচে। নিশার মার লগে তর কাইজা আচিল নাল হারামজাদী। পাকা ফলারের গন্দ পাইয়া তার পায়ে তুই ত্যাল দিবার যাচ নাই?

সাপের মুখে ধুলো-পড়া পড়ে যেন। রাগের মধ্যেও কিছুটা লজ্জা পায় ক্ষ্যান্ত। ঘাটের পথে একা পেয়েই কুসুমের সঙ্গে যেচে দুটো কথা বলেছিল। হয়তো একটু দীনতাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। কিন্তু সে কথা যে মাতবর বউ তামাম লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে একথা ও ভাবতেও পারেনি। কপাল মন্দ তাই সকলেই হেলাফেলা করে। রাগে দু'চোখ ফেটে জল বেরোতে চায় ক্ষ্যান্তর। তবু দম রেখেই গৌরদাসীকে পাল্টা জবাব দেয়, ঢলাইবার গেচিলাম বেইশ করচিলাম। অরা আমাগ আত্মীয়। তর কি ল কইড়া খানকী?

আল আমার আত্মীয় আলি ল। দীমু বৈরাগী কি তর বাপ না?—ভেংচি কেটে জবাব দেয় গৌরদাসী।

ভেংচি ক্ষ্যান্তও কাটে। বলে, আমার বাপ অইবার যাইব ক্যান, তর বাপ। তগ চৈদ্দ পুরুষের বাপ ভাতার। খানকী, ছাই কপালী, হারামজাদী...এক নিশ্বাসে উন্মাদিনীর ন্যায় বকতে থাকে।

গৌরদাসী মুখে আর কিছু না বলে তেড়ে এসে গলা চেপে ধরে।

ঘাটময় সোরগোল পড়ে যায়। আশপাশের আর সকলে যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারাও হকচকিয়ে ওঠে। পদুর মা ভারিক্কী মানুষ। নিকটেই বালি দিয়ে কলসী মাজছিল। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ছাড়িয়ে দেয়। টানতে টানতে গৌরদাসীকে নিয়ে পাড়ে উঠিয়ে দেয়।

যাচ্ছেতাই করে গালি দিতে দিতে বাড়ির দিকেই রওনা হয় গৌরদাসী। যাবার সময় সব কথা কুসুমকে বলবে বলেও শাসিয়ে যায়।

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে ক্ষ্যান্ত। আর হয়তো ওর পাকা ফলারের আশা নেই। তার চেয়েও ভাবনার কথা, প্রায়ই যে চেয়ে-চিন্তে দু'মুঠো আনে মাতবর বৌয়ের কাছ থেকে তাও হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে। না, কপালই ওর মন্দ। নইলে অন্যদিন যে কত রসিয়ে রসিয়ে সায় দেয় সে আজ এ রকম চটবে কেন? এত দুঃখও কপালে আছে....রাগে দুঃখে কেঁদেই ফেলে ক্ষ্যান্ত। ইস, ছিনালটা এমন করে ধরেছিল যে গাল গলা এখন টাটাচ্ছে। গলায় হাত বুলাতে বুলাতে এবং গৌরদাসীকে শাপ-শাপান্ত করতে করতে ক্ষ্যান্তও ঘাট থেকে উঠে যায়।

॥ ২০ ॥

চরখল্লা আর চরফুটনগরের চাষীদের পাট বোনা নির্বিঘ্নে শেষ হয়। এখন সময়মতো পরিমিত বৃষ্টি আর জল হলে ফসল ভাল হবারই আশা। এখনকার কাজ শুধু তীক্ষ্ণ নজর রাখা। গরু বাছুরের ভয়ই সব চেয়ে বেশী। চারা ফনফনিয়ে উঠবার মুখেই যদি ওদের দাঁত লাগে তাহলে ভাল ফল লাভের আশা নেই। কুচুটে মানুষের দৃষ্টির ভয়ও কম নয়। এক একজনের দৃষ্টিতে যেন বিষ মাখানো থাকে। অঙ্কুরেই জ্বলে-পুড়ে যায় সব। হাতে বিশেষ কোন কাজ করতে না হলেও ক্ষেতে প্রত্যেককেই নিয়মিত বেরুতে হয়। ঘুরে ফিরে

দেখতে হয় কোথাও কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। সামনের মাসখানেক তো প্রত্যেকেরই একরকম ছুটি। তারপর আবার একটু খাটা-খাটুনী করতে হবে। চারা হাতখানেক বড় হলেই নিড়িয়ে দিতে হবে। বেশ কিছু খরচাও ওতে আছে। আগাছা আর অপুষ্ট চারা হিসেব করে বেছে ফেলতে হবে। উপযুক্ত নিড়ানির উপরেই নির্ভর করে ভাল ফসল। একটা চারার সঙ্গে আর একটা চারার দুরত্ব বেশ হিসেব করে রাখতে হবে। বাড়বার মুখে মাথায় মাথায় জড়িয়ে গেলেই সর্বনাশ। ফসল তো ভাল হবেই না—পোকা ধরারও সম্ভাবনা থাকে। পাকা চাষীকে অবশ্য তা নিয়ে বেশী ভাবতে হয় না। জরিপ-বিদের চেয়েও তীক্ষ্ন ওদের দৃষ্টি। এক নজর দেখেই কাস্তে চালাতে পারে। এমন কি গান গেয়ে গেয়েও পারে। এ সময় যাদের ঘরে দু'মুঠো চাল-ডাল আছে তাদের পরম সুখ। আত্মীয় কুটুমের বাড়ি যাও, প্রাণ খুলে দয়াল চানরে ডাকো, গভীর রাত পর্যন্ত খোল বাজিয়ে কীর্তন করো। মনের আনন্দে কলকের পর কলকে তামাক খাওয়া তো আছেই। অভাব থাকলে ঘরে বসে কুলো কাঠা বুনো, গরু দুইয়ে দুধ নিয়ে গঞ্জে যাও, নয়তো বেচ ঘাস। গঞ্জের হাটে তরি-তরকারি বেচারও সুযোগ আছে। উৎসব করার মতো প্রাচুর্য না থাকলেও দিন কারো মন্দ কাটে না। সব চেয়ে আশার কথা, মা লক্ষ্মীর চরণ রাখার জন্য আসন পাতা হয়েছে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে। একবার উনি পা রাখলে আর কথা কি। মুঠো ভর্তি আসবে করকরে টাকা—সারা বছরের বাড়তি খরচা। আশায় আনন্দে দিন একরকম ভালই কাটছে।

বৈশাখের শেষাশেষি নিড়ানি আরম্ভ হয়। কালবৈশাখীর ঝড় জলে বীজ ধুয়ে মুছে যায়নি। চারাগুলি বেশ ফনফনিয়েই উঠেছে। শত শত কাস্তের চলে অবিরাম কাজ। প্রচণ্ড রোদ মাথার ওপর। কিন্তু সবুজ চারাগুলি ওদের দৃষ্টিতে এনেছে আশার স্বপ্ন। সোনার খনিই যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছে ওরা। ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই, এমন কি ঘুম পর্যন্ত নেই দু'চোখে। ক্ষেতে জল ঢোকার আগেই চারাগুলিকে মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াবার মতো শক্তি যোগাতে হবে। ওদের হাতের কাস্তেই হলো সে শক্তির উৎস। ভাল নিড়ানি হলেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে ওরা। নয়তো সমূলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বর্ষার বংশী ধলেশ্বরী। বালি চাপা দিয়ে গিলে ফেলতেও পারে নাগ-নাগিনী। চাষীদের নাইবার খাবার সময় নেই। শুধু কাজ আর কাজ।

কাস্তে হাতে আনন্দও ক্ষেতে নামে। কিন্তু এতো ওর একার কাজ নয়। সঙ্গে চাই আরো জন পাঁচ সাত। সকলে মিলে একযোগে কাজ করলেই নির্দিষ্ট সময়ে নিড়ানি শেষ হতে পারে। কিন্তু দিদি যে লোকের কথা মুখেও আনছে না। দম বন্ধ হয়ে মরবে নাকি ও? এক তো সকলের শেষে চাষ হয়েছে। নিড়ানিও যদি সময়মতো না পড়ে তাহলে চারা বাড়বে কি করে?… অপেক্ষা করে করে তেলে-বেগুনেই জলে ওঠে একদিন। দুর্গা ঘর নিকোচ্ছিল, আনন্দ তাড়া দেয়, অ দিদি, বলি তোমার মতলবখানা কি কও ত? কয়দিন ধইরা কইবার নৈচি নোক নেই, তা তুমি হু হা-ই করচ না। চারাগুলির কি সব্বনাশ করবা নাকি? জল যে দিন দিন বাড়বার নৈচ হ্যাদিগে দেখচ ত?

জল বাড়ছে, জল বাড়ছে তবে কুমার বাহাদুর আসছেন না কেন? হ্যাঁ, জল প্রথম দিকে দিনকয়েক বেড়েছিল বটে। বৈশাখী হাওয়ায় বেশ বড় বড় ঢেউ জাগছিল বংশী ধলেশ্বরীর বুকে। হয়তো আর কিছুটা বাড়লেই চারদিকের খাল বিল ছুটতো। কুমার বাহাদুরের বোট আসতেও বিলম্ব হতো না। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই যে আবার কমে গেলো। ঘাটলার দুটো সিঁড়ি ডুবেছিল তিনটে আবার জেগে উঠেছে। কপালই মন্দ। এখন আবার একটু-আধটু বাড়ছে বটে। কিন্তু এ বাড়ায় তো কাজ হবে না। কুমার বাহাদুরের 'বোট' ভাসলেই কথা। টাকা কোথায় যে লোক নেবে। পাঁচটি লোক নিলে খোরাকীর চালই চাই কম করেও দৈনিক পাঁচ সাত সের। তারপর আছে মজুরীর টাকা। নিজেদের না হয় যা জুটছে আধ-পেটা খেয়ে কাটছে। পর লোক না খেয়ে কাজ করবে কেন? ঠাকুরমশায় তো রোজই গঞ্জের কাছারিতে গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মালিক না এলে উনিইবা আর কি করতে পারেন। নিজেইবা চাই কি করে। একটা মানুষকে কতবার অভাবের কথা বলা যায়…আনন্দর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে আকাশকুসুম ভাবতে থাকে দুর্গা।

ওকে নিরুত্তর দেখে আনন্দ আরও চটে যায়। বলে, চুপ কইয়া রইলা যে, কি করবা কইবা ত?

কি আবার করুম, যা পারচ নিজে কর, বিরক্তির সঙ্গেই এবার জবাব দেয় দুর্গা।

নিজে করুম! ইডা কি একলার কাম? আনন্দর কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

তবে চুপ কইরা বইসা থাক,—উদাসীন থেকেই বলে দুর্গা।

না, তোমার মাথাই খারাপ অইচে। আমরা বইহা থাকলে কি জল আমাগ লেইগা বইহা থাকব? সব না ভলাইয়া লইয়া যাইব।

গেলে আমি কি করুম?—দুর্গা পাশ কাটাতেই যায়।

তুমি করবা না তয় কি আমি করুম? তহন ত কইলা, আনন্দ কাম কর। চাষে মোন্ দে। এহন চোক উল্টাইয়া থাকলে চলব ক্যান?

যা তা কইচ না আনন্দ। কইলাম ত, পারচ নিজে কর না পারচ চুপ কইরা বইহা থাক।

হ, বইহা থাকলেই খাওয়ন আইব আর কি? আমি যাই, বিয়াই মশইর লগে পরামশ্শ করিগা, আনন্দ সকালের পান্তা না খেয়েই বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে।

দুর্গা ধমক দেয়, বালো অইব না আনন্দ। পানরা গিলা (খাবার খেয়ে) ক্ষ্যাতে যাবি নাকি যা। তর আর মোড়লগিরি করন লাগব না।

আনন্দ মনের রাগে ফিরে দাঁড়ায়। বলে, বেইশ, আমি কিচুর মদ্দে থাকবার চাই না। তবে পরে য্যান আমারে আর কইয় না, আনন্দ, ইডা কর ওডা কর।

আইচ্ছা, তাই অইব। এহন খাবি নাকি খা গা।

আনন্দর আজ আর খেতে মন চায় না। এত পরিশ্রম করেছে, সব ভেস্তে যায়। দিদির মাথায় যে কি মান-সম্ভ্রমের বাই ঢুকেছে তা ভগবানই জানেন। আপনজন দীনু বৈরাগী—কত স্নেহ করেন—ভালবাসেন। ঘরের কথা তাঁকে বললে ওনার মানের হানি হবে। যাক, যা পারে করুক। আমি আর কিছুতে থাকছিনে।...ভাবতে ভাবতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রান্নাঘরের দিকে যায় আনন্দ। পেঁয়াজ পান্তা অতি প্রিয় হলেও আজ আর তেমন রোচে না।

খেয়ে-দেয়ে আনন্দ বোধ হয় ক্ষেতেই চলে যায়। দুর্গার ভবনা উথাল দিয়ে ওঠে। জোর করে আনন্দর মুখ বন্ধ করে দিলেই সমস্যা মিটবে না। কিন্তু কি করতে পারে ও? ভাগ্য যদি পদে পদে প্রতারণা করে তাহলে ওর দোষ কি? রামকান্ত তো রোজই এসে আশ্বাস দিচ্ছেন। নদীর বুকেও ছোট ছোট ঢেউ জাগছে—জল বাড়ছে। গ্রহ-দোষ কাটলে হয়তো কুমার বাহাদুর শীগ্‌গীরই এসে পড়বেন। ঠাকুরমশায়ের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আসা মাত্রই টাকা হাতে আসছে। দিনকতক ধৈর্য ধরে থাকাই সমীচীন। পার ছাড়িয়ে ক্ষেতে জল উঠতে এখনো ঢের বাকী। কিন্তু তার আগেই দ্বিতীয় বার নিড়ানি দিতে হবে। চাষ যখন সকলের পরে হয়েছে নিড়ানিও না হয় তাই

হবে।…এলোমেলো চিন্তায় হাতের কাজ আর এগোয় না দুর্গার। দু'এক পোঁছ দিতে না দিতেই আবার ভাবে, চাইলে হয়তো ঠাকুরমশায় আরো কিছু দিতে পারেন। খালি হাতে যে একযোগে পঞ্চাশ টাকা সংগ্রহ করতে পারে সে কি আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে পারবে না? টাকা পঁচিশেক হলেই তো এ যাত্রা চুকে যায়। সেই ভাল, আজ বিকেলে এলে মুখ ফুটে চাইব।… ঝিমিয়ে-পড়া মনে একটু বল পায় দুর্গা। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ঘাটে যায়। যেতে যেতে ভাবে, আনন্দটাকে ওভাবে দাঁতখিঁচুনি না দিলেও চলতো। বেচারা, কাজ কাজ করে ক্ষেপে উঠেছে। এরকম উৎসাহ থাকলে ক'দিন আর লাগবে ঋণশোধ করতে। দু'জনের সংসার, বেশ কেটে যাবে। না না, দু'জনইবা হবে কেন? ময়নার বিয়েটা হয়ে গেলে ঋণ যদি শোধ হয়ে যায় তাহলে আনন্দকেও আবার বিয়ে দিতে হবে। এই বয়সে ও কেন নেংটা শিব হয়ে থাকবে? নিজের নিদানই বা দেখবে কে? হাজার হোক, মেয়ে মেয়ে। বিয়ে দিলেই সে পর হয়ে যায়। আনন্দর যদি ছেলে-পুলে হয় তাহলে ওদের নিয়ে বেশ ভুলে থাকা যাবে। হ্যাঁ, প্রথম সুযোগেই ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বুদ্ধিই না হয় একটু কম। কিন্তু ওর মতো এমন স্বাস্থ্য ক'জন অবিয়েত ছেলের আছে?…ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘাট থেকে ডুব দিয়ে ফেরে দুর্গা।

রামকান্ত প্রায় প্রতিদিনই দুর্গার খোঁজখবর নেয়। কোনদিন বা ভাগবত পাঠে যাবার পথে কোনদিন বা ফেরার সময়। পথে ভাবতে ভাবতে আসে, আজ মনের কথা মুখ ফুটে বলবোই। এত করছি, একটু অনুকম্পা কি করবে না ও? ওকি কিছু বোঝে না? নিশ্চয় বোঝে, নয়তো মেয়ের মা হয়েছে কি করে।…রামকান্তর তৎপরতা বেড়ে যায়। মুখে মধু ঢেলেই উঠোনে পা দেয়। দুর্গা যেখানেই থাক ছুটে এসে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিতে কসুর করে না। আনন্দ বাড়ি থাকলে তাড়াতাড়ি হুঁকো এনে হাজির করে। আদর আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু ঐটুকুই। দুর্গা যেমন রাশভারি তেমন রাশভারিই থেকে যায়। প্রয়োজনের সব কথাই বলে কিন্তু চোখ মুখ গুরুগম্ভীর। বলি বলি করেও এ পর্যন্ত মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে নি রামকান্ত। কিন্তু তবু আসে। একরকম রোজই আসে। না এসে উপায় নেই তাই আসে। কোন কোন রাত বিছানায় শুয়ে ভাবে রামকান্ত, ওকি মনোমোহিনীর মায়ায়

পড়েছে? পুরাণে তো আছে, মহামায়া নানা বেশে অসুরকে ভুলিয়ে বধ করেছেন। দুর্গা কি সেই মায়ার ফাঁদই পেতেছে ওর সঙ্গে? পঞ্চাশ টাকা কর্জ হয়েছে নায়েব রাখালের কাছে। দৈনিক টাকা প্রতি দু'পয়সা সুদ। দশ পাঁচ দিনের ভেতর কুমার বাহাদুর আসবেন—তাঁর নিকট থেকে দুর্গাকে কর্জ নিয়ে দেবো—সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে। কিন্তু দশ পাঁচের জায়গায় যে মাসেক হতে চললো। এখনো কবে উনি আসছেন বলা যায় না। তাছাড়া এসেই যে টাকা দেবেন তারই বা স্থিরতা কি? মধু মণ্ডলের সম্পত্তির ওপর তো কোন আকর্ষণই নেই ওঁর। সকল আকর্ষণের সেরা আকর্ষণ দুর্গা। মনে হয় সেখানেই ওঁর দৃষ্টি। কিন্তু পাশার ছকে যদি দুর্গাকেই হারাতে হয় তাহলে আর লাভ কি হলো?...ভাগ্যের সঙ্গে জুয়ো খেলেই চলে রামকান্ত। রাত গভীর হতে গভীরতর হতে থাকে তবু ঘুম নেই দু'চোখে। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা—মায়াবিনী রাক্ষুসী। আবার পঁচিশ টাকা দিতে হবে ওকে। কিন্তু কেন? কি দিয়েছে ও বিনিময়ে? যে নিজে কিছু দিতে জানে না, সে এত চায় কোন লজ্জায়?.... কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে থাকে রামকান্তর। উঠে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আসে। মায়াবিনী রাক্ষুসী মুহূর্তে আবার প্রেমময়ী—রূপময়ী হয়ে ওঠে। না না, যেভাবেই হোক পঁচিশটা টাকা ওকে দিতেই হবে। এতে এত ভাববারই বা কি আছে? প্রের দেওয়া আংটিটা তো এখনো সম্বল আছে। অবশ্য দিব্যি দিয়ে দিয়েছিল খাসিয়া সুন্দরী। কোনদিনই যেন হাতছাড়া না করি। কিন্তু তা কি করা যাবে। মানুষ কি সকল অবস্থায় সকল দিব্যি রাখতে পারে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই আংটিটা বেচেই দুর্গাকে টাকাটা দিয়ে দেবো। হয়তো দু'চার টাকা হাতেও থাকবে। হ্যাঁ, তাই দেবো। হয়তো এই আংটিটাই অপয়া। প্রের প্রেতাত্মাই হয়তো দুর্গার পথ রোধ করে আছে। যত শিগগীর সম্ভব এটাকে দূর করাই সমীচীন। সম্ভব হলে কালই গঞ্জে যাবো।...ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে রামকান্ত।

আরো পঁচিশ টাকা দুর্গা একরকম বিনা আয়াসেই পায়। শুধু নিরিবিলিতে এক কল্কে তামাক সেজে খাওয়ানো আর মুখফুটে বলা। রামকান্ত তাতেই গলে জল হয়ে যায়। রামকান্ত তো তুচ্ছ, কুমার বাহাদুরও হয়তো গলে জল হয়ে যেতেন ওর কাম-কটাক্ষে। অবশ্য দুর্গাকে এক্ষেত্রে কোন কটাক্ষপাত করতে হয়নি। ওর মৌন ভাবগম্ভীর মুখাবয়বই রামকান্তকে পাগল করেছে। অমৃত সায়রে রামকান্ত বোধ হয় হাবুডুবু খেয়েই মরবে।...

টাকা পেয়ে দুর্গা সময় বিশেষের জন্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। নিড়ানির কাজ একরকম করে হয়ে গেলো। আনন্দ খুব খেটেছে। তিনজনের কাজ একাই করেছে ও। কাজ না পেলেই মানুষ অকেজো হয়ে পড়ে। কই এখন তো কোনরকম গাফিলতি দেখা যায় তামাক এখনো প্রচুর পরিমাণে খায়। কিন্তু আগের মতো এখন আর ওকে তামাকে খেতে পারে না। এক ছিলুম তামাকের লোভ দেখিয়ে এখন আর কেউ ওকে বশও করতে পারবে না। আনন্দ তো এখন রীতিমতো কাজের লোক হয়ে উঠেছে। কাজই ওকে রীতিমতো কর্মী করে তুলেছে। কাজ না থাকলে মানুষ অলস হবে না তো কি হবে?...

দুর্গার আশু প্রয়োজন মিটেছে। ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় থাকলেও বর্তমানে ও নিশ্চিন্ত। কমলী যখন বিয়িয়েছে তখন শাকান্ন জুটবেই। দু সের দুধ তো বাঁধা। বর্ষার মুখে দরও থাকবে ভাল। কম করেও সের প্রতি দু-আনা পাওয়া যাবেই। দুঃখ, ময়নার ঠাকুরদা একটা ফোঁটাও মুখে দিয়ে যেতে পারলেন না। অতটুকু বাছুর এনেছিলেন কমলীকে। সংসারে নিত্য অভাব চলেছে। তবু তারই মধ্যে বড় হয়েছে ও। আজ তো অমৃতদায়িনী মা। ওর মাতৃধারাই আজ তিনটে প্রাণীর বড় সহায়। নিড়ানির কাজ শেষ করে দুর্গা আজ সত্যি সত্যি নিশ্চিন্ত। এরপর আরো প্রচুর টাকার প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু তার জন্য বিচলিত হবার কিছু নেই। দয়াল রামকান্তই রয়েছেন। নিঃস্বার্থভাবে কি না করছেন বেচারা। কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে টাকা পেলে সর্বপ্রথম ওঁর টাকাটাই শোধ করে দিতে হবে। বলা যায় না মানুষের কখন কি প্রয়োজন হয়। লজ্জায় হয়তো কিছু বলতেই পারবেন না। আশ্চর্য মানুষের মন। এই মানুষ সম্বন্ধেই একদিন আমি কি জঘন্যতম ভাবনা ভেবেছি। একান্ত অনুকম্পা বশেই না যখনকার যা করে যাচ্ছেন উনি। নয়তো আমার কি গুণ আছে।...দুর্গা মনে মনে প্রণাম করে রামকান্তকে।

বহু ভাবনা-বিচলিত দুর্গা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত রামকান্ত দিন দিন তলিয়ে যেতে থাকে। ভাগ্যের সঙ্গে জুয়োই হয়তো খেলে চলেছে ও। দান তো এখন হারের দিকেই। প্রের স্মৃতি বিজড়িত আংটিটাও শেষ পর্যন্ত বিকিয়ে দিতে হলো। বেচারা প্রে। সুগঠিত দেহ—বুকভরা আশা। যে বয়সে মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে কাঁটায় কাঁটায় সেই বয়েসই হয়তো হবে ওর।

চা বাগানের দস্যুরা নিয়ত ওকে নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওর বুড়ী মাও ওকে অবলম্বন করেই খাওয়া-পরায় নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রে তা পারলো না। শরতের শুভ্র শিউলীর মতোই নিভৃতে এসে আত্মসমর্পণ করলো। সঙ্গে বাবার গচ্ছিত একরাশ টাকা ও কিছু সোনাদানা। বললে, ভট্‌চায, আমাকে তোমার বউ করো—চলো আমরা এখান থেকে পালাই।··· ভট্টাচার্য উচ্চারণ করতে পারতো না প্রে। ভট্‌চায বলেই সম্বোধন করতো। কিন্তু উচ্চারণে কি এসে যায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নারী সাপের ফণাও হাতের মুঠোয় চেপে ধরতে পারে। নিশ্চিত বুঝা গেলো, তাড়া খেয়ে আশ্রয় চাচ্ছে প্রে। অনুরাধা তখন স্মৃতিকায় ধুঁকছে। যমদূতের কাঁধে চড়ে বসে আছে বললেই হয়। ভাগ্যই বোধ হয় হাত ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চাচ্ছে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা। জানি না, কি দেখেছিল ও এই দীন ব্রাহ্মণের মধ্যে। তবে ওর মুখে শুনেছি, ওর ধারণা, বাঙালীরা সত্যিকারের ভালবাসতে জানে। ঘরের বৌয়ের মর্যাদা একমাত্র তারাই দিতে পারে। প্রের কথায় হাসি পেয়েছিল। অনুরাধা তখন গত হয়েছে। ও হয়তো তার কোন খবরই রাখতো না। রাখলে কি আর কখনো পারতো এমন করে আত্মসমর্পণ করতে ?··· ধন আর মান একসঙ্গে উজাড় করে তুলে দিলে উন্মাদিনী! এ কোন অনুকম্পার কথা নয়। নৈবেদ্য সাজিয়ে সত্যি সত্যি দেব পূজোতেই মেতে উঠলো অনাঘ্রাতা নারী। কি সে নিষ্ঠা—কি সে আকুলতা। সময় সময় বড় ভয় হতো। মুখের দুধ সরে গিয়ে বিষের হাঁড়ি বেরিয়ে পড়তে কতক্ষণ। নারী তো শুধু আর প্রেমময়ীই নয় রুদ্রাণীও সে। যে হাতে সুধা পরিবেশন করে সেই হাতেই খড়্গ ধরে।···কিন্তু ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্নই ছিল। প্রে তখন জোয়ারের জলে সাঁতার কাটছে। খোঁজখবর নেবার সময় নেই ওর। প্রে ছাড়া শাবকের অকল্যাণ চিন্তায় হিংস্র বাঘিনীর মতো যে গর্জে উঠতো সেও আর বেঁচে রইলে না। প্রের বুড়ী মা মাঝ পথেই স্বর্গে গেলো। আমি স্বস্তির হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। না না, প্রতারণা আমি করতে চাইনি। মানুষ যা চায় তার সব কিছুই ছিল প্রের মধ্যে। হোক বিধর্মী—ভিন্ন সমাজ দুহিতা, প্রে আমার জীবন সঙ্গিনীই।···প্রেও খুশীতে ডগমগ। খুশীর বাঁধ ভেঙেই ওর কোলে আগন্তুক আসছে। কত রঙিন কল্পনা মনের মণিকোঠায়। দারুণ শীত আসামে। দু'জোড়া মোজা, টুপি, সোয়েটার—রাম না জন্মাতেই রামায়ণ রচনা শেষ হয়ে যায় প্রের। কিন্তু হায়রে নিয়তি! বর্ষার জল নেমেছে

পাহাড়ের গা বেয়ে। সাত দিন অবিরত বৃষ্টি হচ্ছে। দোতলায় কাঠের ছোট্ট একখানি ঘর। সিঁড়িও কাঠের। প্রে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হঠাৎ একদিন জলের বালতি নিয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে যায়। প্রায় দোতলার কাছ থেকে গড়াতে গড়াতে এসে এক তলায়। আর কথা নেই, সঙ্গে সঙ্গে অচৈতন্য। চব্বিশ ঘণ্টা পর হাসপাতালে চৈতন্য ফিরলো। কিন্তু প্রে আর উঠে দাঁড়ালো না। তিনদিন পর মরা সন্তান প্রসব করতে গিয়ে জন্মের মতো চোখ বুজলো। মরণের ঘণ্টাধ্বনি বোধ হয় প্রে আগেই শুনতে পেয়েছিল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অনামিকা থেকে খুলে আংটিটা আমার কড়ে আঙুলে পরিয়ে দিলে। বললে, ভট্‌চায, আমাকে মনে রেখো। সন্তান হলে তাকে মানুষ করো। আমি আর বাঁচবো না।...

প্রের অনুরোধ দীর্ঘকাল রক্ষা করেছি। এমন অনেক দিন গিয়েছে উপোস দিতে হয়েছে। তবু প্রের দেওয়া আংটিটা হাত থেকে খুলিনি। আজ দুর্গা পণ ভঙ্গ করালো। তা আমি কি করবো? দুর্বার নিয়তি।...আংটি বেচে দুর্গাকে টাকা দিয়ে এসে রাত ভোর ভাবতে থাকে রামকান্ত। প্রে স্বেচ্ছায় নিজকে উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিল। আর দুর্গা? না না না, এ পাপাচার —এ অন্যায়। ভাগবতের ঠাকুর, তুমি আমাকে বাঁচাও। ভুল করেও দীর্ঘকাল আমি তোমাকে স্মরণ করেছি। তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাকে রক্ষা করো। আমি পালিয়ে যাবো এ চর থেকে। রক্ষা করো, রক্ষা করো দয়াময়...

নিঝুম নিস্তব্ধ চর। রামকান্ত ছাড়া বোধ হয় কেউ আর জেগে নেই। ঘন ঘন বিবেকের ছোবল পড়তে থাকে রামকান্তর মগজে। অন্ধকারে ভেসে ওঠে প্রের দুটি সজল সকরুণ আয়ত আঁখি।...

সান্ধ্য জল ভরতে প্রতিদিন ময়নাই ঘাটে আসে। কিন্তু ময়না আজ বেলাবেলি সইয়ের বাড়ি গেছে। সূর্য ডোবে ডোবে পেতলের বড় কলসীটা কাঁখে করে দুর্গাই আজ জল ভরতে আসে। বালি দিয়ে কলসীটা মাজতে মাজতে চোখ তুলে তাকায় পাট ক্ষেতের দিকে। বেশ পুষ্ট হয়েই বাড়ছে চারাগুলো। এরপর আছে দ্বিতীয় দফা নিড়ানি। তাতেও একগাদা টাকার দরকার। ঠিকমতো যত্ন করতে পারলেই সুফলের আশা করা যায়।...

ভাবতে ভাবতে গঞ্জের দিকে চোখ ফেরায় দুর্গা। ওকি! কাছারির ঘাটে ও তো গ্রীনবোটই! গোধূলির আবীর রঙের সঙ্গে বোটের তলায় সিঁদুরে রং একাকার হয়ে জল্ জল্ করছে। ও তো কুমার বাহাদুরেরই বোট। ঐ তো তাঁর নিশান উড়ছে প্রতীক চিহ্ন নিয়ে। ঠাকুর তাহলে এতদিনে দয়া করলেন। দ্বিতীয় দফা নিড়ানির ভাবনা তাহলে আর ভাবতে হবে না। জল যেভাবে বাড়ছে এভাবে বাড়লে আর পনেরো বিশ দিনের ভেতরেই কাজ আরম্ভ করতে হবে। তা হোক, নিড়ানি কেন, একেবারে কাটা, বাছাই, ধোলাইয়ের খরচা পর্যন্ত ঋণ নেবো। মায় ভট্‌চায মশায়ের টাকা।....মনের উল্লাসে জল ভরে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে দুর্গা। উনি যদি ভাগবত পাঠে যাবার পথে দেখা করে যান তাহলে তখুনি ওকে খবরটা বলবো। আবার এমনও হতে পারে আমার বলবার আগে উনিই আসবেন খবর বলতে।

দুর্গার ভাবনা ঠিকই হয়। ওর অনেক আগেই রামকান্ত ঘাটে বোট ভিড়তে দেখেছে। ওর গরজের চেয়ে রামকান্তর গরজ ঢের বেশী। প্রের আংটি গিয়েছে যাক কিন্তু রাখালের লেলিহান চোখ নিয়ত তেড়ে আসছে ওকে। টাকা প্রতি দিন দু'পয়সা সুদ। কাবুলিওয়ালাও যে হার মানবে।...ছুটে কাছারিতে যায়। কিন্তু কথা বেশী কিছু হয় না। শুধু কুশলবার্তাই আদানপ্রদান হয়। ভক্তি গদগদ চিত্তে পদরজ মস্তকে ঠেকাতেও কসুর করে না। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আজ ভীষণ ব্যস্ত কুমার বাহাদুর। সঙ্গে ইয়ার বন্ধু রয়েছেন জনকয়েক। আজ আর রামকান্তর মতো চাটুকারের প্রয়োজন নেই।...

রামকান্ত নিজ থেকেই "কাল আসবো হুজুর" বলে চলে আসে। অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ওতে বিরক্তির কারণই বাড়বে। না না, ভয়ের কিছু নেই। এইতো সবে এলেন। পথের ক্লান্তি বলেও তো একটা কথা আছে। তা'ছাড়া সঙ্গে বন্ধুজন রয়েছেন। এর চেয়ে কি আর খাতির করতে পারেন? প্রসন্নভাবেই তো কুশল জিজ্ঞেস করলেন। নিজের মনেই একথা সে কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর দুর্গার কাছে হাজির হয় রামকান্ত।

বলার আগে নিজেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে থাকে, তোমার কপাল খুলল বউ-গিন্নী। লক্ষ্য করেছ বোধ হয় কাছারির ঘাটে বোট লেগেছে?

দুর্গা ঘাড় কাত করেই সমর্থন জানায়। ওষ্ঠে কিঞ্চিৎ চাপা হাসি।

রামকান্ত গদগদ হয়েই বলতে থাকে, বলেছিলাম না, দুঃখ কারো চিরদিন থাকে না। ভগবান আছেন। তাঁকে ডাকলে উদ্ধার তিনিই করবেন।

ভগবান ত আছেই। কিন্তু আপনেই তার উপলক্ষ। আপনে না দেখলে ক্যারা আমারে বাঁচাইত, দুর্গা উত্তর করে।

না না, আমি কে? তোমার বরাতেই সব হচ্ছে। কাল কুমার বাহাদুর যেতে বলেছেন। আশা করি কালই সব ঠিক করে ফেলতে পারবো।

হ্যা ভাবনা আপনার। একটু বহেন, আমি তামুক ভইরা আনি।

না থাক, বড় দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন উঠি।

তা কি হয়? বালো একটা খবর আনলেন মিঠাই খাওয়াইবার না অয় না পাল্লাম, তামুক ছিলুমও কি খাওয়ামু না।

কিন্তু ওরা যে আবার সব খোল করতাল নিয়ে বসে আছে, রামকান্তর কেন যেন আজ একটু আদর খেতে ইচ্ছে হয়।

এক ছিলুম তামাক খাইতে আর কত দেরি অইব! আনন্দ নতুন তামুক মাখচে খাইয়া ভাহেন, বলতে বলতে উঠে যায় দুর্গা।

রামকান্ত খানিক একা একাই আকাশকুসুম ভাবতে থাকে।

হুঁকোর মাথায় কল্কে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে খানিক পরেই ফিরে আসে দুর্গা।

রামকান্ত বোধ হয় আকাশে সহসা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বলে, বউ-গিন্নী, ময়নার বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলো।

দুর্গার পুরোনো ক্ষতটা হঠাৎ কেউ যেন পা দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই উত্তর করে, তাইত দিবার গেচিলাম ঠাকুরমশয়। কিন্তু কপালে সইল কই?

প্রভু মঙ্গলময়। তাঁর লীলা-খেলা সব সময় আমরা বুঝে উঠতে পারিনে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন আর দেরি করো না, কথকঠাকুরের কণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে।

দুর্গা বলে, এহন ত কিছু করনই যাইব না। কাল অশুজ (অশৌচ) না গেলে—

মেয়ের বিয়ে কাল অশৌচের মধ্যেও হতে পারে, মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বাধা দেয় রামকান্ত।

না ঠাকুরমশায়, হ্যা আমি করুম না। এমনেই ত বালো নাই তাতে আবার চৌদ্দ পুরুষের মরি কুড়ামু কোন ভস্তায় (ভরসায়)।

রামকান্ত যতখানি এগিয়েছিল ঠিক ততোখানিই পেছুবার চেষ্টা করে, না—

তা এই বলছিলেম কি তোমার যখন মত নেই তখন অশৌচ মিটে গেলেই করো। কিন্তু তারও আর বেশী দেরি কোথায়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আশীব্বাদ করেন তাই য্যান যায়। এহন ত কোন দিক দিয়াই সম্ভব না। পাট উঠলেই না কতা।

রামকান্ত আবার একটু উৎসাহিত হয়। জোরে একটা সুখটান দিয়ে উত্তর করে, তা তুমি যদি মত করো তা হলে টাকার জন্য কিছু আটকাবে না। ও দু'শই বলো আর পাঁচশই বলো কুমার বাহাদুরকে যা বলবো তাই হবে।

টেকা ছাড়াও মস্কিল আচে। নিশির বাপেরে ত জানেন, অগুজ না গেলে হ্যায়-ই কি রাজী অইব?

রামকান্ত বলে, বল তো একবার বলে দেখতে পারি।

না না, গুরুদশার বছরে আমি আর শুব কাম করবার চাই না। আশীব্বাদ করেন, বছরডা বালোভাবে ঘুরুক।

তবে থাক। এখন উঠি তাহলে। গলার স্বরটা বেশ একটু শুষ্ক মনে হয় রামকান্তর।

দুর্গা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। আঁচল গলায় জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে রামকান্তকে।

সুযোগের অবহেলা করে না রামকান্ত। পিঠের ওপর হাত রেখেই আশীর্বাদ করে। দুরাশার ঝড় বইতে থাকে বুকের ভেতরে।

॥ ২১ ॥

চরফুটনগরের সমৃদ্ধি যেন দিন দিন ফেঁপে উঠছে। মাত্র দিন কয়েকের কথা—এরই মধ্যে নতুনের ছোপ পড়েছে চরে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে লকলক করছে সবুজ পাটের চারাগুলি। এক এক গাছা-স্বর্ণ-ছিলকারই প্রতীক ওরা। চরের চাষীর তো পোয়াবারো। খড়ের চালার পরিবর্তে ঢেউ-টিনের ঘর উঠছে সার সার। আর দিনকতক পরে হয়তো ওরাই হবে আসল জমিদার। গাড়লগুলি আছে শুধু নিজের কোলে ঝোল টানতে। একটু যদি বুদ্ধি থাকে। সামান্য হয়তো দু'পাঁচ টাকা পকেটে পুরে গোটা চরটাকে বিলিয়ে দিয়েছে। আর ওদেরই বা দোষ কি। সিন্দুক খোলা পেলে কে না চুরি করে। এদিক-টায় যে নজরই দেওয়া হয়নি। আরো বছর খানেক না এলে তো সবই উজাড়

করে দিতো দীনু বৈরাগী আর করিম ফকিরের কাছে। পশ্চিম অঞ্চলের মতো যদি গোটা চরটা বিলি থাকতো তাহলে এক চর থেকেই লাট-কিস্তির অর্ধেক উঠে আসতো। হতভাগারা যার খায় যার পরে তারই সর্বনাশ করলে।... রাখাল আর বিকাশের ওপর ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু মুশকিল, প্রকাশ্যে কাকেও কিছু বলার উপায় নেই। সেরেস্তার অলি-গলি ওদের হাতের মুঠোয়। এখন কিছু করতে হলে দুটোকে হাতে রেখেই করতে হবে।...গড়গড়া টানতে টানতে ইতস্ততঃ ভাবছিলেন রমেন্দ্রনারায়ণ, রামকান্ত প্রবেশ করে। প্রভুকে চিন্তান্বিত দেখে প্রণাম ঠুকে নীরবেই অপেক্ষা করতে থাকে। রমেন্দ্রনারায়ণ প্রথমটা খাঁজিয়ে উঠতেই যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ রাম-কান্তর মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার বীজ আবিষ্কার করে ফেলেন। চরকে পাকে পাকে বাঁধতে হলে রামকান্তর সহায়তা একান্তভাবেই প্রয়োজন। এরকম চাটুকার হাতে থাকলে সবকিছুই গুছিয়ে ওঠা সম্ভবপর। তাই গড়-গড়ার নলটা হাতের মুঠোয় রেখে উদাত্ত কণ্ঠেই সম্ভাষণ জানান, আরে এসো— এসো ভটচায্। দাঁড়িয়ে কেন, বসো।

শংকায় হাঁপিয়ে উঠেছিল রামকান্ত—সম্ভাষণে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। দুর্গাকে নিশ্চিন্ত থাকতেই আশ্বাস দিয়ে এসেছে। ভাগ্য আজ সুপ্রসন্নই। কুমার বাহাদুর বেশ খোশ মেজাজেই আছেন। সব চেয়ে নিরাপদ, উনি নিজের ঘরটিতে একলা আছেন। সেরেস্তায় থাকলে কান ভাঙানি দেবার লোকের অভাব ছিল না। তাছাড়া অপমান করলেও লোক জানাজানি হয়ে যেতো। সব দিক থেকেই নিরাপদ কাছারির এই স্বকীয় ঘরটি। নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা কারো হুকুম না নিয়ে প্রবেশ করার উপায় নেই। বেটা মুসা সিং দোরে ছিল না বলেই ঢুকতে পেরেছি। অর্ধচন্দ্র না দিলেও খেঁকিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু বরাত জোরে আজ-অভ্যর্থনাই পাচ্ছি। তা করতেই হবে বাবা, বেরোবার মুখে যে শেয়াল বাঁ-হাত করে বেরিয়েছি। খুশীতে গদগদ হয়েই মুখোমুখি চেয়ারটায় বসে রামকান্ত। চেয়ার ছাড়া এঘরে ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা নেই। এখানে যারা আসে তারা পদমর্যাদা নিয়েই আসে। অন্যদিন ভয় ভয় করলেও আজ আর ভয় হয় না রামকান্তর। উল্লসিতভাবেই জিজ্ঞেস করে, দেশ গাঁয়ের খবর সব ভালো তো স্যার?

রমেন্দ্রনারায়ণ হাসতে হাসতেই উত্তর দেন, আমাদের আর ভালো কোথায় হে ভটচায, পোয়াবারো তো এখন তোমাদেরই।

কি যে বলেন স্যার!

কেন, খারাপ কিছু বলছি নাকি? খাসা এক একটি শিষ্য তোমার। নৈবেদ্যের চিনির মতো ওদের মাথার ওপর নিশ্চিন্তে বসে আছ। তোমার মতো সুখী আবার কে হে?...কথা শেষ করে হাসতে হাসতেই নলটা আবার মুখে পোরেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

ফিকে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘরময়-ছড়াতে থাকে। মনোহারী গন্ধে জিভে জল আসে রামকান্তর। এমন আমেজী নেশা কতকাল ভাগ্যে জোটেনি। কোলকাতার জীবনে নিজস্ব একটা মোরদাবাদী গড়গড়া ছিল ওর। অন্য সময় ফুরসত না হলেও শোবার আগে বেশ খানিকটা মৌতাত হতো। গয়া, বিষ্ণুপুর, আনারপুর যেদিন যে জায়গার জিনিষে অভিরুচি। এখন তো অতীতের জাবর কাটা ছাড়া আর কিছুই নেই।...অতিকষ্টে রসনার রাশ টেনে জবাব দেয় রামকান্ত, সুখ তো কত! ধেইধেই করে নাচো আর হরি-মটর খাও।

বল কি হে, শুধু হরি-মটর! আর কিছুই না? শুনেছি তো—না থাক। হরে, ভটচাযকে তামাক দে। রমেন্দ্রনারায়ণ কি যেন একটা ইঙ্গিত করতে গিয়েও চেপে যান। প্রকাশ্যে শুধু রামকান্তর তামাক লোলুপতারই ফয়সালা করেন।

তামাক দানের আদেশ হওয়ায় মনে মনে উৎফুল্ল হয় রামকান্ত। কুমার বাহাদুর তাহলে মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু ওটা কি বলতে চাইলেন! দুর্গার সম্বন্ধেই কি কিছু ইঙ্গিত করলেন! তবে তো দেখছি অনেক খবরই রাখেন।...না না, তা কি করে হতে পারে! যে কথা চরের কেউ জানে না সে কথা কুমার বাহাদুর কি করে জানবেন? ওটা ওঁর স্বাভাবিক হাসি ঠাট্টা। ক্ষণেকের দুশ্চিন্তা বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে যায়। তামাকের প্রত্যাশায় বেশ চাঙ্গা হয়েই ওঠে রামকান্ত।

যথাসময়ে হরি এসে বেশ বড় কল্কের এক কল্কে তামাক দিয়ে যায়। হুঁকোটা অবশ্য গড়গড়া নয়—নারকেলের। তা হোক, রামকান্তর ওতে কিছু এসে যায় না। আসল মাল তো ঠিক আছে। খাঁটি বিষ্ণুপুরীই হবে—খাসা গন্ধ। মনের আনন্দে হুঁকো টানতে থাকে রামকান্ত।

রমেন্দ্রনারায়ণ কথার মোড় ঘোরান, কিছু বলবে নাকি হে ভটচায?

রামকান্তর উত্তরের আগেই হরি এসে জানায়, দু'জন আমিন কাছারি ঘরে অপেক্ষা করছে হুজুর।

রমেন্দ্রনারায়ণ ওদের এঘরে পাঠিয়ে দিতেই আদেশ করেন। হরি ফিরেই যাচ্ছিল। আবার বাধা দেন, না থাক, ওদের বসতে বল, আমিই যাচ্ছি।

রামকান্তর মনের আনন্দ উবে যায়। বিষ্ণুপুরীতেও যেন আর আমেজ নেই। দিব্যি নিরিবিলিতে পাওয়া গিয়েছিল কুমার বাহাদুরকে। আর কিছুটা সময় পেলেই আসল কাজ হাসিল হয়ে যেতো। যা সুন্দর পরিবেশ ছিল কিছুতেই না বলতে পারতেন না। এখন আবার কে এসে মেজাজ বিগড়িয়ে দেয় তার ঠিক কি? বেশ জোরে জোরে হুঁকো টানছিল, গতি ক্রমশঃ ঢিলে হয়ে আসে।

রমেন্দ্রনারায়ণ নলটা মুখ থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, চলো হে ভটচায, কাছারিতে বসেই তোমার কথা শোনা যাবে'খন।

অগত্যা রামকান্তকেও উঠতে হয়। দুশ্চিন্তার গুরুভার ললাটের বলিরেখায় ফুটে ওঠে।

রামকান্ত চুপচাপই কাছারির এক কোণে এসে বসে। রমেন্দ্রনারায়ণ আমিনদের সঙ্গে যথারীতি নিজের কাজ করে চলেন। রাখাল বিকাশও নিজ নিজ দায়িত্ব মতোই সাহায্য করে যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই আমিনদের কাজ শেষ হয়। পাওনা-গণ্ডার ষোল আনা বুঝে পেয়ে মনের খুশীতেই উঠে পড়ে দু'জনে। তা খাতির মন্দ হলো না। চা, বিস্কুট, মিষ্টি-মুখ যা হলো তাতে এবেলার মতো নিশ্চিন্ত। রমেন্দ্রনারায়ণও মহাখুশী। এত সহজে কাজ মিটবে আশা করেননি উনি। রামকান্ত বসে বসে কড়িকাঠ গুণছিল। ওকে চাঙ্গা করতেই হাঁক ছাড়েন, তুমি যেন কি বলছিলে ভটচায?

রামকান্ত নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করে। দশজনের সামনেই যে কুমার বাহাদুর পূর্বকথার জের টানবেন তা ও ধারণা করতে পারেনি। তাই আমতা আমতা করেই জবাব দিতে চেষ্টা করে, না—কথা আর কি—মানে—

একান্ত গোপনীয় কি?—মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে রমেন্দ্রনারায়ণ শুধোন।

শুষ্ক হাসি হেসেই রামকান্ত বলে, কি যে বলেন স্যার। নায়েবমশায় আর বিকাশবাবুর সামনে বলবো তাতে আবার গোপনীয়তার কি থাকতে পারে।

না, চলো ও ঘরেই যাই। আমার আবার 'ফাইলটা' দেখা হয়নি; অবস্থা বুঝে পরিবেশটা হাল্কা করে দেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত স্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। উঠতে গিয়ে রাখালের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়।

নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যগ দৃষ্টি হানছিল রাখাল। চোখোচোখি হতেই ভ্রূ কুঁচকিয়ে সেরেস্তার খাতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। অপমানে মগজের পোকাগুলি কিলবিল করে ওঠে। অবশ্য এসব ছোটখাটো মান অপমান চেপে যাওয়াই ওদের পদ-রীতি। পোকাগুলি এক লহমায় যেমন ঝংকার দিয়ে উঠেছিল এক লহমাতেই আবার তেমন শান্ত হয়। ঈষৎ হাসিই খেলে নিয় ওঠে। ও জানে, কুমার বাহাদুর যত ঢাকঢাক-গুড়গুড়ই করুন না, চরের কোন খবর ওর কাছে চাপা থাকবে না। চাষা-ভুষা মাত্রেই জানে, এ শর্মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু হবার নয়। উনি তো তুচ্ছ, স্বয়ং বৃটিশ সরকারেরও ক্ষমতা নেই ওদের অধিকারে হাত ছোঁয়ায়। এ বাবা তাকেয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়া টানা আর মদ মেয়েমানুষ নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করা নয়। রীতিমতো মগজের ব্যাপার।···রাখালের মনে মনে হাসিই পায়।

রাখাল আর বিকাশ কি ভাবলে সে তোয়াক্কা রমেন্দ্রনারায়ণ করেন না। পুলিশ আর লাঠি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সব ঠিক আছে। প্রজাই হও আর নায়েব গোমস্তাই হও গুঁতোর চোটে সব ঠিক। এতদিন দেখিনি—সিঁধ কেটেছো। এখন আর চালাকিটি চলছে না।···রাখাল বিকাশকে পরোয়া না করে রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় এসে নিজের ঘরে বসেন রমেন্দ্রনারায়ণ। রামকান্তকেই বাজিয়ে দেখবেন, কতদূর এগোনো যায়। সম্ভব হলে চুপি চুপি নিজেই এগিয়ে যাবেন। গাড়লদের যতদূর এড়িয়ে চলা যায় ততোই মঙ্গল। ওদের দৃষ্টি তো শকুনের দৃষ্টি। কেবল পকেট ভারী করবার তাল।····

মনিবের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অন্তরে ঘা লাগলেও বাহ্যিক সামলে নেয় রাখাল। কিন্তু মনের আগুন বেড়েই চলে। স্টেটের কি এমন ক্ষতি করেছে ওরা। চর তো এতদিন কাছিমের পিঠের মতো সামান্য একটা বালির ঢিপি ছিল। শীতে জাগতো বর্ষায় তলিয়ে যেতো। বুদ্ধি করে দীনু আর করিমকে বিলি-ব্যবস্থা দিয়েছিল বলেই না আজ শস্যশ্যামলা এক উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কই, কতবার তো ঘাটে পান্সী ভিড়িয়ে হৈ হল্লোড় করেছেন। কিন্তু কোনদিন তো কিছু করতে দেখিনি। বাড়া ভাতে কাটি দিতে সবাই পারে। দুটো পয়সাই না হয় খেয়েছি, কিন্তু ও চর গড়লে কে? মানুষ তো আর দৈবজ্ঞ নয় যে ভূত ভবিষ্যৎ সব জানবে। আর পয়সার কথাই যদি ওঠে

তাই বা এমন কি। একজন পক্কু মায়েব যদি বছরে তিন শ টাকা বেতন পায় তবে সে চুরি করবে না তো বসে বসে আঙুল চুষবে নাকি। তাছাড়া চুরিই বা একে বলবো কেন? এতো মগজ খাটিয়ে নেওয়া রীতিমতো পারশ্রমিক। নজরানা, সেলামী, প্রণামী নিয়ে ওরা কোন ধর্ম পুত্তুরের কাজ করেন?…রমেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্ত উঠে গেলে আপন মনেই গজরাতে থাকে রাখাল।

সহকর্মী বিকাশ পাশে বসেই খাতা লিখছিল। সেও নিজেকে অপমানিত বোধ করে। আসর ফাঁকা পেয়ে রাখালের উদ্দেশ্যে ফেটে পড়ে, তামাসাটা দেখলেন তো দাদা?

হুঁ, ব্যাপার বেশী সুবিধের ঠেকছে না। ভটচায দেখছি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ব্যস্ত। একটু কড়া নজর রেখো, হিসেবের খাতায় নজর রেখেই জবাব দেয় রাখাল।

অতো ভাবছেন কি। একটু সবুর করুন না, ও বোয়ালের ডিম বোয়ালেই ভাঙবে। কথায় বলে না, 'উই পোকার পাখা হয় মরিবার তরে।' মুচকি মুচকি হাসতে থাকে বিকাশ।

মারণ অস্ত্র আমার হাতেই আছে হে। তবে কি জানো—না না, যা ভাবছো ব্যাপার অতো সোজা নয়! দেখছো না, দুদিনেই কেমন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ভটচাযটা? আমার তো মনে হয়, নিগূঢ় কোন রহস্য আছে এর ভেতরে।…

ও যতো রহস্যই থাক, দাদার চোখে ধুলো দেবার সাধ্য কারো নেই।

হে হে হে, কি যে বলো, আমরা হলেম মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, তেনাগো সঙ্গে কি আমরা পারি।

চুপ করুন দাদা, হরে বেটা আসছে।

হুঁ, ও শালা তো আবার পিয়ারের চাকর। সব কথা ওর বাপের কাছে গিয়ে এক্ষুনি লাগাবে।

রাখাল বিকাশ মুখ বুজেই কাজে মন দেয়। হরি এসে আমিনদের এঁটো কাপ ডিস নিয়ে চলে যায়।

রামকান্তকে সঙ্গে করে পুনরায় আপিস ঘরে এসে বসবেই ঠিক ছিল। কিন্তু সামান্য এই পথটুকু আসতেই মত বদলে ফেলেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

আপিস ঘরে না বলে সোজা এসে শয়ন ঘরেই ঢোকেন। সমস্ত অন্তঃপুর খাঁ খাঁ করছে। একা হরি ছাড়া আর কেউ নেই। খাওয়া, থাকা, শোয়া, সবই তো গ্রীনবোটে। বাড়ির মেয়েরা কেউ কথনো এলেই এ ঘর-দোরে পা পড়ে। খেয়াল-খুশি হলে এককও কোন কোন সময় রাত কাটান। আসবাব পত্রের বিশেষ বাড়াবাড়ি নেই। খানকয়েক যা' আছে সবই আভিজাত্য পূর্ণ। ঘরে এসে একটা ডেক-চেয়ারেই গা এলিয়ে দেন রমেন্দ্রনারায়ণ। রামকান্ত থ বনে যায়। কি করতে চান কুমার বাহাদুর ওকে নিয়ে? শেষ পর্যন্ত কি অর্ধচন্দ্রই আছে নাকি অদৃষ্টে!···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল রামকান্ত। রমেন্দ্রনারায়ণ সম্ভাষণ জানান, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে, বসো?

রামকান্ত না বলতে পারে না। জড়সড় হয়ে একটা মোড়ার ওপর কোন রকমে বসে পড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়েন হরির উদ্দেশ্যে।

ডাক কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হরি ছুটে আসে। ইঙ্গিত মাত্র আলমারি খুলে পুরো একটা বোতলই বার করে। বিলেতী মদ। সুদৃশ্য লেবেল আঁটা—তকৃতক্ করছে রং। না, রামকান্ত হয়তো দম বন্ধ হয়েই মরবে আজ। পূর্বস্মৃতিই মনে পড়ে ওর। শহর জীবনে কতদিন আস্বাদন করেছে এ চীজ। কি অমৃতই না সাগরপারের মানুষ তৈরী করতে জানে। জিভে ঠেকাতেই দেহ মনে নেমে আসে সজীবতা। এই তো আসল দেব-ভোগ্য জিনিষ। এ ক'বছর চরে তো শুধু হরি-মটর চিবিয়েই কাটছে। ভাগ্য—ভাগ্য, মানুষ ভাগ্যের দাস।···জিভের জল সম্বরণ করা দায় হয়ে ওঠে রামকান্তর পক্ষে।

হিসেব মতো হরি দুটো গ্লাসই বার করে। স্বচ্ছ জাপানী কাঁচের গ্লাস। এই গ্লাসেই এ রকম সুধা মানায়। সোডার বোতলটা খুলতেই রমেন্দ্রনারায়ণ ইঙ্গিত করেন। হরি বেরিয়ে যায়। একটু সোডা মিশিয়ে প্রথম পাত্র টেনে নেন উনি। দিলটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। রামকান্তর ইচ্ছে হয় ছুটে পালায় এখান থেকে। রমেন্দ্রনারায়ণ সবই বোঝেন। বুঝেই স্বাগত জানান, কি হে ভটচায, চেয়ে চেয়ে দেখছো কি? চলবে নাকি দু'চার পাত্র?

দু'চার পাত্র—দু'চার পাত্র কেন গোটা বোতলটাই ওর দরকার। কিন্তু চরের বৈরাগীগুলোই যে মাঝ পথে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকালে খালি পেটে টানলে ধকল সামলানো দায় হয়ে উঠবে। তা'ছাড়া রাখাল গোসাঁইয়ের হাবভাবও সুবিধের ঠেকছে না। প্যাঁচ কষা মাথা, আড়ে-ঠারে কথাটা দীনু

বৈরাগীর কানে দিলেই সর্বনাশ। একদিন ফুর্তি করতে এসে দশ দিনের ভাত বন্ধ। চরে হয়তো আর থাকতেই দেবে না।...অন্তর্যামী মন লাফাতে থাকলেও বাহ্যিক তেমন উৎসাহ দেখাতে পারে না রামকান্ত।

ওকে নিরুত্তর দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ পূর্ব কথার জের টানেন, কি হে, সাড়া শব্দই দিচ্ছ না যে? নাও, টেনে নাও এক পাত্র, দ্বিতীয়বার নিজের গ্লাস পূর্ণ করতে গিয়ে দুটো গ্লাসই পূর্ণ করেন।

রামকান্ত দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, না, আমি ভাবছিলেম—সকাল বেলা—স্নান আহ্নিক কিছুই হয়নি—

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেন, তুমি আমায় হাসালে হে ভটচায। এ তো হলো মা কালীর নিত্য ভোগের সামগ্রী। ইচ্ছে হয় নিবেদন করে নাও।

না স্যার, এখন থাক।

বুঝেছি, বৈরাগীদের ভয়। তা কিছু ভেবো না। বাগান থেকে তুলে এনে গোটাকয়েক নেবুপাতা চিবিয়ে নিয়ো, কেউ টের পাবে না। নাও, আরম্ভ করো, রমেন্দ্রনারায়ণ দ্বিতীয় পাত্র টানতে থাকেন।

রামকান্তও আর ভাবতে পারে না। মায়ের নাম স্মরণ করে পুরো গ্লাসটাই এক দমে টেনে নেয়।

সাবাস, তুমি তো দেখছি পাকা খেলোয়াড় হে ভটচায। আবার পাত্র পরিপূর্ণ হয় আবার দু'জনে নিঃশেষ করে।

নেশায় দু'চোখ ঝিমিয়ে আসে রমেন্দ্রনারায়ণের। টেনে টেনেই বলতে থাকেন, এবার বলহে ভট্‌চায, কি তোমার বক্তব্য।

রামকান্ত এত সহজে কাবু হবার নয়। তাছাড়া ওর অভ্যাস, নেশা হলে ধ্যানগম্ভীর হয়ে বসে থাকা। একটা উদ্‌গার তুলে সবিনয়েই জবাব দেয়, বক্তব্য আর কি স্যার মধু মণ্ডলের বেটার বউ আপনার কাছে আরো কিছু ঋণ চায়।

আরে ছো ছো, তোমার তো হে রসবোধ নেই ভটচায! আর একটু হলে গোলাপী নেশাটাই মাটি করেছিলে। ও সব চাষাভুষোর মুখে ঝাঁটা মারো, ভাল কোন মালের সন্ধান থাকে তো বলো—রমেন্দ্রনারায়ণ ঝংকার দিয়ে ওঠেন।

উত্তর শুনে রামকান্ত নেশার মুখেও আঁৎকে ওঠে। রক্ষা দুর্গাকে নিয়ে

টানাটানি করছেন না। তা হলেই তো হয়েছিল আর কি। কাজ নেই বেশী খাঁটিয়ে। দুর্গাকে সোজা গিয়ে বলা যাবে, এত কম টাকা দিতে কুমার বাহাদুর রাজী নন। বেশী নাও তো ব্যবস্থা হতে পারে। টাকা ধার পেতে ওর কোন অসুবিধা হবে না। দীনুকে বললেই সে নিতাই সা'র কাছ থেকে নিয়ে দিতে পারবে। হয়তো এতে ও কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে। তা হোক, কুমার বাহাদুরের পাল্লায় পড়লে তো ঠিকেই ভুল হয়ে যাবে। না না, দুর্গকে কিছুতেই কুমার বাহাদুরের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো যায় না। আমারই আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি সম্ভব হয় নিজেই চেষ্টা করবো। মাত্র তো শ'তিনেক টাকা। যেভাবে খাতির করছেন দিলে দিতেও পারেন···পর পর পাত্র টানতে টানতে ভাবতে থাকে রামকান্ত।

পাত্রের পর পাত্রে দু'জনেই বুঁদ। রামকান্তর শক্তি নেই উঠে বাড়ি যায়। রমেন্দ্রনারায়ণও নাওয়া খাওয়া ভুলে যান। চাট হিসেবে সামান্য যা ভাজা-ভুজিই পেটে পড়েছে। বিকেলে চারটে নাগাদ ঘোর কাটে। সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করতে থাকে। এখন দরকার স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে গ্রীনবোটে হাওয়া খাওয়া। হরি বাড়ির ভেতরেই স্নানের জল দেয়। একে একে দু'জনেই বালতির পর বালতি জল ঢেলে কিছুটা সুস্থ হয়।

গ্রীষ্মের মেঘমুক্ত আকাশ। সূর্য ডুবুডুবু। আবীর মাখামাখি দিগ্বলয়। মিষ্টি আমেজ বাতাসে। নতুন জলে একটু একটু করে ফেঁপে উঠছে বংশী ধলেশ্বরী। স্রোতের বেগে সাড়া জাগছে। রামকান্তকে সঙ্গে করে গ্রীনবোটে এসে ওঠেন রমেন্দ্রনারায়ণ। চিরাচরিত অভ্যাস মতো ছাদের ওপর এসেই বসেন ডেক চেয়ারে। লেজুড়টির মতো রামকান্তও একটি মোড়ার ওপর। মাঝিরা দাঁড় টেনে খানিক উজাতে থাকে। তারপর পাড়ি দিয়ে এসে নোঙর ফেলে বৈরাগীর-খালের মুখে। রামকান্তর ইচ্ছে নয় এভাবে এখানে অপেক্ষা করে। বেশ তো চলছিল মাঝ দরিয়া দিয়ে। ঘুরে ফিরে হাওয়া খাওয়াতেই তো আনন্দ। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণের ঐ এক ঝোঁক, বেড়াতে বেরোলেই খালের মুখে এসে দাঁড়াবেন। এ সময়ে চরের ঝি বউরা সান্ধ্য জল নিতে ঘাটে আসে। কে জানে, ময়না না এসে দুর্গাও আসতে পারে। কিন্তু করবে কি ও। কুমার বাহাদুরকে তো আর জোর দিয়ে কিছু বলার উপায় নেই। এখন ভালয় ভালয় সন্ধ্যাটা উত্রোলেই ভাল। ভাগবত পাঠে যাওয়া আজ তো হতেই পারে না। সারা দিন ভাত খাওয়া হয়নি। অবসাদে ঢুল আসছে। এখন

চাঙ্গা হতে হলে চাই কিছু ভাল খাবার ও সঙ্গে আবার দু'চার পাত্র। তা বোটের হেঁশেল থেকে তো বেশ মিষ্টি গন্ধই ভেসে আসছে। অনুপানের ত্রুটি হবে না নিশ্চয়। খানদানী মানুষ, এটুকু জানবেন বই কি।....পাশে বসে রামকান্ত আপন মনেই ইতস্ততঃ ভাবছিল। হঠাৎ ঘাটের দিকে চোখ পড়ে। ও কে! দুর্গা না! এ সময়ে ও কেন জল নিতে এসেছে! সারাদিন এত জল দিয়ে কি হয় ওদের? শুধু তো তিনটে প্রাণীর সংসার। এ সময়ে ঘাটে না এলেই কি নয়! না না, আজ তো সোমবার, বাবার উপোস। অন্যের জলে ব্রত হবে না। কিন্তু ঘাট যে একেবারে ফাঁকা। আর একটু বেলাবেলি এলে কি দোষ ছিল, রামকান্ত বড় অস্বস্তিতে পড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এতক্ষণ নীরবেই বসে বসে গড়গড়া টানছিলেন, সহসা মুখ খোলেন। রামকান্তকে লক্ষ্য করেই শুধোন, মালটি কে হে ভটচায?

দুর্গা পেতলের কলসীটা চকচকে করে মেজে বুক-জলে এসে নামে। খালের মুখ কিছুটা দূরে হলেও ঘাট থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। লজ্জায় তাই বোটের দিকে পেছন ফিরেই গলা পর্যন্ত ডুবে কাপড় কাচতে থাকে। গোধূলির আবীর রাগে ওর গৌরবর্ণ বাহু যুগল দেখে মনে হয় দুটো রাজহংসীই যেন অবিরত ডুবছে আর উঠছে। কাপড় কাচা হয়ে যায়। এরপর মাত্র একটা ডুব। ভিজে কাপড় সর্বাঙ্গে জড়িয়ে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে উঠতে যায়। রামকান্তর নজর এড়ায় না। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে। মনোমোহিনীই যেন রূপ-সায়র থেকে নেয়ে উঠলো। রমেন্দ্র নারায়ণের প্রশ্নের কোন জবাবই দিতে পারে না। কাছে থেকেও যেন শুনতে পায় নি কি উনি জিজ্ঞেস করেছেন।

রামকান্তকে নিরুত্তর দেখে পাশ ফিরে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন রমেন্দ্রনারায়ণ, মূর্ছা গেলে নাকি হে ভটচায?

আজ্ঞে না, আমি সূর্যাস্ত দেখছিলেম। কি অপূর্ব রং বৈচিত্র্য, হকচকিয়ে উঠে উত্তর করে রামকান্ত।

সূর্যাস্ত দেখছিলে না সূর্যমুখীকে?—পাল্টা প্রশ্ন করেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

কি যে বলেন স্যার!—রামকান্তর মুখে শুষ্ক হাসি।

না, আপাতত বিশেষ কিছু বলছিনে। শুধু জানতে চাই—স্নান করে যাচ্ছে ও মালটি কে?

রামকান্তর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। স্ত্রী জাতির সম্ভ্রম রেখে কথা বলতে

জানে না লম্পটটা।...কিন্তু উপায় নেই। রাখাল গোসাঁই-ই হাত পা বেঁধে ফেলেছে। টাকার জন্ত এখন তো বেশ কড়া তাগাদাই শুরু করেছে গোসাঁই। কুমার বাহাদুর ছাড়া আর আশা কোথায়। যত অপমানেরই হোক ওঁর মন যুগিয়েই চলতে হবে।...অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবিনয়েই উত্তর দেয় রামকান্ত, ওর কথাই তো বলছিলেম স্যার। মধু মণ্ডলের বেটার বউ। কিছু কর্জ চায়।

তাই নাকি হে! তোমার তো দেখছি পোয়াবারো, মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে যেন জল বিচুটির চাবুক পড়ে। তবু শুষ্ক হাসি হেসেই সমতা রক্ষা করে, কি যে বলেন স্যার। খুব ভাল মেয়ে ও।

খুব ভাল না হলে কি আর তুমি ওর ভালর জন্য এত আঁকুপাঁকু করছো! যা'হোক, কত টাকা চাই ওর, আমি দেবো।

টাকা তো চাই তিন শ' এখন আপনি যা দয়া করে দেন।

তিন শ! বড্ডো বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?

কিন্তু ওর কমে যে পাট চাষ উঠবে না স্যার।

বেশ, দেবো টাকা। কাল ওকে বোটে আসতে বলো।

বোটে আসা কি ওর পক্ষে উচিত হবে স্যার?

তোমার তো দেখছি গভীর নীতিজ্ঞান হে ভটচায। বেশ, তাহলে না আসবে।

যদি বিশ্বাস করেন তাহলে একটা কথা বলতে চাই স্যার।

বেশ বলো।

টাঁকাটা আমার হাতে দেবেন, আমি ওকে দিয়ে আসবো।

কৌশলে কাজ সারতে চাও তো?

আপনার চোখে ধুলো দেবার স্পর্ধা আমার নেই স্যার। তমস্থকে আমি ঠিকই সই করিয়ে আনবো।

শুধু সই, আর কিছুই না? ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসতে থাকেন রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তর সর্বাঙ্গে আবার জালা ধরে। মনে মনেই ভাবতে থাকে, তুমি যা ভাবছো শয়তান ও সে ধরনের মেয়ে নয়। দুর্গার রূপ দেখছো, কিন্তু হাতের খাঁড়া দেখোনি! মরবে—ছটফট করেই মরবে।...প্রকাশ্যে বলে, দুখিনী নারী, আপনাকে আর কি দিতে পারে?—বুঝেও যেন বোঝে না রামকান্ত।

তুমি দেখছি এখানেও ভাগবত আওড়াতে শুরু করলে হে। যাক, টাকা যখন দিচ্ছি—তখন সুদ উসুলের ভার আমার ওপরেই থাক। কাল সকালে কাছারিতে এসো—ব্যবস্থা করে দেবো।

কাছারিতে—

ভয় নেই, আপিস ঘরে বসেই সব ঠিক করে দেবো। কেউ টের পাবে না।

জানি হুজুরের দয়ার শরীর। বেচারা বেঁচে যাবে স্যার। বড্ডো ঠেকায় পড়েছে। এখন তাহলে উঠি ?

বলো কি হে, খাবে না ? ভাল খাবার আছে কিন্তু।

না স্যার, শরীরটা বড্ডো খারাপ লাগছে। তাছাড়া জানেনই তো ভাগবতের আসরেও একবার না গেলে নয়।

ভাগবতের আসরে না ভগবতীর আসরে হে ?

আপনি বড্ডো লজ্জা দিতে পারেন স্যার।

বলো কি হে, এখনো দেহে লজ্জা আছে ! তা বেশ, এসো তাহলে।

রামকান্ত হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মদের আর এখন ওর কোন প্রয়োজন নেই। মদের চেয়ে সেরা নেশা এইমাত্র কুমার বাহাদুর ওকে দিলেন। দুর্গাকে আজই গিয়ে খবরটা দিতে হবে। কাল সকালেই তো হাতে টাকা আসছে। কসাই নায়েবটার হাত থেকেও কালই মুক্তি মিলবে। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করা। ময়নার বিয়েটা চুকে গেলেই একেবারে নিশ্চিন্ত। কুমার বাহাদুরকে এ কটা দিন চাটুবাক্যে ভুলিয়ে রাখতে হবে। তারপর দুর্গা যদি সায় দেয় ছেড়ে চলে যাবো এ চর।···ভাবতে ভাবতেই উঠে দাঁড়ায় রামকান্ত। হাত বাড়িয়ে চরণ ধুলো মাথায় নেয় রমেন্দ্রনারায়ণের। তারপর খুশীতে পা চালিয়ে দেয় মণ্ডল বাড়ির দিকে।

রমেন্দ্রনারায়ণের মনেও খুশীর বান ডাকে। একাকীই চরের দিকে চেয়ে চেয়ে শিস্ দিতে থাকেন।

॥ ২২ ॥

পাঁচই আষাঢ় রথযাত্রা। বাছ-পাট চরকুটনগর ও চরখল্লার চাষীরা মন্দ পায়নি। রথযাত্রায় শুভ সাইদ হবে। প্রত্যেকেই অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত কেউ একগাছা পাটও বেচেনি। মাসের প্রথম দিকেই যখন শুভক্ষণ মিলছে

তখন আর অদিনে-অক্ষণে বেচে বরাত খারাপ করবে কেন। পাটের সেরা শুভক্ষণ রথের সাইদ। এ সময় কেউ কাউকে ঠকায় না। ফড়েরাও মাপ-জোখ ঠিক রাখে। শুভক্ষণে ধারের কথা তো কেউ মুখেই আনবে না। অনেক দায় দায়িত্ব গেছে তবু রথযাত্রার আগে কেউ পাটে হাত দেয়নি। বেশ ভাল ফলন হয়েছে এবার। বাছ পাটই রং, পদ, লম্বায় প্রায় গাছ পাটের সমান দেখাচ্ছে। চাহিদা থাকলে গত সনের তুলনায় এ সন অনেক বেশী দর পাওয়া যাবে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এত ভাল ফসল এ অঞ্চলে ফলেনি। ঈশ্বর করলে রক্তচোষারা আর সুযোগ পাবে না। এই ওদের শেষ কামড়। টাকা প্রতি মাস দু'আনা তিন আনা সুদ। কসাই ছাড়া ওদের আর কি বলা যায়। নিক, ওদের ঘাটের কড়ি এই শেষবারের মতো উপায় করে নিক। চরের মানুষ আর সামনের সন থেকে ওদের দোরে হাত পাততে যাবে না। ওদের টাকা ওদের ঘরেই ছাতা ধরবে।...আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে চরের চাষী। পলানের গস্তি দুটো অনেকদিন থেকে অকেজো হয়ে ঘাটে পচছে। রথে পাট বয়ে নেবার ও দুটোই হলো সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। একটাতে যাবে পাট আর একটাতে চরের সব মানুষ। হাতাহাতি ধুয়ে পুঁছে গাব দিয়ে সকলে মিলে আবার সচল করে তোলে গস্তি দুটোকে। কে কত মণ পাট নেবে তার ফর্দ হয়। হাজার মনী গস্তি। বাছ পাট আর এত কোত্থেকে হবে। বড় জোর দু'শ আড়াইশ মণ। প্রয়োজন হলে পাটের নৌকায়ও জনকয়েক যেতে হবে! সকলে মিলে একত্র যাবে। একসঙ্গে আনন্দ উৎসব করবে।...চরময় নূতন করে সাড়া জাগে।

বাছ পাট দুর্গাও মন্দ পায়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবেচিন্তে রমেন্দ্র-নারায়ণের কাছ থেকে দু'শর পরিবর্তে মাত্র দেড় শ টাকা কর্জ করেছে ও। রামকান্তর কাছে সত্যি ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সুদ খুবই কম। টাকা প্রতি মাসিক মাত্র এক আনা। বাছ পাট বেচে নিঃসন্দেহে চাষের অন্যান্য খরচা মেটাতে পারবে। তারপর আসল পাট বেচে এককালীন সমস্ত শোধ করা যাবে। ঠাকুর করলে তা খুব পারবে।

এখন আর আশংকার কিছু নেই। রামকান্তর আলাপ-আচরণও দিন দিন বেশ ভদ্র হয়ে উঠছে। এক দিন ওঁকে ভুল বোঝাই হয়েছিল। নিয়মিত ভাগবত পড়া মানুষ ওঁর কেন মতিভ্রম হবে! তবে মুশকিল হয়েছে কুমার বাহাদুরকে নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে এসে খালের মুখে বোট বাঁধেন। ছাদের ওপর

ডেক চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চেয়ে থাকেন। বউ-ঝিরা সকলেই এ নিয়ে কানাকানি করছে। মোড়লদের মধ্যেও কথাটা উঠেছে। কে জানে, কি থেকে কি হয়। চরে তো একমাত্র আমিই ওর টাকা নিয়েছি। কিছু হলে আমারই দোষ পড়বে। বেশ ছিল, এতদিন ময়নাই বিকেলের জল ভরতে আসতো। কিন্তু মেয়েটারও যেন কি হয়েছে, এখন আর কিছুতেই বিকেলে ঘাটে আসতে চায় না। ক্ষেন্তিই নানা কথা উঠিয়ে লজ্জায় ফেলেছে ওকে। তা নিশিকে দেখে একটু হাসলে কিংবা দুটো কথা বললে কি এসে যায়। কই আর তো কেউ কিছু বলে না। ঐ নচ্ছারটাই যত গোলমালের মাঝকাটি.... ভাবতে ভাবতে কলসী কাঁখে ঘাট থেকে উঠতে যায় দুর্গা। মুখ তুলতেই রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়। বড় অস্বস্তি বোধ হয় ওর।

চৌঠো আষাঢ় সন্ধ্যায় পাট বোঝাই শেষ হয়। যে যার মাল নিজের হাতে সাজিয়ে গুছিয়ে দেয়। একখানা গস্তির অর্ধেকটাই ভরে না। ঠিক হয়, পাটের গস্তির পেছনেই দয়াল চানের আসর বসবে। মাদুর, একতারা, পান, তামাক ঠিক মতোই ওঠে। করিম, পলান, দীনু এরাই যাবে গস্তিতে। কারো কোন চ্যাংড়ার ঠাঁই হবে না ওখানে। ওরা সকলে যাবে আর একখানা গস্তিতে। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রথমে লোক যা যাবার কথা ছিল এখন তার চেয়ে দেড়া লোক যাবার জন্য বায়না ধরেছে। চরধল্লার ঘাটেই দ্বিতীয় গস্তি-খানা বোঝাই হয়ে যায়। ছেলেপুলে আর মেয়েদের তো জায়গা একটু বেশী চাই-ই। তাছাড়া এতো আর মালামাল নয় যে একটার ওপর আর একটা চাপবে। বৃষ্টি না থাকলে অবশ্য ছৈয়ের ওপরও জনকয়েক যেতে পারবে। কিন্তু সে তো শুধু পুরুষদের পক্ষেই সম্ভব। ছেলেপুলে মেয়েদের জন্য আর একখানা নৌকো না হলেই নয়। খাওয়া-দাওয়ার জিনিষও বড় একটা কম যাবে না। আজ মাঝ রাত্রে নৌকো ছাড়বে, পরের দিন সমস্ত দিন-রাতই নোকোতে থাকতে হবে। এই সুদীর্ঘ সময় এতগুলো লোক শুধু মুড়ি, চিঁড়ে খেয়ে থাকতে পারে না। রান্না খাওয়ার যোগাড়ও রাখতে হবে। রথ দেখা আর কলা বেচাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আনন্দ উৎসবটাও বড় কম হবে না। এতদিন সকলে প্রাণপণে ক্ষেতে খেটেছে। কিছুদিন পর আবার খাটুনী আসছে। মাঝখানের এই কয়েকটা দিন একটু জিরিয়ে নেয়া। পাট কাটা, জাগ দেয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো এ সব কিছুতেই হাড়ভাঙা খাটুনী। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদ

ভাল করেই করতে হবে। ঠিক হয়, বিপিন মণ্ডলের বড় ঘাষী নৌকোখানাও সঙ্গে যাবে। একশো-হাতি ঘাষী—রথের কেরায়া মোটাই পেতো বিপিন। কিন্তু টাকার চেয়ে চরের মানুষের সুখ সুবিধার দিকে আগে নজর রাখতে হবে। দু'চার জন গিয়ে বিপিনকে ধরতেই সে রাজী হয়ে যায়। সারা বছরই তো নাও বাওয়া আছে। হোক মোটা কেরায়া, ও ছুটিই নেবে। সকলের সঙ্গে রথের পার্বণেই মাতে বিপিন। ওর নৌকোয় খোল, করতাল ওঠে। কীর্তনের আসর বসবে। সমবয়সী জোয়ান জোয়ান ছেলেরাই থাকবে এ নৌকোয়। এ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হলো। বুড়োরা পাটের গস্তিতে, ছেলেপুলে মেয়েরা আর একখানা গস্তিতে। রান্না খাওয়ার যোগান ওরাই দেবে। ভাঁড়ারও থাকবে ওদেরই জিম্মায়। ঘাষীতে চলবে শুধু কীর্তন আর ছৈয়ের ওপর ইয়ার-বন্ধুদের সখ আহ্লাদ।

রাত আনুমানিক একটা। জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। ধামরাইর রথ ভারত বিখ্যাত। চর থেকে জলপথে মাইল সাতেকের পথ মাত্র। কিন্তু বংশীর স্রোত এত তীব্র বাতাসের জোর না থাকলে ভোর ভোর পৌঁছানো মুশকিলই হবে। দু' ঘুন্টি বাদাম উড়ছে গস্তিতে তবু যেন স্রোতের মুখে উজাতে পারছে না। এ ভাবে গেলে বেশ বেলা হয়ে যাবে। পাটের শুভক্ষণ সকালের বাজারেই ভাল। কিন্তু করার কিছু নেই। এত স্রোতে দাঁড় টেনেও কোন লাভ নেই। বাতাস চড়লেই একমাত্র ভরসা। ঘন ঘন জয়ধ্বনি পড়ে, জয় দয়াল চান—জয় মাধবজী। মেয়েরা উলুধ্বনি দেয়।

বর্ষায় বংশীর বিরাট বক্ষ কেঁপে উঠেছে। দুপুর রাত্রে মাদল বাজনার মতোই শোনাচ্ছে স্রোতের গর্জন। রথের পণ্য নিয়ে শত শত নৌকো উজাতে চেষ্টা করছে। আবার যাত্রীবাহী নৌকোও চলেছে কিছু কিছু। সারারাত নৌকোয় কাটিয়ে বেশ ভোরে গিয়েই মেলায় জমবে। যত বেলা বাড়বে ততোই ভিড় বাড়বে। ঘাটে হয়তো নৌকা বাঁধারই ঠাঁই মিলবে না। ভোরে ভোরে পৌঁছতে না পারলে অনেক অসুবিধা। হয়তো ক্রোশ খানেক পথ হেঁটেই যেতে হবে। বংশী ধলেশ্বরীর বিরাট বক্ষ দিন দশেক আগে থেকেই নৌকোয় নৌকোয় সরগরম।

পুরীর রথের ভিড় শুধু তীর্থ যাত্রীদের নিয়ে। কিন্তু ধামরাইর রথ ঠিক তা নয়। এখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আসে। বিরাট এক শিল্প-

বাণিজ্যের মেলাই বসে ধামরাইর রথে। হাজার হাজার মণ পাট, চন্দনী, ধনে বেচা-কেনা হয়। আবার সার্কাস, ম্যাজিক, পুতুলনাচ, রাধা-চক্কর এমন কি প্রকাশ্য জুয়ার ছকেরও অভাব নেই। শিল্প-বাণিজ্যের ধারাবাহী শ কয়েক রূপজীবিনী এসেও আঁচল বিছায়। নদীর চড়ায় ছোট ছোট হোগলার চালা ওঠে। এক-একটি ঘর এক-একটি বিলাসিনীর। রূপ হয়তো ওদের কোন কালেই কারো ছিল না। তবে প্রচুর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী দু'চার জনকে দেখা যায়। হয়তো স্বাস্থ্যের চেয়ে মেকী জেল্লাটাই প্রধান। দু' আনা চার আনায় লোক ঘর ঢুকছে। প্রকাশ্য দিবালোকেই ঢুকছে। একজন ঢোকে তো আর দশজন তাকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে। হয়তো মিনিট আট দশ পরে ঘেমে নেয়ে বেরোয় বেচারা—সঙ্গে সঙ্গে আবার একজন ঢোকে। সে বেরুতে না বেরুতে আবার একজন। এ যেন বাঘিনী ফাঁদ পেতে বসে আছে ছাগল ছানার মতো তার মুখের ভেতরে গিয়ে লাফিয়ে পড়া। সমাজ আছে, থানা পুলিশ আছে, তার চেয়েও বড় কথা জেলা-শাসক স্বয়ং উপস্থিত আছেন সদলবলে। কিন্তু তবু কারো কিছু করার নেই। বেশ মজার খেলাই চলে।

জুয়াড়িরা ছকে ছকে দু'আনা চার আনা এমনকি আধুলি টাকা পর্যন্ত হারছে। আবার দিশী ধান্যেশ্বরীর নেশায় পচা নর্দমায়ও গড়াগড়ি যাচ্ছে অনেকে। ঠাকুর মাধবজীউর অনন্ত লীলা। ভক্তদের লীলা খেলারও অন্ত নেই। প্রথম রথ থেকে ফিরতি রথ পর্যন্ত ধামরাই গ্রাম জমজমাট। মাদক বর্জন আর জুয়া বন্ধের জন্য একদল প্রচারেও নামেন। হয়তো গান্ধীজীর মন্ত্র শিষ্যই হবেন। প্রাণপণেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে চান। কিন্তু পারেন না। প্রথম হামলা হয় জমিদারের তরফ থেকে। তারপর পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানায় আবগারী ভেণ্ডাররা। ব্যবসা তাদের মাটি হচ্ছে। গান্ধী-বাদীরা পথরোধ করায় মানুষ স্বাভাবিক ফুর্তি করতে পারছে না। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন…দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলেন ইংরেজ কর্মচারী। অবশেষে অবরোধ কারীদের ওপর বেঠন চার্জ আরম্ভ হয়। এইতো চাচ্ছিল সে। মাদক বর্জন হবে মানে? মদ জুয়া মেয়েমানুষই যদি না রইলো তাহলে হাট বাজার জমবে কি দিয়ে? আর হাট বাজারই যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পণ্য আমদানী রপ্তানী হবে কোথায়? না না, ওসব চালাকি চলবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ইংরেজ এদেশে কলা চুষতে আসেনি।…সমানে দিন দুই ধরপাকড় চলে। দু'চার জায়গায় বেঠন

চার্জও করতে হয়। প্রয়োজন হলে রাইফেলও চলতো। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলন। প্রথম কিস্তিতেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। রথের মানুষ আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। গোঁফে রেখা দেয়নি এমন ছেলেকেও দিনে দুপুরে হোগলার ঘরে ঢুকতে দেখা যায়। মাথা পিছু দু'আনা দশ-পয়সা রেট। মিনিট কয়েকের ছায়াবাজী আর যান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড। একজন ঘাম মুছতে মুছতে বেরোয় তো আর একজন ঢোকে। তারপর আবার একজন। দিবা রাত্রির ঘুর্ণিচক্র। জগন্নাথের হাটে যে যার মতে ব্যস্ত। কারো কাউকে দেখবার অবকাশ নেই। গ্রামের জোয়ান মানুষগুলো অজ্ঞতা বশত কুৎসিত রোগ বীজ নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। শান্তির নীড় এদেরই অঙ্গস্পর্শে অশান্ত হয়ে উঠবে—সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে রোগ বীজ। কারো সন্তান অঙ্কুরেই বিকলাঙ্গ হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। কারো বা দৃষ্টি ক্ষমতাই পাবে লোপ। আবার কারো বা নিষ্পাপ স্বাস্থ্যবতী গৃহলক্ষ্মী রোগ জালায় আত্মহত্যা করবে—উন্মাদিনী সেজে পথে পথে ফিরবে। আজ যে মানুষ পাপ করলে আগামীকাল সেই মানুষই ছুটবে পেঁচোয়-পাওয়া সন্তানের জন্য ওঝা ডাকতে—রুগ্ন স্ত্রীর জন্য দেও-দস্যি জিনের পূজো দিতে। তাতে যখন ফল হবে না এবং ভাগ্যগুণে যদি কোন সৎপরামর্শ জোটে—তাহলে ছুটবে ডাক্তার বৈদ্যের কাছে। শোষকের করাত দু'দিকেই ধার।

দিশী হকিম বদ্যির সাধ্য নেই এ রোগ সারায়। অদ্ভুত রোগ অদ্ভুত তার দাওয়াই। যারা প্রেমদাতা তারাই মুক্তিদাতারূপে দেখা দেন। তাদেরই ছক কাটা পথ। কোটি কোটি টাকার ওষুধ আসে সাগর পার থেকে। গরল আসে বিনিময়ে জাহাজ ভর্তি অমৃত পাচার হয়ে যায়। জাতি দিন দিন পঙ্গু হতে থাকে। মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি নেই। দাঁত বার করে হাসতে থাকে শোষক।

পলানের গস্তি দু'খানা ও বিপিনের ঘাষীখানা ঠিক সময়ে এসেই ধামরাইর ঘাটে লাগে। আর কিছুটা বেলা হলে আর ঘাটে ঠাঁই পাওয়া যেতো না। হাজার হাজার নৌকো—লক্ষ লক্ষ যাত্রী। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। ছোট ছোট ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। ওদের বাড়ি থেকে দুর্গা, আনন্দ, ময়না তিনজনেই এসেছে। পাঁচ মণ বাছ পাট দিয়ে রথের সাইদ করবে ওরা। মোট দশ মণ উঠেছে। বাকী পাঁচ মণ দেখে শুনে গঞ্জের হাটে বেচবে।

চরের সমস্ত পাট মিলিয়ে শ'দেড়েক মণ হবে। একা পলানেরই পঞ্চাশ মণ। দীনু করিমেরও হবে মণ পঁচিশেক। বাকীটা আর আর সকলের। গস্তি ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফড়েরা এসে ছেঁকে ধরে। পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে চাষীর হাতে দেয়। যারা কাজ গুছাতে জানে তারা জনে জনে তোষামোদ না করে মাতব্বরকে হাত করতেই চেষ্টা করে। প্রথম কিস্তিতে সরাসরি বেচা-কেনার কথা না বলে রং-তামাসাতেই মন দেয়। মাতব্বরের ছেলেপুলে কাছে থাকলে ঝাঁ করে হয়তো তার হাতে চারটে পয়সাই গুঁজে দিলে। কাউকে বা কোলে নিয়ে চুমুই খেলে দু'গালে দুটো। একটা শেষ হলে আবার একটা বিড়ি দিলে মাতব্বরকে, নিজেও ধরালে একটা। তারপর আসে আসল কথায়। সওদা হলে অবশ্য এ সব খরচাই হিসেব ধরা হবে। ওজনে মারার সম্ভাবনাই বেশী। তাতে যদি একান্তই অসুবিধে হয় তাহতে তো হিসেব জুড়বার কৌশল আছেই। আট টাকা মণ সোয়া সেরের দাম হয় তিন আনা, আচ্ছা আপনাকে তেরো পয়সাই ধরে দিলাম ব্যাপারী সাব···নিজেরও সব দিক রক্ষা হয়, ব্যাপারী সাহেবও খুশীতে আটখানা। রসিক ফড়ের কাছে জয়নাল মাতব্বরের খাতিরই আলাদা। নিজের পাটতো রসিককে দেবেই জয়নাল উপরন্তু তার মৌজার সমস্ত পাটই পাবে রসিক। কাছে অন্য ফড়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন অঘটন ঘটবে না। রসিক কি দর দিলে টেরই পাবে না অন্য কেউ। প্রকাশ্য দর উঠতে উঠতে হয়তো এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যে আর কেউ এক পয়সাও উঠতে সাহস করে না। এমন কি রসিকও না। দু'পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে রসিক। মাতব্বরকে চোখ টেপে। তারপর তার ডান হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়ে চেটোর ওপর সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে জানায় আসল দর। কড়া ক্রান্তির হিসেব জুড়তে না পারলেও দর কত উঠছে তা সহজেই বুঝতে পারে জয়নাল। রসিক হয়তো লিখলে, দশ টাকা এক আনা। জয়নাল জানায় দু'আনা। অনেকক্ষণ ঝকাঝকির পর শেষ পর্যন্ত জয়নালের জিদই বজায় থাকে। দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করতে রসিকের আফসোস আর ধরে না, নিচ্ছি মাতবরের পো, কিন্তু বরাতে আজ লোকসানই আছে। দু'চারটে পয়সাও আপনি আর আমাদের খেতে দেবেন না। উত্তরে জয়নাল বলে, হ হ, বিনা লাবেই আপনারা কারবার করেন। হেই বান্দাই আপনারা।···

প্রত্যুত্তরে রসিক বলে, দশজনের কাছে লাভ করলেও আপনার কাছে এক পয়সাও লাভ হয় না। তবে আপনার হাতের সাইদ ভাল তাই যা···

কথায় কথায় হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে জয়নাল। রসিকের দাঁড়ির মিটার একবারের পরিবর্তে দু'বারই পাঁচ থেকে যায়। এক এক দাঁড়িতে .পাঁচ সের করে মাপ চলেছে। এক দাঁড়ি সটকাতে পারলেই লাভের লাভ তস্য লাভ এসে রসিকের তহবিলে জমা হবে। দরের চেয়ে দু'আনা কম দরে বেচলেও ক্ষতি নেই। ফড়ের কাছে শত-করা নিরানব্বই জন চাষীরই এই হাল। তা সে ওজনে হোক কিংবা হিসেব জুড়তে হোক।

দীনু করিম পলানও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। ফড়েদের বিড়িই টানছে। রসিক কম করেও বার তিনেক হাত টেনেছে। তবে তিন মোড়ল একসঙ্গে থাকায় তেমন কায়দা করতে পারছে না। রথের সাইদে ঠকাতে গিয়ে ধরা পড়লে কিল গুঁতো খাবার ভয় আছে। সর্বশেষ সোজাসুজি দর দিয়েই অপেক্ষায় থাকে রসিক। মাধবের দিব্যি ব্যাপারী সাবরা, এ দরে বেচলে যেন আমি পাই।...

এক ফাঁকে ডাঙায় নেমে বাজার দেখে আসে ওরা তিনজন। সেখানেও চেনাশুনো ফড়ের অভাব নেই। তাদের কাছ থেকেও মোহিনী বিড়ি খেতে হয়। তবে মাথা ঠিক করতে পারে না। দর তো দেখছি রসিকেরই সব চাইতে ভাল। কি হবে টানে পাট নামিয়ে ? ফড়ের সংখ্যা যতোই থাক অনেক বড় বড় কোম্পানীই খরিদে নামেনি। অন্য পর দূরের কথা—আসল ক্রেতা রেলি ব্রাদার্সেরই পাত্তা নেই।...লক্ষণ ভাল নয়, তিন মোড়ল বটতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সল্লা করে। না, রসিককে মাল বেচাই ভাল। অবশ্য সম্পূর্ণ টাকা যদি সে নগদ দিতে পারে। আজকের দিনে ধার কর্জ হবে না। টাকা হাতে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনেই ফুর্তি করবে। নয়তো আজকের দিনে কে যাবে ওদের সঙ্গে ঝামেলায়। মুখে তো কিছু আটকায় না ওদের। শেষ-বাজার যদি টান যায় তা হলে অবশ্য টাকা পেতে তেমন বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ঢিলে গেলে ধার দিয়েছ কি সর্বনাশ। হাজারো রকম বায়না ধরবে। কাঁটায় ওজন করতে গিয়ে অনেক ঘেঁটেছে, ভেতরে বেশ ভিজা ছিল, হেড-আপিস থেকে এখনো টাকা এসে পৌঁছোয়নি ইত্যাদি....না না, আজকের দিনে ওসব চলবে না। নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক।

নগদের জন্য জেদ ধরাতে গস্তির সমস্ত পাট কেনা রসিকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। তাছাড়া ভাবনারও কিছু আছে। হঠাৎ রেলি-ব্রাদার্সের লঞ্চ কেন এল না ? পূর্ণ পারসেজার আসরে নেমেও কেন হাত গুটিয়ে রইলেন ?...রসিক

আধাআধি খরিদ করেই ক্ষান্ত হয়। তিন মোড়ল যেভাবে শ্যেন দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে তাতে ওজন বৃদ্ধি হবার আদৌ সম্ভাবনা নেই। দীনুর উপস্থিতিতে হিসেব জুড়তেও কিছুমাত্র ফাউ রোজগার হলো না। এখন তো কপাল ঠোকা ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ালো।

রসিকের দেখাদেখি ছোটখাটো ফড়েরাও ঘাবড়ে যায়। তারাও দু'পাঁচ মণ করে কিনে ক্ষান্তি দেয়। গস্তিতে এখনো প্রায় পঞ্চাশ মণ রয়ে গেলো। আজকের দিনে প্রত্যেককেই হার বজায় রেখে বেচতে হচ্ছে। কেউ হাসবে কেউ কাঁদবে তা হবে না। চরের সমস্ত পাট একসঙ্গে মিলিয়ে দু'তিনটি লট করা হয়েছে। এখন যে লটের যা দাম ওঠে সেই হারেই পাবে যার যা টাকা।

বেলা দশটার মধ্যেই প্রত্যেকের হাতে নতুন করকরে নোট এসে যায়। গুণ বিচারে দরের কিছু কিছু তারতম্য হলেও দশ টাকা দরের নিচে কেউ পায় না। দুর্গা আটত্রিশ টাকা বারো আনা পেলো। আনন্দ নগদ আটত্রিশটা টাকা দিদির হাতে দিয়ে বাকীটা টেঁকে গোঁজে। দুর্গা আপত্তি করে না। না চাইলেও আজ রথের পার্বণী পেতো আনন্দ। গাধার মতো খেটেছে বেচারা, একটু আমোদ আহ্লাদ করবে বইকি। তাছাড়া ওকে নিয়ে কোন ভয় নেই। কোন রকম বাজে খরচায় যাবে না ও। ওর যতো চিন্তা নিজের পেট নিয়ে। চোখে দেখার মতো কোন নেশা ওর নেই। খুব বেশী সখ চাপে তো নাগর দোলায় দু'চার পাক দিতে পারে। বাস্, ঐ পর্যন্তই।

নগদ বারো আনা পয়সা হাতে পড়ায় আনন্দর আনন্দ আর ধরে না। ধামরাইর অলি-গলি ওর নখদর্পণে। উল্লাসে ছুটে যায় মেলার মাঝখানে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে রাধা-চক্কর। শিঙা ফুঁকছে সার্কাসের দল। তালে তালে ব্যাণ্ড বাজছে। তারের ওপর দিয়ে এক পায়ে হেঁটে ছড়ির মাথায় সানকী ঘোরাচ্ছে একদল। আর একদলে সখি নাচছে। বাঘ ডাকছে ওদিক থেকে। হই হই ব্যাপার। পাশের ঘরে নাকি দু'মুখো জীবিত মানুষ। ওধারে লটারি হচ্ছে। দু' আনার টিকিটে ঘড়ি, গ্রামোফোন, সাইকেল। না না, এসব এখন ও কিছু দেখবে না। আগে পেট, তারপর অন্য কথা। কিন্তু ওধারের চরায় ছোট ছোট হোগলার ঘরে ওগুলো কি বসেছে? মানুষ যে ছেঁকে ধরেছে সবগুলো ঘরকে। ও আবার কি তামাসা, দু' পা এগিয়ে যায় আনন্দ। আগে বাপ ঠাকুরদার সঙ্গে রথে বারকয়েক এসেছে। কিন্তু ওদিকটায় কোনদিন যায়নি। তাজ্জব ব্যাপার তো। মানুষ তো সব চেয়ে বেশী ঝুঁকেছে ওদিকটায়। আরো একটু এগিয়ে যায় আনন্দ।

ঘামে নেয়ে আধা-বয়সী একটি লোক রুমালে মুখ পুঁছতে পুঁছতে ফিরছিল। চিকন করে চুল ছাঁটা। গায়ে মম করছে আতরের গন্ধ। প্রবল ঔৎসুক্য নিয়ে তাকেই শুধোয় ও, ওহানে কি খেলা বসচে দাদা ?

আগন্তুক বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে জবাব দেয়, বড় বাগের (বাঘের) খেলা।

বড় বাগের খেলা !

হ দাদা, বড় বাগের খেলা। দেখবা নাকি ? চাইর আনা লাগবো।

থাবা থোবা দিব না ত ?

থাবা দিব কিগ ! বুকের উপুর উঠাইয়া নাচাইব। কি যে সুখ দাদা, ঢুলু ঢুলু চোখে অতীতে ফিরে যায় আগন্তুক।

আনন্দ সোৎসাহেই এগিয়ে যায়। ভিড় ঠেলে একটা ঘরের কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়ে, স্থূলাঙ্গী মধ্য-বয়সী একটি স্ত্রীলোক মধ্য-বয়সী আর-একটি পুরুষের কাছা ধরে টানছে। ঘামে নেয়ে গেছে বেচারা। বুটিদার ভয়েলের পাঞ্জাবী ভিজে জপ্‌জপ্‌ করছে। হার মতো নগদ একটা রূপোর সিকি সে স্ত্রীলোকটিকে দিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তবু ছাড়া পাচ্ছে না। পান দোক্তা খাবার জন্য আরো চারটে পয়সা চাই স্ত্রীলোকটির। চারদিকের লোক হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে—বক দেখাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি নাছোড়বান্দা। তার মতে নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ঢের অনেকক্ষণ বেশী থেকেছে পুরুষটি। অতএব আক্কেল সেলামী দিতে হবে। পুরুষটির গায়ে যথেষ্ট শক্তি আছে। যে কোন মুহূর্তে সে এক ঘুষিতে স্ত্রীলোকটির নাক মুখ থেঁতো করে দিতে পারে। কিন্তু পারছে না শুধু লজ্জায়। চেনাশুনো মানুষই হয়তো অনেকে দেখে ফেলছে। ভাঙানো চারটে পয়সা থাকলে না হয় ছুঁড়ে দিয়ে পালাতো। কিন্তু একটা ফুটো পয়সাও যে নেই পকেটে। রূপোর টাকা একটা কোঁচার খুঁটে বাঁধা আছে বটে। কিন্তু ওটা বার করলে রাক্ষুসী গোটাটাই কেড়ে নেবে। না, নাক মুখ কাটাই যাবে আজ। লজ্জায় কান মুখ লাল হয়ে উঠেছে বেচারার। স্ত্রীলোকটি কাছা ধরে যতো টানছে ও ততোই মাথা হেঁট করছে। মাঝে মাঝে জোর দেখাতেও চাচ্ছে। কিন্তু চারদিকের ফক্কুড়িতে মাথা তুলতে পারছে না। অবশেষে টেঁক হাতড়ে কিছু না পেয়ে স্ত্রীলোকটি জামা ছেড়ে বুক পকেটের রুমালটাই ছুবলে নেয়। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ছাড়া পেয়ে বেচারা কাছা সামলাতে সামলাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। চারিদিকের মানুষ—হই হই করে ওঠে।

দৃশ্য দেখে আনন্দ হতবাক। শহর বন্দরে অনেক বেশ্যা আছে বলে ও শুনেছে। কিন্তু তাই বলে মেয়েছেলে যে এতোটা বেহায়া হতে পারে তা ও কল্পনায়ও আনতে পারে না। থু থু ফেলতে ফেলতেই আনন্দ ছুটে পালায় সেখান থেকে। একটু ফাঁকায় এসে খানিক জিরাতে থাকে। ঘেন্নায় পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী সব পাক দিতে শুরু করেছে। ছি ছি ছি, দেব-দেবতার পূজো পার্বণে এসে এসব কি অনাচার। না, দোষ ওরই, কেন ও মরতে এল এদিকে।...

বটের ছায়ায় অনেকক্ষণ ধরে জিরোবার পর খানিক স্থির হয় আনন্দ। কিন্তু অবিরত থু থু ফেলে ফেলে গলা শুকিয়ে উঠেছে। এখন কিছু মুখে না দিলে এক পাও এগোনো যাবে না। সামনেই বড় বড় আক বিক্রী হচ্ছে। বেশ পুষ্ট, তক্‌তক্ করছে হলদে রং। এক আনা দিয়ে বাছাই একটা আকই কিনে ফেলে আনন্দ। হাটে বাজারে অন্যদিন এর দাম দু' পয়সার বেশী নয়। আজ রথের মওকা পেয়ে দাম চড়িয়ে দিয়েছে হাটুরেরা। তা দিক, প্রাণ তো এখন বাঁচলো।...আনন্দ খুশী মনেই আনিটা ব্যাপারীর হাতে দেয়। ওর নির্দেশ মতো কাটারি দিয়ে সমান তিন টুকরো করে কেটে দেয় আকের ব্যাপারী। গোড়ার দিকটা বেশী মিষ্টি হলেও অপেক্ষাকৃত শক্ত। দিদি আর ময়নার চিবাতে বেশ কষ্ট হবে। ও নিজেই তাই চিবাতে থাকে গোড়ার দিকটা। মিষ্টি রসে আবার মনের মিষ্টি ফিরে আসে। এবার সোজাসুজি চলে আসে খাবারের দোকানের কাছে। ময়রার দোকান, তেলে-ভাজার দোকান, খেলনার দোকানের ছড়াছড়ি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কোনটা রেখে কোনটা কেনে। কম পয়সায় পেট ভর্তি খাবার পেতে হলে তেলে-ভাজার দোকানই শ্রেয়। খাবারের রাজা, গরম গরম বেগুনি, ফুলুরি, ছোলা সিদ্ধ আর মুড়ি। দু'পয়সা দিয়ে বড় দেখে একটা মাটির হাঁড়ি কিনে নিয়ে তার ভেতর চার আনার তেলে-ভাজা আর মুড়িই সর্বপ্রথম কিনে ফেলে আনন্দ। জিলিপী তো গঞ্জে প্রায়ই খাওয়া হয়। সুতরাং সাবেক দর পয়সায় দু'খানা করে জিলিপী হলেও আজ আর জিলিপী নয়। রথ উপলক্ষে তৈরী বিশিষ্ট রস-বড়াই আজকের দিনের সেরা খাবার। বেশ বড় বড় লাল লাল বড়া। পেতলের গামলার রসে সাঁতার কাটছে যেন। গাওয়া ঘিয়ে তৈরী। মুখে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে গলে জল। দু' আনায় আট-খানা বড়াও কিনে নেয় আনন্দ। তা খরচা নেহাত কম হলো না। সাড়ে সাত আনা তো এরই মধ্যে কাবার। বাকী মাত্র সাড়ে চার আনা। সার্কাস এর

আগে আরো দু'বার দেখা হয়েছে। সুতরাং সার্কাস না দেখলেও চলবে। কিন্তু দু'মুখো মানুষ কেমন তা তো দেখতেই হবে। এক আনা যাবে ওতে। তারপর খেয়েদেয়ে রথটানের আগেই আবার এসে লটারির টিকেট ধরা চাই। দু' আনায় যদি একটা কলের গান পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। সারা চরফুটনগর ছুটে আসবে মণ্ডল বাড়িতে। না, আগে কাকেও কিছু বলা হবে না। বরাত খুললে, সামগ্রী হাতে করেই সকলকে বলা যাবে। কিন্তু না পেলে পয়সা দু'আনা মিছিমিছিই নষ্ট হবে।...তা হোক, পুরুষ মানুষকে অতো ভাবলে চলে না। কথায় বলে, সাহসে লক্ষ্মী নয়তো মাথায় বাঁশ। সেই ভাল, এখন আর এক পয়সাও খরচ করা হবে না। সর্বশেষ দু' পয়সার বিড়ি কিনে বাকী পয়সা কোঁচার খুঁটে বেঁধে ফেলে আনন্দ। তারপর খাবারের হাঁড়িটা হাতে নিয়ে হন্-হনিয়ে ঘাটের দিকেই পা চলিয়ে দেয়। পেছনের গলিটা এখনো বেশ ফাঁকা আছে। তবে বেলা বারোটার পরে আর হাঁটা যাবে না।

বিকেল চারটেয় রথ টান। বিরাট লম্বা দুই কাছি। বাসুকী নাগের মতোই বিস্তৃত স্থান জুড়ে পড়ে আছে। কম করেও পাঁচ শো গজ হবে এক একটা। ওজনও দশ বারো মণ হবে। রথের তলায় প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস হওয়া আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন আর কোন ভক্তকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। প্রাণের আবেগ এখন শুধু নেচে-কুঁদেই শেষ করতে হয়। রথের পেছনের চত্বরে বসেছে সার্কাস, হোগলার ঘর, দোকান পসার। সামনের চত্বর উন্মুক্ত। স্থায়ী কোন দোকান পাট নেই এখানে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত দলে দলে এসে গান গাইছে, নাচছে, জয়ধ্বনি দিচ্ছে। রথটানের আগ পর্যন্ত ফেরিওয়ালারা পুরোদমে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঁশের বাঁশী আর কলা-চিনিই প্রধান পণ্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত ছোঁয়াবে। ধীরে ধীরে চলবে মাধব জীউর রথ। জগন্নাথ যেন জগৎ জনের আকুল আহ্বানে বিশ্ব-ত্রাণেই চলেছেন। শোক তাপ জ্বালা সব দূর হবে আজ। কাছিতে হাত লাগাও—অকূলে কূল পাবে—অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। প্রতি বছর মানুষ এই বিশ্বাসেই ছুটে আসে। "রথেচ বামনং দৃষ্টা পনর্জন্ম ন ভবতু"। রথের ওপর প্রভুকে দর্শন করলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না। শোক তাপ জ্বালা থেকে চিরতরে মুক্তি মিলবে। শাস্ত্রের এই অভয় মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়েই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ রথে আসে। গাছের নতুন ফল নতুন ফুল ভবকাণ্ডারীর জন্য নিয়ে আসে। শুদ্ধ-ভক্তি-ভরে নিবেদন করে রথের

ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। জীবনের অচল রথকে সচল করবার জন্যই প্রাণের আবেগে কাছিতে হাত লাগায়। আবার দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভের আশায় কাছি থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ আঁশ ছিঁড়ে নিয়ে মাদুলি করে গলায় পরে। হোগলার ঘরের ভিড় অপেক্ষা এখানকার ভিড় ঢের বেশী। এখানকার মানুষের মধ্যে কোনরূপ লুকোচুরি নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের আপ্রাণ চেষ্টায়ও যদি ঠাকুরের রথ না নড়ে তবে প্রকাশ্যেই আকুল হয়ে কেঁদে বুক ভাষায় এরা। এ ভিড় আছে বলেই হয়তো সমাজ আছে, সভ্যতা আছে। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে কিনা তা পরলোক-স্বামীই জানেন। কিন্তু ইহলোকে কিছু না পেয়েও মানুষ মন থেকে এ বিশ্বাস একেবারে মুছে ফেলতে পারছে না। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে অনেক দিয়েছে, হয়তো আরো অনেক দেবে। কিন্তু তবু কি মানুষ পারবে এই নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি নিতে?…জগন্নাথের রথ চলেছে হয়তো ঠিকই চলবে।…

চারদিক থেকে দলে দলে অনুরাগীরা এসেছে। গস্তি নৌকো, ঘাষী নৌকো, ডিঙ্গি নৌকোর ছড়াছড়ি। নদীর মাঝ বরাবর নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ সাহেবের ঝকঝকে লঞ্চখানা। ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে পতপত করে আগে পিছে। ঢাকা, মহেরা, বালিয়াটি থেকেও খানকয়েক গ্রীনবোট পাশাপাশি এসে নোঙর ফেলেছে। কোনটায় চলছে ইয়ার বন্ধু-বান্ধবদের হইচই, কোনটায় গান বাজনা বাইজী নাচ। আবার কোনটায় সপরিবারে এসেছেন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা। জগন্নাথের হাটে কারো আসতে বারণ নেই। যার যেভাবে মন চায়।

চরের ঘাষী এবং গস্তি দু'খানা সরাসরি এসে ঘাটে ভিড়তে পারেনি। ভোর ভোর পৌঁছেও কিছুটা দূরেই বাঁধতে হয়। আর খানিকটা দেরি হলে ঘাট ছেড়ে অঘাটেই বাঁধতে হতো। ঢাকার একখানি গ্রীনবোট পাশাপাশিই রয়েছে। রথটান না দেখে বয়স্কদের কেউ জলও স্পর্শ করবে না। এক এক খানা নৌকো এসে ভিড়ছে সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি উঠছে। কুলনারীরা দিচ্ছে উলুধ্বনি। ভিন্ন ধর্মী যারা মেলায় এসেছে তারাও এবেলা কেউ রান্না-বান্না করছে না। বাজারের খাবার খেয়েই দিন কাটাচ্ছে। বেচা-কেনা সখ-আহ্লাদ মিটলে ওবেলা ইলিশ মাছের ঝোল ভাত খাবে। চরের মানুষদের তো কথাই নেই। ওরা সম্প্রদায় গত আলাদা হলেও এক আত্মা এক প্রাণ। রথের বাজার ভাল গেলে পুরো ভোজই আজ খাবে সকলে মিলে। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে শুধু ঢাকার

বোটখানায়। সকাল বেলাতেই ওদের রসুইখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রকমারী রান্নাই হচ্ছে হয়তো। অনুকূল বাতাসে মাঝে মাঝেই ভেসে আসছে খুশবু। দু'চারটি ফিনফিনে ছোকরা থেকে থেকেই ছাদের ওপর উঠে কি সব কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। কারো পরনে গোলাপী সিল্কের লুঙ্গি, স্যাণ্ডো গেঞ্জি। কারো বাম মণিবন্ধে সোনার ঘড়ি, নাকের ডগায় চশমা। শুধু আণ্ডার ওয়্যার পরেও কেউ কেউ হৈ হুল্লোড় করছে। মুহুর্মুহুঃ সিগারেট ফুঁকছে কেউ কেউ। হাসছে, শিস দিচ্ছে আবার হুড় হুড় করে নীচে নেমে যাচ্ছে। চরের ঝি-বউরা দেখে দেখে অবাক। রথে এসেছে তা অমন ফক্কুড়ী করছে কেন?...হঠাৎ তবলায় চাটি পড়ে। প্যা পোঁ করে বেজে ওঠে হারমোনিয়ম! সঙ্গে বেশ সুরেলা গলায় সুর ধরে একটি চাঁপার কুঁড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ চাঁপা ফুলের মতোই ওর গতরের রং—ছিপছিপে চেহারা। ঝলমল করছে রাশিকৃত গহনা। বুটিদার বেনারসীখানা তো বেশ দামীই হবে। ইস্, একটু যদি লজ্জা থাকে। একপাল পুরুষের সামনে কেমন সেজেগুজে গাইতে বসেছে।...গালে হাত দিয়েই ভাবতে থাকে চারদিকের তীর্থযাত্রীরা। হরি বাঈ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আপন ঢঙেই গাইতে থাকে—

কে বিদেশী মন উদাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।

গান সোমের মাথায় এসে জিয়ট বাঁধে। এতক্ষণ নজরেই পড়েনি কারো। পাশে বসে আছে আরো দুটি সুশ্রী মেয়ে। বয়েস হরির চেয়ে কমই হবে। বড় জোর আঠারো উনিশ। সহসা ঘুঙুর পায়ে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ায়। গানের তালে তালে ঝমঝম শব্দে শুরু হয় নাচ। বিলোল লীলায়িত অঙ্গভঙ্গী। চোখের ইসারায় বিদ্যুৎপ্রবাহ। সোমের সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়ছে ছোকরারা। শিস দিচ্ছে, গোলাপ ছুঁড়ছে, 'মরে যাই, মরে যাই প্রাণ' বলে লুটিয়ে পড়ছে। গ্লাসের পর গ্লাস পরিবেশিত হচ্ছে রঙিন সুধা।...দেখে দেখে গা পাক দিয়ে ওঠে কুসুমের। মাগো, কি ঘেন্না! ধুম্সো ধুম্সো মাগীরা একপাল ছোকরার মাঝখানে কেমন কোমর দোলাচ্ছে। একটুও কি লজ্জা নেই মুখপুড়ীদের!... পুরুষদের একজনও যে নৌকোয় নেই। একে একে সকলেই তো ডাঙায় গিয়েছে। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। ঠাকুর দর্শন করতে এসে একি দেখছে ও ছাই-ভস্ম!...নিশি গ্রীনবোটের দিকে চেয়ে মিটমিট করে

হাসছিল। কুসুম চীৎকার করে ওঠে, ছৈয়ের ভিতরে আয়, নিজেও উঠে আসে পেছন ফিরে। ছি ছি ছি কি ঘেন্না!...

রথ টান সময়মতোই হয়ে যায়। বেশ ভালভাবেই দর্শন হয়েছে ওদের। সকালে যে সব অযাত্রা দেখেছিল, তাতে ভয়ই ছিল, মাধবজীউ দর্শন দেবেন কি না। না, প্রভু ওদের মুখ রক্ষা করেছেন।

পুরুষ মানুষরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। খুব রক্ষা যে প্রথম চোটে বেশীর ভাগ পাট বেচে দিয়েছে। বিকেলের দিকে তো বাজার এক টাকা নরম। তাছাড়া খদ্দেরই নেই। রসিক ফড়ে তো এরই মধ্যে সাতবার এসে মাথা চাপড়িয়ে গেছে। তা যা হোক। ব্যবসা—ব্যবসা। ঠকা জেতা আছেই। তাই বলে তো আর সাইদের পয়সা ফেরত দেওয়া যাবে না। আর দেবেই বা কেন? এই তো মাত্র একবার এ রকম হলো। নয়তো বছর ভরেই তো ওঁরা কলা দেখায়। এখন মুশকিল হলো বাকী পাট ক'গাছা আর বেচা যাবে না। কে জানে, কি হবে এবার পাটের বাজার? নমুনা তো বড় ভাল ঠেকছে না। যাকগে, সে পরের ভাবনা পরে ভাবা যাবে। এখন চাই খাবার। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছে। ছোটরা অবিরত মুখ চালালেও বড়দের পেটে জলবিন্দুও পড়েনি। এখন রেঁধে খেতে গেলে অনেক দেরি হবে। শুধু মুখে অতোক্ষণ থাকা যাবে না। তাছাড়া সোজাসুজি ডাল-ভাতও আজ আর হবে না। আজ একটু রকমফের রান্নাই হবে। আর কিছু না হোক ইলিশ মাছের ঝোল ভাত ভাজা তো হবেই। সঙ্গে ফজলী আম আর দই। ইলিশ মাছ সকলকে যাচাই করেই পরিবেশন করা হবে। তা হয়ে যাবে'খন। মাধব জীউর দয়ায় কারবার একরকম মন্দ হয়নি। বাছ পাট যখন গড়পড়তা এগারো বারোয় বিকোলো তখন গাছ পাটের দর উঠবেই। বত্রিশ সালেও তো তাই হয়েছিল। দশ বারো থেকে চড়তে চড়তে একবারে ত্রিশ বত্রিশ। কিছু পাট অবশ্য ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তা হোক, এ সব ব্যবসাদারদের চালাকি। চাষীর মনের বল ভেঙে দেওয়ার মতলব। ও নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন চাঁদা উঠানো দরকার। এর আগ পর্যন্ত যা খরচা হয়েছে সে যার যার তার তার। এখনকার বারোয়ারি ভোজ চাঁদা তুলেই হবে। গন্তির ছৈয়ের ওপর বসে হুঁকো টানতে টানতে সল্লা চলে মোড়লদের। অন্যেরাও খুশী মনেই এসে যোগ দেয়। হাতে সকলেরই করকরে

নোট রয়েছে। ফর্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটা চাঁদা উঠে যায়। দীনু, করিম, পলান চাঁদা ছাড়াও প্রত্যেকে এক হাঁড়ি করে দই দিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। মদনই প্রস্তাবটা তুলেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে ও সব সময়েই অগ্রণী। গন্তি আর যাত্রীতে হই হই পড়ে। সব চেয়ে খুশী হয় ছোটরা। মনের আনন্দে তালপাতার বাঁশি জোরে জোরে ফুঁকতে থাকে। কিন্তু এতো সবই গেলো পরের কথা। এখন যে পেটের নাড়ী-ভুঁড়ী মোচড়াতে শুরু করেছে। এখনকার মতো কিছু চাই যে।...হুঁকো টানতে টানতে দীনুর নজরে পড়ে, ঘাটের পারে বড় বড় কাঁসার বগী থালায় করে মালাই নিয়ে উপস্থিত হয়েছে স্থানীয় গোয়ালারা। যেমন পুরু তেমন তকৃতক্ করছে রং। ও আর স্থির থাকতে পারে না। হুঁকোটা করিমের হাতে দিয়ে নৌকোর ওপর দিয়ে ডিঙাতে ডিঙাতে ঘাটের পারে গিয়ে নামে। এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বাছাই বাছাই চারখানা মালাই কিনে ফেলে দেড় টাকা দিয়ে। ওজন সের দেড়েক হবে। দরটা একটু চড়াই হলো। তা হোক, পালপার্বণের দিনে হবেই। সময়মতো যে এমন জিনিষ পাওয়া গেছে এটাই ভাগ্য।...কলার পাতায় জড়িয়ে দেয় গোয়লা যত্ন করে। তিনবার কপালে ছুঁইয়ে সাইদের টাকা টেঁকে গোঁজে। দীনু খুশী মনে এগিয়ে যায় আরও একটু ভেতরের দিকে। বড় রাস্তার ধারে বিন্নী (এক রকমের মিহি খই, সুগন্ধিযুক্ত) আর চিনির ছাঁচ নিয়ে বসেছে দোকানীরা। আড়াই সের ছাঁচ ও পাঁচ পো বিন্নী একটা মাটির হাঁড়িতে করে কিনে ফেলে। মাধব জীউর কৃপায় জলযোগটা বেশ জমবে। আজকের এত লোকের ভিড়ের মধ্যেও যে এ রকম মালাই পাবে তা ও ধারণাই করতে পারে নি। মুড়ি তো নৌকোয় আছেই, এখন গণ্ডাকয়েক কচি শসা হলেই মিটে যায়। কিন্তু একা একা আর এত জিনিষ বয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয়। এগুলো রেখে এসেই আবার নিতে হবে।...দীনু দু'হাত জোড়া সওদা নিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকোয় ফিরছিল। কিন্তু পেছন ফিরতেই পলান আর করিমকে হাসতে দেখে। করিমের হাতে বড় বড় বারো চৌদ্দটা ফজলী আম ও পলানের কাঁধের ওপর বিরাট একটা কাঁঠাল। ওজন কম করেও সাত আট সের হবে। দাম পাঁচ সিকে। ফজলী কয়টা দু'টাকায় কিনেছে করিম। দীনুকে হঠাৎ ছৈয়ের ওপর থেকে কিছু না বলে না কয়ে ছুটতে দেখে ওরা দু'জন অনুসরণ করেছিল। যার যা মন চেয়েছে সওদা করেছে। কেউ কাকেও বাধা দেয়নি। এ সওদা ওদের নিজেদের পয়সায় কেনা। সুতরাং কারো কিছু বলবার নেই।....

ছোটরা দিনভর মুড়ি চিঁড়ে আর তেলে-ভাজা খেয়ে খেয়ে থিতিয়ে পড়েছিল। শুধু ও-জাতীয় খাবার হলে ওরা আর ধারে কাছেও ঘেঁষতো না। কিন্তু মালাই, আম আর কাঁঠাল দেখে আবার সকলে পাতা নিয়ে ঘুরঘুর শুরু করে। খাবার সবই গিন্নীদের জিম্মায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারাই যাকে যা দেবার দেবে থুবে। মদন, আনন্দ মেলায় পা দিয়েই দু'চোখে যা দেখেছে গিলেছে। বড়োদের মতো ওরা কেউ উপোস দিয়ে নেই। তবু মালাইর লোভে পাছ ছাড়ছে না। করিম, পলানও রীতিমতোই ছাতু মুড়ি চিঁড়ে খেয়েছে। সুতরাং সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে সে খাওয়া জল হয়ে গেলেও যারা উপোস দিয়ে আছে তোড়জোড় করে সর্বপ্রথম তাদেরই বসিয়ে দিতে যায়। কিন্তু দীনু ওদের রেখে কিছুতেই বসে না। আনন্দ, মদনের ইচ্ছে ওদের সঙ্গেই একত্র বসে। কিন্তু দীনু বেছে বেছে ওদের ওপরেই পরিবেশনের ভার দেয়। পরস্পর হতাশায় সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগতে বাধ্য হয়। মেয়েরা সব সাজিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছে ওরা এনে পরিবেশন করছে। ছোটদের কাউকে পাত পেতে বসতে দেওয়া হয় না। এক একটা তো খুদে রাক্ষস। সারাদিন যা পাচ্ছে গিলছে আর হাগছে। পেট নয়তো যেন জয়ঢাক। যার যার ছেলেমেয়ে সে সে সামলায়। যৎসামান্য যা দেবার হাতে হাতে দিয়েই শান্ত করতে চেষ্টা করে। কেউ চুপ করে—কেউ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে থাকে। মায়েদের সঙ্গেও কেউ কেউ বসে আবার।

সকলের জলযোগের পর জয়ধ্বনি দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। এবার আর কোন আয়াস নেই। স্রোতের মুখে শুধু হাল ধরে বসে থাকা। বংশীর জল নেচে নেচে চলেছে। সাত আট মাইল পথ ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। দুপুরের দিকে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার। দ্বিতীয়ার চাঁদ উঁকি দিয়েই গা ঢাকা দিলে। ঝিরঝির করে বইছে জলো হাওয়া। পুরুষরা সকলেই এসে ছৈয়ের ওপর বসে। দল আগের মতোই ঠিক আছে। গিন্নী-বান্নিরা এবার রান্নার কাজে মন দেয়। মদন ধামরাইর বাজার থেকেই ইলিশ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু পলান রাজী হয়নি। বাজারে দর বেশী হবে। আবার বাসি পচা হবারও সম্ভাবনা আছে। সামনেই ঘুঘুদিয়া। জেলেদের আড়ত। ওখান থেকে দেখেশুনে কিনলে সব দিক থেকেই সুবিধা হবে। সকলেই পলানকে সমর্থন করে।

ভাটির টানে গস্তি দু'খানা বেশ গা ছেড়ে দিয়ে চলেছে। এদিক থেকে

ঘাষীখানার গতিই বেশী। একক ছেড়ে দিলে নাগালের মধ্যেই থাকবে না। কিন্তু তাতো আর হতে পারে না। সকলে একসঙ্গে এসেছে একসঙ্গেই ফিরবে। মেয়েদের গস্তিখানার সঙ্গেই দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হয় ওটাকে। গতি প্রতিহত হয়।

ফেরার পথে আর ফকিরের আসর বসে না। কীর্তনও না। সকলেই এবার খোশ গল্পে ব্যস্ত। সকলের মনেই বইছে খুশীর হাওয়া। ঘাষীখানায় চলেছে চ্যাংড়ার দল। এর ভেতরে আবার একটু যারা বয়স্ক তারা বসেছে ছৈয়ের ওপর। কেউবা পেছনের গলুইতে। আনন্দ, অশ্বিনী, ওসমান, মদন এদের দলে। সামনের গলুইর দিকে আছে, কাশেম, নিশি, ফজলুল প্রভৃতি। পাশাপাশি গস্তির সামনে বসেছে ময়না, পার্বতী, মেহেরা, আমিনা, আনোয়ারা। ছৈয়ের মাঝামাঝি বাচ্চা-কাচ্চারা। গিন্নী-বান্নিরা পেছনের দিকে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ময়না নিশির মধ্যে তেমন কোন জড়তা নেই। আজ অনেক দিন পর ওরা এত কাছাকাছি বসতে পেরেছে। কিন্তু মেহেরার যেন লজ্জাই কাটে না। কাশেমকে দেখে সুদীর্ঘ ঘোমটা টেনেই ও জবুথবু হয়ে বসে আছে। পার্বতী সামনে বসে কুটনো কুটে দিচ্ছে। মেহেরার উদ্দেশ্যে হাসতে হাসতেই বলে, কিগ বেগমসাহেবা, ঘরের নোকের কাছে আবার এত সরম কিসের? ঘুমটা খুইলাই বহ (বসো) না।

মেহেরার তবু লজ্জা ভাঙে না। ঘোমটার নীচেই ফিকফিক করে হাসতে থাকে।

ওকে নিরুত্তর দেখে পুনরায় কাশেমের সঙ্গেই রসিকতা শুরু করে পার্বতী, মিঞা সাবও যে চুপচাপ কইরা বইহা রইলেন। বিবিজানরে কোলে লইয়া বহেন না।

মেহেরা নিরুত্তর থাকলেও কাশেম নিরুত্তর থাকে না। সমতা রেখেই জবাব দেয়, কোলে উঠবার লেইগা যদি আপনার সক অইয়া থাকে তাইলে কন্ অশ্বিনী দাদারে ডাইকা দেই। মনের মানুষরে কোলে লইয়া বইহা থাউক।

হেসে পার্বতী বলে, আমরা পুরান অইয়া গেচি, আমাগ আর পোচে ক্যারা। মনের মানুষ দেখবার চান ত তবে এই গ্যাহেন, এক ঝটকায় মেহেরার মুখের ঘোমটা সরিয়ে দেয় পার্বতী।

বেচারা মেহেরা তাড়াতাড়ি ছু'হাত দিয়ে মুখ চেপে অবিরত হাসতে থাকে।

কাশেম বলে, অত হাসবার কি আছে। দিদির যখন সখ অইচে তখন কোলে না বইলা ঘুমটাডা খুইলাই বহ না।

হ, তাই কনচে! চাঁদ মুখ কি আমরা গিলা খাইয়া কালামু?

এর পর আর মেহেরা ঘোমটা দিয়ে সম্পূর্ণ মুখ ঢাকতে পারে না। শুধু চাঁদি পর্যন্তই ওঠে। মুখখানা সম্পূর্ণ ই দেখা যায়।

পার্বতীর দৃষ্টি পড়ে এবার নিশির ওপর। সরসতা নিয়েই বলে, নিশি-ভাইয়েরও কি মইনীরে দেইখা নতুন কইরা লজ্জা অইল নাকি? প্যাট থেইকা পইড়াই না দুইজনে গলাগলি ধইরা আচ।

কথাটা সত্যি হলেও নিশির মধ্যে কেমন যেন জড়তা এসেছে এখন। আগের মতো কিছুতেই আর ও ঝাঁ করে ময়নার চুলের মুঠি ধরতে পারবে না। ময়নাও হয়তো পারবে না কথায় কথায় ওর গলা জড়িয়ে ধরতে। কেমন যেন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। সর্বদা গায়ে আঁচল জড়িয়ে থাকে। এ যেন এক অভিনব রহস্য। জানা ময়নাকে নতুন করে জানতে ইচ্ছে করে।...পার্বতীর কথার কোন জবাবই দিতে পারে না। শুধু একটু হাসি খেলে ঠোঁটের কোণে।

কিন্তু পার্বতী ছাড়বার পাত্রী নয়। কাশেমও ছাড়ে না। পার্বতীকে সমর্থন করেই কাশেম বলে, কিগ ময়না পাখী, আর কিচু কইবার না পার নিশি ভাইরে একটা গৎ বাজাইবার কও না।

হ নিশিদাদা, ইসব ফাইজলামির কাম নাই। তুমি আমাগ একটা গৎ বাজাইয়াই হুনাও, এতক্ষণ পর মেহেরা মুখ খোলে।

পার্বতী সায় দেয়, বেশ, তাই বাজাও নিশিভাই। মেহের সোনা নাগরের গলা ধইরা ঝুলুক।

আমরা ঝুললে আপনাগও ঝোলন লাগব দিদি। অশ্বিনীদাদা ত পছার গলইতেই আচে, ডাইকা দিমু নাকি, কাশেম পাল্টা রসিকতা করে।

নিশি আর কাকেও কোন সুযোগ না দিয়ে বাঁশীতে ফুঁ দেয়। ভাটিয়ালির সুর অনুরণিত হতে থাকে বংশীর মেঘ-ঘন বক্ষে। মিছিল করে চলেছে নৌকোর বহর। পাশাপাশি যাচ্ছিল আর একটি সৌখীন দল। সুরের মূর্ছনায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলে বুড়ো সকলের প্রাণেই সাড়া জাগায় নিশির বাঁশের বাঁশী। বেজে বেজে থেমে যায় এক সময়। কিন্তু শ্রোতাদের রেশ কাটে না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে পার্বতী আবার আব্দার করে, ঐ গৎটা বাজাও নিশিভাই।

কোনটা ?—নিশি জিজ্ঞেস করে।

হেসে পার্বতী বলে, ঐ যে সেই—"রাধে তোর তরে কদমতলে বসে থাকি"....

নিশি কিছু বলার আগে কাশেম টিপ্পনী কাটে, হ হ নিশিভাই, তাই বাজাও। দিদির লেইগা যে দাদায় এহনো পছার গলইতে বইহা আচে।

পার্বতীও ছাড়ে না, বলে, দিদির কতা পরে ভাইবেন। বিবিজান যে আপনার লেইগা সামনেই বইহা আচে।

কি খালি খালি বাজে কথা! নিশিভাই, বাজাও গৎখানা, মেহেরা অনুরোধ করে।

নিশি আবার কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সুর ধরে। আবার উচ্ছ্বাস জাগে আবাল বৃদ্ধ বনিতার বুকে। সামনের গস্তির ছৈয়ের ওপর বসে বুড়োরা জটলা করছিল। বাঁশির সুর তাদেরও উন্মনা করে তোলে। কেউ আর কোন কথা বলতে পারে না। কান পেতে নীরবেই শুনতে থাকে। বাঁশী থামলে দীনুকে লক্ষ্য করে পলান বলে, বৈরাগীর পো, পোলার সাদী তাড়াতাড়ি দিয়া ত্থান। কদমতলায় আর কতদিন বইহা থাকব ?

দীনু মুখ টিপে টিপে হাসে।

উত্তরটা করিমই দেয়, বেশীদিন না থাকলেও এক বছর ত থাকনই লাগব। ইনাগ শাস্ত্রে যে আবার এক বছর অশৌচ পালন লাগে।

হ, তা কাটল ত কয় মাস। বাকীডা কাটলেই অইয়া যায়।...

হিসেব মতো ওরা হয়তো প্রথম রাত্রেই চরে পৌঁছুতে পারতো। কিন্তু ভোজ থাকায় ঘুঘুদিয়ার বাঁকে হিজল গাছের সঙ্গে নৌকো বেঁধেই রাত কাটাতে হয়। প্রাণপ্রাচুর্যে চলে খাওয়া-দাওয়া রং-তামাসা। ভোর ভোর সকলে এসে চরে পৌঁছোয়।

॥ ২৩ ॥

প্রথম রথের পর ফিরতি রথও কেটে যায়। কিন্তু পাটের দর আর ওঠে না। কেমন যেন থমথম করছে বাজার। অন্যান্যবার মাসখানেক আগেই গঞ্জে রেলি ব্রাদার্সের আপিস খোলা হয়। কিন্তু এবার সবই ভোঁ-ভাঁ। পূর্ণ পার্সেজার বার কয়েক নারায়ণ গঞ্জে শুধুই দৌড়ঝাঁপ করলেন। এ পর্যন্ত এক ছটাকের খরিদও আনতে পারেননি। ধামরাইর রথে গড়পড়তা এগারো বারো

টাকায় সাইদ হয়েছিল। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এখন সে পাট আট নয় টাকার বেশী নয়। তাই বা খদ্দের কোথায়? শুধু ফাঁকা কথার ছড়াছড়ি। দিন যত যাচ্ছে চরের মানুষের বুক কেঁপে উঠছে। মাসখানেক পরেই তো আসল গাছ পাট লাগবে। তার আগে আছে কাটাই, জাগ, বাছাই, ধোলাই ও শুকোবার খরচা। প্রথম দফার খরচা বাবদ মোটা সুদে অধিকাংশেরই কর্জ নেওয়া আছে। ভেবেছিল, দ্বিতীয় দফার খরচা বাছ পাট বেচেই হবে। কিন্তু তা আর হচ্ছে কই। রথে যা বেচেছে, বেচেছে। তারপর তো এ পর্যন্ত একটা ছিলকাও বেচতে পারছে না কেউ।...

দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটতে থাকে। হাতে এখন আর তেমন কোন কাজ নেই। ধলেশ্বরী বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। ঢেউয়ের ফোঁস-ফোঁসানী না থাকলেও স্রোতের টান ভয়ংকর। চারদিকের নালা-ডোবা থেকে দলে দলে ভেসে আসছে কচুরিপানা। পাট গাছ এখন যথেষ্টই বড়ো হয়েছে। এখন আর চাপায় পড়ে মারা যাবার সম্ভাবনা নেই। তবু যদি ক্ষেতের ভেতরে কচুরি-পানা ঢোকে তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। গাছের গায়ে পোকাও লাগতে পারে। চরের মানুষের এখন প্রধান কাজ হলো চারদিকে সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা। কিছুতেই যেন কচুরিপানা ক্ষেতে না ঢোকে।

সামান্য কাজ, সকলেই মন দিয়ে করে। সারাদিন তো শুয়ে বসে তামাক খেয়েই কাটাতে হয়। নৌকো ছাড়া এক পা বাড়ির বা'র হবার জো নেই। ঘর-বাড়িগুলো সবই যেন জলের ওপর ভাসছে। বিশাল সমুদ্রের মাঝে এক একটি জীবন-বয়া যেন। মাঝে সাঝে দু'পাঁচ জনকে নিয়ে দয়াল চানের আসর জমলেও ভাগবতের আসর আর তেমন জমে না। চরের সকলের নৌকো ডিঙ্গি নেই। দীনুর ডিঙ্গিতে সময়মতো যারা আসতে পারে কেবল মাত্র তারাই আসে। সব চেয়ে মুশকিল হচ্ছে রামকান্তকে নিয়ে। এক তো উত্তর কোণের শেষ প্রান্তে তার বাড়ি—ডিঙ্গি নিয়ে অনেকটা পথ যেতে হয়; তার উপর আবার প্রায়ই তাকে বাড়িতে পাওয়া যায় না। সেঁতসেঁতে ঘর ছেড়ে গঞ্জের কাছারিতেই অধিকাংশ সময় কাটায় রামকান্ত। বেচারার দোষ নেই। বন্দী অবস্থায় একা এক ঘরে কতক্ষণ লোকের মন টেকে। চরে ওর দোসর কেউ নেই। নাম কীর্তন ভাগবত পাঠ ব্যবসা হিসেবেই করতে হয় ওকে। মনের শান্তি কিছুমাত্র ওতে হয় না। তাই রমেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে গ্রীনবোটে মাতোয়ারা হয়ে পড়লে কোন কোনদিন ছেদও পড়ে যায়। পূর্ণচ্ছেদ ও স্বেচ্ছায়ই ঘটাতো। পারে না

শুধু রমেন্দ্রনারায়ণের সামান্যতম অনুকম্পার অভাবে। নিদেন যদি একটা তসিলদারের কাজও ওকে উনি দিতেন।...

ধরতে গেলে তামাক খেয়ে আর আলসেমী করেই দিন কাটছে চরের মানুষের। তবু এরই মধ্যে আর একটা ফাউ কাজ জুটে যায়। ভরা বর্ষায় গঞ্জের মানুষ মাছ একরকম খেতে পারে না বললেই হয়। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নদনদী উথলে পড়েছে। পাড় কূল কিছুই নেই। জেলেরা এখন আর বেড়াজাল দিয়ে মাছ ধরতে পারে না। জালের পরিধি থই পায় না। স্রোতের মুখে বড় বড় মাছ কে কোথায় লুকিয়েছে পাত্তা পাওয়াই ভার। বর্ষার একমাত্র মাছ ইলিশ আর চিংড়ী। ইলিশ মাছ আবার সবদিন সমান ধরা পড়ে না। তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে ওদের চলাচলের যোগ। যখন ধরা পড়বে তো ঝাঁকের ঝাঁক। আর যখন না পড়বে তখন সারাদিন পরিশ্রম করেও দু'চারটে ধরা শক্ত। তবে চিংড়ীর ব্যাপার অবশ্য আলাদা। চিংড়ী সব সময়েই ধরা পড়ে। মাঝ গাঙে নৌকোর ওপর থেকে টানা-জাল ফেলেই ধরতে হয় বর্ষার চিংড়ীকে। যেমন ব্যয়সাধ্য তেমন পরিশ্রমের একশেষ। গঞ্জের বাজারে তাই দামও তার তেমনি চড়া। গরীব-গরবার সাধ্য নেই মাছ মুখে দেয়।

গঞ্জের মানুষের অবস্থা যা-ই হোক চরের মানুষের কিন্তু পোয়াবারো। প্রত্যেকের বাড়ির বাঁকে সামান্য দুটো একটা পারন (মাছ ধরবার খাঁচা) পেতে রাখলেই সংসারের মাছ অফুরন্ত। পেট পুরে খেয়েও দিতে থুতে আপত্তি হয় না। এক এক রাত্রে গাদা গাদা চিংড়ী আর বেলে ধরা পড়ে। গরীবদের অনেকে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বেশ চড়া দামেই বেশীটা বেচে আসে। পারন ছাড়া ছিপ দিয়েও অনেকে বড় বড় বেলে মাছ ধরে। শুধু শুয়ে বসে না থেকে অনেকেই তাই মাছ ধরে সময় কাটায়।

ঝোপ বুঝে কোপ মারতে গঞ্জের মানুষ ওস্তাদ। চরের ঘরে ঘরে তাদের পাতানো ইষ্টতা। মামু, নানী, চাচা, মিতা, দোস্ত যার সঙ্গে যে যেভাবে পেরেছে। সুতরাং মিত্রদের অভাবের সময় পারনের মাছ চরের মানুষ একা খেতে পারে না। দু' পাঁচ দিন অন্তর অন্তর ভেট না দিয়ে উপায় নেই। হিসেবের খাতা খতাতে গেলে শুধু বাঁ-দিকের অঙ্কই বেড়ে চলেছে দেখা যায়। জমার ঘরে হয়তো শুধুই শূন্য। তবু চরের মানুষ চোখ কান বুজতে পারে না। সৃষ্টিকর্তা ওদের যেন শুধু দেবার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। ওদের কেউ দিলে কি না সে হিসেব খতিয়ে দেখতে ওরা জানে না। মহাজনরা তো আরো এক

কাটি সরেস। সুদের বেলায় কানা কড়িটিও মাপ হবে না। কিন্তু নেবার বেলায় ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। সুদ দিতে এসে রসিদ হয়তো বললে, কর্তা কিছু মাপ চাই।

কর্তার মুখে না নেই। বিড়বিড় করে তিনবার আওড়ালেন সুদের অঙ্ক, টাকা প্রতি মাসিক দু'আনা সুদ। তিন মাস দশ দিনে পনেরো টাকার সুদ হলো ধর সাত টাকা চার আনা—আচ্ছা দে তুই এক টাকা কম।

এক টাকা মকুব পেয়ে নিরক্ষর রসিদের আনন্দের সীমা নেই! দাঁত বার করেই হাসতে থাকে। সারা বর্ষা হয়তো পারনের চিংড়ী আর বেলে কর্তাকে উপঢৌকন দেবে—দশ জায়গায় কর্তার গুণগান করবে।

কর্তার ঠোঁটেও খুশীর হাসি। যাদুর খেলাই যেন হিসেবের মধ্যে অগ্রিম এক টাকা বেশী ধরে পরে সেই টাকাই বাদ দিয়ে দয়াল সাজা।

এ শুধু একক একটি সুদখোরের কথা নয়। ওদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যই এটা। হাটের দিনে হাটে এসেছে দেদার বক্স। সঙ্গে গোটাকয়েক কুমড়ো আর শসা। বেচে হয়তো সপ্তাহের নুন তেলের পয়সা হবে। আর এক কর্তা আস্তে আস্তে এসে হাজির হলেন দেদারের কাছে। শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টি—লুকোবার উপায় নেই। নেড়েচেড়ে কচি শসা জোড়া ও বড় কুমড়োটাই গামছায় বেঁধে হাঁটা দিলেন। আসার সময় দশজনকে শুনিয়েই বলে এলেন, গদী থেকে দাম নিয়ে আসিস দেদার।

দাম যা পাবে তা দেদারও জানে আর দশজনেও জানে। তবু মুখ খুলবার উপায় নেই দেদারের। একের ঝাল অন্যের ওপর ঝাড়তে উদ্যত হয় ও। যারা নগদ পয়সায় জিনিষ কিনতে এসেছে তাদের ওপরেই লোকসানের অঙ্ক চাপাতে চেষ্টা করে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে দেদার হয়তো দামের জন্য গদীতে এল। এসে দেখে, কর্তা হরিনামের ঝোলা নিয়ে বসেছেন। বাহ্যিক চেতনাই নেই যেন তার। দেদার ডাকতে সাহস পায় না। প্রয়োজন থাকলেও ফিরে যেতেই মনস্থ করে। উঠে হয়তো বেরিয়েই আসবে, কর্তা চোখ খোলেন। হরিনামের মালা তিনবার কপালে ছুঁইয়ে পেছু ডাকেন, কে রে, দেদার নাকি?

ঘুরে দাঁড়িয়ে আদাব জানায় দেদার। বলে, আইজ্ঞা হ।

কর্তা বলেন, বোস, তামাক খা। একেবারে যে সন্ধ্যা করে ফেলেছিস!

আইজ্ঞা হ, কাম সারতে সারতে বেলা অইয়া গেল।

তা তোর জিনিষের দাম কতো দেবোরে ?

ভ্যান কত্তা আপনার যা মোন চায়।

না না, বল ; কত দেবো ?

আমি আবার কি কমু। আপনেই ভ্যান ছাম কইরা।

কর্তা আর সময় ক্ষেপ করেন না। সুযোগ বুঝে বলেন, শসা জোড়া কচি হলেও বড় ছোটরে। কুমড়োটা বোধ হয় তেমন মিষ্টি হবে না। বড্ডো কাঁচা। আচ্ছা নে, তোকে আর ঠকিয়ে কি হবে, টেঁক হাতড়িয়ে একটা দু'আনি দেদারের দিকে ছুঁড়ে দেন।

সারাদিনের ক্লান্তির পর বেশ আরাম করেই তামাক ছিলুম খাবে ভেবেছিল দেদার। কিন্তু কর্তার বেহিসেবী কাজ দেখে মনে মনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। বাজারে বেচলে কম করেও কুমড়োটাই চার আনায় বেচতে পারতো। শসা জোড়াও চার ছয় পয়সার কমে বিকোতো না। এমন আক্কেল-নাশা মানুষ !···ইচ্ছে করে দু'আনিটা ছুঁড়ে মারে কর্তার নাকের ডগায়। কিন্তু পারে না।

কর্তা ভাব বুঝেই পুনরায় কীর্তনে মাতে, পাট এবার কেমন হ'লরে দেদার ?

গলার স্বর শুষ্ক করেই দেদার উত্তর করে, অইচে একরকম। আইচ্ছা, উঠি এখন কত্তা, উঠে দাঁড়াতে যায় দেদার।

কর্তা বাধা দেন, আরে বোস বোস ; আর-এক ছিলুম তামাক খা। ছেলেপুলে সব ভালো আছে তো ?

রাগ হয়েছিল দেদারের, কর্তার আন্তরিকায় মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ আশীর্ব্বাদে আল্লায় রাকচে একরকম, বসে পড়ে আবার এক ছিলুম তামাক সাজতে থাকে।

দেদারকে খুশী করতে পেরে কর্তা নিজেও খুব খুশী হন। জপের মালায় বারকয়েক হাত ঘুরিয়ে আসল কথায় আসেন, পারনে মাছ-টাছ কেমন পড়ছে রে দেদার ?

কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে দেদার বলে, তা মোন্দ পড়চে না কত্তা। কাইল বিহানে চাইরড্যা দিয়া যামুনে। বড় বড় ডিমওলা ইচা (চিংড়ী) আর বাইলা (বেলে মাছ)। বাইলার প্যাটেও ঠাসা ডিম।

কর্তার জিভ দিয়ে টসটস করে জল গড়াতে থাকে। সমানে ডাল-ভাত খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়বার উপক্রম হয়েছে। কে খাবে দু'আনা দশ

পয়সা কুড়ি চিংড়ী মাছ কিনে? সুদের টাকা অতো লপচপিয়ে খরচ করে ফেললে চলে না।…রসনার রস সজোরে চেপেই কর্তা বাধা দেন, না না, দেবার জন্য বলিনি। এমনিই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের এপারে তো মাছ নেই বললেই হয়।

কি যে কন কত্তা! কিনা দিমু নাকি যে তাই না করেন। পারনের মাছ দিমু তায় আবার কি অইব। কাইল হিহানেই আইনা দিমু, পোলাপানে খাইব। ন্যান, সেবা করেন, ফুঁ দিতে দিতে কল্কেটা কর্তার দিকেই এগিয়ে দেয় দেদার।

না, আমার হাতে এখন মালা রয়েছে, তুই খা।

দেদার মনের খুশীতেই হুঁকো টানতে থাকে। বেশ মৌজ হয়েছে তামাক ছিলুমে। হরিনামের মালা আর একবার কপালে ঠেকিয়ে কর্তা হাঁক ছাড়েন, কই রে, কে আছিস। দেদারকে গোটাকয়েক মোয়া দিতে বল।

শ্রাবণ সংক্রান্তি উপলক্ষে কর্তার বাড়িতে মোয়া মুড়কী পাক হয়েছে। মোয়ায় খাসা ভাজা তিলের সোদা গন্ধ। গোটাকয়েক মুখে দিলে দেদার নিশ্চয় গলে যাবে। তারপর…

হাঁক শুনে দেদার লজ্জা পায়। হুঁকো থেকে মুখ উঠিয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দেয়, না কত্তা মশয়, এহন কিচু খাইবার পারুম না। নামাজের সময় অইয়া আইল, উঠি এহন।

আরে বোস্ বোস্। না খাস ছেলেপুলেদের জন্য নিয়ে যা। ও তো ছেলেপুলেরই জিনিষ।

দেদার আর আপত্তি করতে পারে না। মনে মনে খুশীই হয় আদর আপ্যায়নে। তা মন্দ নয়, মোয়া কয়টা নিয়ে গেলে ছাওয়াল-পাওয়ালরা বেশ খুশীই হবে'খন। নাড়ু, মোয়া, মুড়কী বড় ভাল পাক হয় কর্তা মশায়দের বাড়ি। সেই ভাল, গামছায় জড়িয়ে নিয়েই যাবো মোয়া কয়টা।…

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে একটা বেতের কাঠায় করে আন্দাজ গোটা বারো মোয়া, কিছুটা তিলের ছাতু ও মুড়কী এনে হাজির করে কর্তার আট দশ বছরের এক ছেলে।

দেদার খুদে কর্তার হাত থেকে কাঠাটা নিয়ে গামছার মধ্যে যত্ন করে বেঁধে নেয় জিনিষগুলো। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে, কর্তা আর খুদে কর্তাকে সেলাম জানিয়ে উঠে পড়ে।

দেদার উঠে গেলে কর্তার দিল চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যাক বাবা, আর থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় খেতে হবে না। কাল থেকেই একটু মুখ বদলানো যাচ্ছে। আহা-হা, বর্ষার ডিমওয়ালা চিংড়ী আর বেলে তো বাদশাহী খাবার। ঝোল খাও, ঝাল খাও, অম্বল খাও কোন কিছুতে আটকায় না। মালার ঝোলা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে কর্তা গদগদ হয়ে বাড়ির ভেতরে যান।

সত্যি, গতকাল যা লগ্নি করেছিলেন কর্তা আজ থেকেই তার সুদ আদায় শুরু হয়েছে। বড় একটা খালুইতে করে শ' খানেক বেশ বাছাই চিংড়ী ও বিশ পঁচিশটে ডিমওয়ালা বেলে নিয়ে উপস্থিত হয় দেদার। সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা কাঁচা-পাকা কুমড়ো। কর্তা তো খুশীতে আটখানা। খুদে কর্তা ছুটে এসে জ্যান্ত চিংড়ীর গোঁফ ধরে নাচাতে থাকে। বাবাঃ, আজ কতদিন পরে মাছ খেতে পারবে।...

খুদে কর্তার উল্লাস দেখে দেদার অন্তরে সহসা বেদনা বোধ করে। মাছ নিয়ে আসার সময় ছোট ছেলেটা মাত্র দু'টো বেলে আর গোটা দশ-বারো চিংড়ী রেখে যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। কিন্তু ও তা রেখে আসতে পারে নি। সামান্য এ কটা মাছ না দিলে কর্তার কাছে ওর মান থাকে কি করে?...দু'টো দশটা তো দূরের কথা—নামমাত্র একটা মাছও রেখে আসে না দেদার। খুদে কর্তার বয়সীই হবে ইলাহি। মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বেচারার আজ হয়তো খাওয়াই হবে না।...তা ও আর কি করতে পারে! মুখ ফুটে চাইলেন কর্তা। ও তো আর না বলতে পারে না। আবার দিতে গেলে এ ক'টা মাছ না দিলেই বা কেমন দেখায়। মনের দুঃখ মনেই চাপতে চেষ্টা করে দেদার। মাছ ক'টা ঢেলে দিয়ে শুধু খালুই নিয়ে বাড়ির দিকেই রওনা হয়।

॥ ২৪ ॥

ছিলুমের পর ছিলুম তামাক খেয়ে, বড়শি পারনে মাছ ধরে, খোল বাজিয়ে কীর্তন আর দয়াল চানরে ডেকেও দিন কাটছিল না চরের মানুষের। একে তো হাতে তেমন কোন কাজ নেই তার ওপর আবার পাটের বাজার থমথম করছে। ধামরাইর রথে যে পাট এগারো বারোয় বেচে এসেছে তারই অবশিষ্টাংশ ঠেকায়

পড়ে নয় দশে বেচতে হচ্ছে। চাষীর মনে সুখ নেই, দিনও কাটে না। নাবী চাষ হয়েছে, ভাদ্রের মাঝামাঝি না হলে গাছ পাট কাটা যাবে না। হিসেব করে দেখতে গেলে আরো পনেরো কুড়ি দিন চুপচাপই বসে থাকতে হবে। না, এভাবে বসে থাকা বিরক্তির একশেষ। নতুন একটা কিছু জোড়া দিয়ে নিতে পারলে হতো···

ওদের মুখ চেয়েই বোধ হয় দয়াল চান দয়া করেন। গঞ্জে ফি বছর মনসা পূজোয় ধুম হয়। প্রতি ঘরে ঘরে পূজো। কুল-নারীরাই এ পূজোয় প্রধান অংশ গ্রহণ করে। শ্রাবণ সংক্রান্তির পাঁচ-সাত দিন আগে কাঠের পিঁড়ের ওপর, "আলা" পাতে (পিঁড়ের ওপর কাঁদা মাটি করে তার মধ্যে মুগ ও কলাই ক্ষেত করা)। পাঁচ-সাত দিনে লকলকিয়ে ওঠে কলাই ও মুগের চারা। সংক্রান্তির আগের দিন হয় 'আলার' অধিবাস। রং তুলি দিয়ে চিত্রানো হয় প্রত্যেকটি পিঁড়েকে। ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সন্ধ্যা রাত্রে হয় অধিবাস উদ্‌যাপন। কারো পাঁচখানা, কারো সাতখানা, আবার কারো বা ন'খানা পিঁড়ে। মনসা দেবীর বেদীর দু'পাশে থরে থরে কচি সবুজের সমাবেশ। দেবী আসবেন সংক্রান্তির দিন ভোরে। কারো রীতি অষ্টনাগের পূজো, কারো বেয়াল্লিশ নাগের। আবার ছাপ্পান্ন নাগের পূজোও করে কেউ কেউ। নাগ দিয়েই চালচিত্র—মাঝখানে দেবীর ভুবন-ভুলানো মূর্তি। মর্ত্যে দেবী পূজোর প্রবর্তন করেন চাঁদ সওদাগর। ভক্ত আর ভগবানের সে এক অলৌকিক কাহিনী। চাঁদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সওদাগর। তাই পূর্ববঙ্গেই দেবী পূজোর ঘটা। দেবীর প্রধান ভোগ দুধ আর কলা। কলার দাম আর দুধের দাম তাই এ দু'দিন পঞ্চমে ওঠে। তিন আনা চার আনা সের থেকে চৌদ্দ আনা এক টাকা পর্যন্ত ওঠে দুধের দর। অধিবাসের দিন কোন ভোগ-রাগ নেই। শুধু ফুল, আলপনা আর 'আলা' দিয়ে সাজানো হয় বেদীমূল। পরের দিন সংক্রান্তিতে হয় দু'বেলা পূজো—ভোগরাগ। তার পরের দিন এক বেলা পূজোর পর হয় ভাসান। এই ভাসানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর গঞ্জে বেহুলার হাট বসে। এ কোন পণ্যের হাট নয়—দেবীর হাট। এ হাটে দেবীর মাহাত্ম্যই কীর্তিত হয়। নমশূদ্রের মেয়ে শ্যামদাসী। বয়েস পঞ্চাশ পঞ্চান্ন—বিধবা। কালো গায়ের রং। সামনের তিনটে দাঁত নেই। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। প্রবাদ, বংশীতে নাইতে গিয়ে মা মনসার ঘট পেয়েছে শ্যামদাসী। 'জিয়ন' ঘট। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ঘটের জল নতুন ক'রে মন্ত্রপূত করেন

হাটের ঠাকরুন। মা মনসার গুণগান করেন। ঘুঙুর পায়ে নাচেন। আম্রপল্লব দিয়ে পূতবারি ঘন ঘন সিঞ্চন করেন ভক্তগণের শির-'পরে। কুললক্ষ্মীরা দলে দলে আসেন বেহুলার হাটে। সিধা জলপান দেন হাটের ঠাকরুনকে। নতজানু হয়ে শিরে ধারণ করেন 'জিয়ন' ঘটের সিঁদুর—পূতবারি। একবছর আর সাপের ভয় নেই। কেউ কেউ আবার তাগা, তাবিজ, ঔষুধি-শিকড়ও নেন শ্যামদাসীর কাছ থেকে।...

প্রতিবারই বেহুলার হাটের মধ্যে হয় উৎসবের সমাপ্তি। তার আগে ভাসান উপলক্ষে চলে নৌকো বাইচ। স্থানীয় প্রতিযোগরাই কেবল যোগ দেয় এতে। বিশেষ কোন পুরস্কার বিতরণের রীতি নেই। শুধু বাহবা আর করতালি। তাতেই গ্রামের মানুষ মুখর হয়ে ওঠে। শ্রাবণের প্রথম দিকেই মেরামতের পর ছিপে গাব দেওয়া আরম্ভ হয়। একশ হাত দেড়শ হাত লম্বা ছিপ। কোনটার গলুই ময়ুর-মুখো। কোনটা বা গরুড়, মকর, জলপরী। আবার সাধাসিধে ছুঁচলো মুখও কোন কোনটার। তাতে আবার সারবন্দী পেতলের কলসী বাঁধা। বড় থেকে ক্রমাগত ছোট হয়ে গেছে কলসীর বহর। প্রত্যেকটির পেছনের গলুইতে স্ব স্ব প্রতীক চিহ্নযুক্ত পতাকা। নিচে পঞ্চাশ ষাট, উর্ধ্বে একশ দেড়শ জন জোয়ান প্রতিদ্বন্দ্বী সারবন্দী হয়ে বসে দু'দিক থেকে বৈঠা চালায়। ছোট ছোট কাঠের হাত বৈঠা। সর্দারের হুঙ্কারের তালে তালে অবিরত জলের ওপর পড়তে থাকে। ছিপ যায় তরতর করে এগিয়ে। যেন মনপবনের নাওই চলে জলের ওপর দাগ কেটে।

চরের মানুষ ফি বছরই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে একত্র ফুর্তি—জারি, সারি, গোষ্ঠ গায়। গতানুগতিকতায় কেউ কেউ আবার ঝিমিয়েও পড়ে। অন্যান্য বারের কথা যাই হোক, এবার আর কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। শ্রাবণের প্রথম হাট থেকেই শুরু হয়েছে "হ্যাণ্ডবিল" বিলোনো। গঞ্জের বাবু ভূইঞরা এবার বিশেষ ব্যবস্থা করছেন। এবার আর শুধু বাহবা আর করতালির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ সীমাবদ্ধ নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অনন্ত রায় স্বয়ং দিচ্ছেন একখানি সোনার মেডেল ও তিনটি বড় রূপোর কাপ। তার বন্ধু ইন্দ্র পোদ্দার দিচ্ছেন ছোট বড় দশখানা মেডেল। বন্ধকী কারবার ইন্দ্র মোহনের। বহু ভরি খাদ মিশানো রূপো অচল হয়ে পড়ে আছে সিন্দুকের তলায়। গোটাকয়েক মজুরির টাকা ছাড়া টেঁকের একটি কানাকড়িও খসবে না। এ তো খুবই সামান্য

ব্যাপার। সুদের ওপর দিয়েই যাবে—আসলে হাত পড়বে না। এতে যদি ভবিষ্যতে ভাগ্য খোলে সে তো আনন্দেরই কথা। না না, ও খুশী হয়েই দিচ্ছে মেডেল ক'খানা। মা লক্ষ্মীর কৃপায় পয়সার কিছুমাত্র অভাব নেই। এখন চাই যশ ও প্রতিপত্তি। আর তা পেতে গেলে সর্বাগ্রে জনচিত্তে প্রবেশ করতে হবে। তাদেরই প্রতিনিধিরূপে যেতে হবে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য পদে। আর-এক ধাপ উঠে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, তারপর এম, এল, এ। তার পরের ধাপ কেন্দ্রের সদস্য হওয়া। মানুষ তো এমনি করেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়। মানুষই মানুষকে অমর করতে পারে। টাকা কিছু নয়।…

ইন্দ্র মোহনের বুকে দুরাকাঙ্ক্ষার ঝড় ওঠে। শুধু মেডেল দশখানাই নয়। 'হ্যাণ্ডবিল' বিলি ও ঢোল শহরতের যাবতীয় খরচা এ পর্যন্ত সেই যুগিয়ে আসছে। প্রয়োজন হলে আরো যোগাবে।…

ইন্দ্র মোহনের পরের উৎসাহদাতা হলো রহিমুদ্দীন খলিফা। প্রেসিডেণ্ট আর ইন্দ্র মোহনের সঙ্গে রহিমুদ্দীনের গলায় গলায় ভাব। সে দেবে ভলেণ্টিয়ারদের ব্যাজ, পরিচালক মণ্ডলীর প্রতীক পতাকা ও পাঁচখানা রূপোর মেডেল। আরো খান পঞ্চাশেক মেডেলের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে। স্বয়ং রমেন্দ্রনারায়ণও উৎসবে মাতেন। তার কাছারি বাড়িই হবে পরিচালক মণ্ডলীর আপিস ঘর। চাঁদা ও মেডেল উনিও দেবেন।…

ঢোল শহরৎ যোগে জানানো হয়, প্রতিযোগী প্রত্যেকটি দলকে পান সুপুরি বিড়ি মুফত দেওয়া হবে। আর দেওয়া হবে একবেলার খোরাকী বাবদ—জন পেছু এক পো করে চিঁড়ে, আধ সের দই ও আধ পো গুড়। প্রবেশ ফি এক পয়সাও লাগবে না কারো। ২৫শে শ্রাবণ ভর্তি হবার শেষ তারিখ।…

দূর দুরান্ত থেকে আসে হাটুরেরা। বার্তা রটে যায় দিকে দিকে—গ্রাম ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে। দলে দলে এসে ভর্তি হতে থাকে প্রতিযোগিরা। লোক সংখ্যা জানিয়ে যায়। নিজেদের মধ্যে চলে সংগঠনের কাজ। পুরোনো ছিপ বাতিল করে কোন কোন দল চাঁদা তুলে নতুন ছিপ গড়তে আরম্ভ করে। সারি, জারি, গোষ্ঠর সঙ্গে গঞ্জের বাবুদের গুণপনার উল্লেখ করে গানও বাঁধতে থাকে কেউ কেউ। প্রতিদিন প্রতি রাত্রে চলে মহড়া। চরের মানুষের মধ্যেও প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ওদের দু'খানি ছিপ প্রতিযোগিতা করবে। একটি চরধল্লার আর একটি ফুটনগরের। ভাগবত আর দয়াল চানের আসর

একরকম বন্ধ বললেই হয়। জনকয়েক বুড়ো-বুড়ীর পাল্লায় পড়ে রামকান্তকে নিয়মিত যেতে হয় বটে কিন্তু আসর মোটেই জমে না। সবাই ব্যস্ত বাইচের তোড়জোড় নিয়ে। তা সংগঠন নেহাত মন্দ হয়নি। সোনার মেডেল ও কাপ না পেলেও দু'চারটে মেডেল কেউ আটকাতে পারবে না।...

বাইচ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পঁচিশ থেকে চল্লিশ হাতি নৌকোর এক ভাগ। চল্লিশের ওপর থেকে পঁচাত্তর পর্যন্ত আর এক ভাগ। এবং পঁচাত্তরের ওপর থেকে যতো ঊর্ধ্বেই হোক তার আর এক ভাগ। দিন যতো ঘনিয়ে আসছে প্রতিযোগীর সংখ্যা ততোই বাড়ছে। হিসেব মতো ধরতে গেলে লক্ষাধিক লোক আসছে গঞ্জে। স্কুল কমিটির নিকট দরখাস্ত করে বাইচের দিন স্কুল ছুটি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রই হবে ভলেন্টিয়ার। এ ছাড়া অন্যান্য সাধারণ লোকের মধ্য হতেও শ' পাঁচেক কর্মী পাওয়া যাবে। শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ সাহেবের নিকটেও সদরে দরখাস্ত করা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের আবেদনে স্বয়ং এস্ পি-ই আসছেন সদলবলে বাইচ দেখতে। এছাড়া আছে স্থানীয় থানার রক্ষীবাহিনী। আয়োজন যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবেই এগিয়ে চলে। তল্লাট জুড়ে হইহই রৈ রৈ কাণ্ড।...

পয়লা ভাদ্র বুধবার। গঞ্জে আজ বহু বিঘোষিত বাইচের দিন। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই নহবত বাজতে শুরু হয়েছে। একদল বসেছে যেখান থেকে বাইচ আরম্ভ হবে সেখানে। আর একদল যেখানে শেষ হবে। উঁচু শালের খুঁটির ওপর সুন্দর দু'খানি সাজানো-গুছানো ঘর। বৃহৎ দুই পতাকা উড়ছে শীর্ষদেশে। এছাড়া একদল ব্যাণ্ড অবিরত বেজে চলেছে ভ্রাম্যমাণ নৌকোয়। ভলেন্টিয়ারাও সময়মতো এসেই দলে দলে যোগ দিচ্ছে। পুলিশ সাহেবের লঞ্চও শেষরাত্রেই থানার ঘাটে এসে পৌঁচেছে। ভোরের দিকেই কর্ম-পরিষদের জনকয়েক সভ্যকে সঙ্গে করে প্রেসিডেন্ট অনন্ত রায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসেন। প্রেসিডেন্টের অনুরোধক্রমে তিনিই আজ পুরস্কার বিতরণ করছেন। আয়োজনের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। বেলা একটা থেকে শুরু হবে বাইচ। গঞ্জের মানুষ আজ সকাল সকালই রান্না খাওয়া সেরে যে যেখানে পারে জড় হতে থাকে। ঘাটে যে জায়গা না পায় সে টিনের চালার ওপর—দালানের ছাদে এমন কি বড় বড় গাছের ওপর উঠে প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ আবার নৌকো ভাড়া করে সপরিবারেই বাইচ দেখতে বা'র হয়।

সকাল না গড়াতেই দলে দলে আসতে থাকে ছোট বড় ছিপ। কোন দল গাইছে সারি, কোন দল জারি, কোন দল আবার বহুরূপী সেজে রং-তামাসা করছে।

সীমারেখা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকরা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। প্রবেশপত্রের রসিদ দেখে দুই চিঁড়ে ও পান বিড়ির টিকিট দিচ্ছে। টিকিট হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি দিচ্ছে আগন্তুকরা। গঞ্জের গুণগান করছে উল্লাসে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে পঞ্জীয়নকৃত ছিপ ছাড়া বাড়তি ছিপ নিয়ে। তাদের আবদার, গঞ্জের নাম-ডাক শুনে বহুদুর দেশ থেকে আসছে তারা। সময়মতো খবর পৌঁছোয়নি বলে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবেশপত্র পেশ করতে পারেনি। দয়া করে তাদের সুযোগ দেওয়া হোক।

স্বেচ্ছাসেবকেরা বিপদে পড়ে। নিজেরা ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না। কর্মপরিষদের মূলকেন্দ্রে খবর পাঠানো হয়। পরিষদ সামান্যতম দলের কথা বিবেচনা করে প্রথম দফায় অনুমতি দান করেন। রবাহূতরা সন্তুষ্ট হয় তারাও পায় নিয়মিত দলের মতোই খাদ্য আর বিড়ির টিকিট।

ঝাঁকের ঝাঁক ছিপ এসে বংশীর জল কাঁপিয়ে তোলে। কাড়া-নাকাড়া বাজছে কোন কোনটায়। কোন কোনটায় বা ঢোল কাঁসর। সিঙাও ফুঁকছে কেউ কেউ। বেলা যতো বাড়ছে অগুনতি ছিপ এসে ভিড় করছে। পঞ্জীয়নকৃত ছিপ অপেক্ষা অপঞ্জীয়নকৃত ছিপের সংখ্যাই বেশী। এ যেন রক্তবীজের ঝাড়। বীর বিক্রমে স্বর্গরাজ্য গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। লাল শালুর ফালি দিয়ে বেশ আঁটসাঁট করে বাঁধা। কারো বা চাড়ানো গোঁফ। কেউ পরেছে লুঙ্গি, কেউ কাপড়ই মালকাছা করে। খালি গায়েই আছে বেশীর ভাগ। আবার জাপানী সিল্কের গেঞ্জী অথবা রঙবেরঙের হাফ সার্ট ও পরেছে কেউ কেউ। হাতে প্রত্যেকেরই ছোট ছোট বৈঠা।...না না আর একখানা বাড়তি ছিপকেও টিকিট দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ওরকম কাউকে। প্রথম দফার আদেশ নাকচ করে পরিষদ থেকে দ্বিতীয়বার আদেশ যায়। স্বেচ্ছাসেবকরা সেই মতোই ঘাঁটি আগলাতে থাকে। মিনিট দশ পনেরোর মধ্যেই উত্তর দক্ষিণ সীমানায় শ'খানেক ছিপ আটকে পড়ে। কোন দলের সর্দার এগিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদের নিকট হাত জোড় করে ঃ দ্যান কত্তারা আমাগ একখান টিকট, অনেক দূর দ্যাশের থনে আইচি। আল্লায় আপনাগ বালো করব।...

স্বেচ্ছাসেবকরা নিরুপায়। এরকম হারে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলে বাইচ দেবার জায়গাই থাকবে না। দই চিঁড়ের ব্যবস্থা করাও আর সম্ভবপর নয়। উত্তরে ওরাও হাত জোড় করেই অক্ষমতা জানায়।

উত্তর শুনে পাশের আর-এক দলের সর্দার মাথার বাবরিতে ঝাঁকুনী দিয়ে রুখে দাঁড়ায়, ক্যা মশয়রা, আমাগ ঢুকবার দিবা না তয় আগের দলগ দিচ ক্যান? হ্যারা কি তোমাগ বাপঠাকুরদা না?…

তার কথা শুনে ছোকরা এক স্বেচ্ছাসেবক সমতা রেখেই রুখে দাঁড়ায়, এই মিঞা, মুখ সামলিয়ে কথা বলো।

কি কতা তোমাগ লগে কইব মাইনষে? খাইবার দিবার পারবা না তয় ঢোল দিচিলা ক্যান?…দুর থেকে আর-এক দলের সর্দার নৌকোর ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে ফেটে পড়ে।

অবস্থা বিপদজ্জনক বুঝে স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিকর্তা হাত জোড় করেই সামলাতে চেষ্টা করে। অত্যন্ত বিনীতভাবেই বলতে থাকেঃ ভাইসব, আপনারা মাথা ঠাণ্ডা করুন! আপনাদের জন্য সাধ্যমতো ব্যবস্থা আমরা করবো। আপনাদের জন্য আগামীকাল দিন স্থির হচ্ছে…

আরে রাইখা দ্যাও তোমার ঢলাইনা কতা। কাইল হুনা (শূন্য) গাঙ্গে বাইচ দিমু কি তোমাগ পুট্‌কী (পাছা) চুষবার জন্য না?

অধিকর্তা বিপদে পড়ে। ছোকরা স্বেচ্ছাসেবকদের সামাল দেওয়াও দায় হয়ে ওঠে। ওরাও যে যার মতো জামার আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। এ রকম অসংলগ্ন কথাবার্তা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না।…

অধিকর্তা তবু হাতজোড় করেই সকলকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ছিপের দানবরা ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে। পায়ের রক্ত মাথায় উঠেছে ওদের। মুহূর্তের মধ্যে হুঙ্কার ওঠে, মার শালাগ বৈঠার বারি, মার, মার…

প্রথম বৈঠার আঘাত অধিকর্তার কাঁধের ওপর পড়ে। অল্পের জন্য মাথা রক্ষা হয়। জলে লাফিয়ে পড়ে বেচারা। উন্মত্ত জনতার সম্মুখে স্বেচ্ছাসেবকরা ফুৎকারে উড়ে যায়। যে যেভাবে পারে জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচায়। কারো মাথা ফাটে, হাত ভাঙে। আবেষ্টন বেষ্টনী চোখের পলকে ভেঙে যায়। দলে দলে ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে বে-আইনী ছিপ। রণতরীই যেন এক একখানা। বাতাসে ফরফর করে বাবরি উড়ছে এক একজনের। হাতের বৈঠা কাঁধের ওপর। যার যা মন চাইছে খিস্তি করছে—কাড়া-নাকাড়া শিঙা ফুঁকছে।

ব্যাণ্ড পার্টির নৌকো পা দিয়ে ডুবিয়েই দেয় একদল। খরস্রোতে ভেসে যায় ঢাক, জয়ঢাক, ব্যাকপাইপ। দর্শকদের নৌকোও চড়াও করে কেউ কেউ। ভয়ার্ত স্ত্রী শিশু চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। যে পারে পুলিশ সাহেবের লঞ্চের কাছে নৌকো নিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মুহূর্তে শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। যারা লাইন দিয়ে বরাদ্দমতো দই, চিঁড়ে, পান, বিড়ি নিচ্ছিল তারা পেটের খিদেয় এতক্ষণ ধুঁকছিল, এবার জ্বলে ওঠে। চারদিক জুড়ে শুধু মার মার কাট কাট শব্দ। দেখতে দেখতে লুঠপাট আরম্ভ হয়ে যায়। রহিমুদ্দীন খলিফার দোকানই লুঠ হয়ে যায় সবার আগে। ভাগ্যিস সময়মতো গা ঢাকা দিয়েছে রহিমুদ্দীন নয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। প্রেসিডেণ্ট অনন্ত রায় তার দোতলা গদি-বাড়ির চিলে কোঠায় আত্মগোপন করে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন। দরোয়ানও বার থেকে সদরে তালাচাবি দিয়ে সরে পড়ে। ভাবখানা গদীতে কেউ নেই। ইন্দ্র পোদ্দার তো কাছা ঝাড়তে ঝাড়তে সমানে দৌড়। হ্যাণ্ডবিলে ওদের তিনজনের স্বাক্ষর ছিল। তাই সকলের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিই ওদের তিনজনের ওপর। পায় তো কাঁচাই চিবিয়ে খায়!···

বেলা একটা থেকে বাইচ শুরু হবার কথা। এখন বেলা মাত্র এগারোটা। পুলিশ সাহেব একটু সকাল সকালই "লাঞ্চ" সারছিলেন। কথা ছিল, রমেন্দ্র নারায়ণের কাছারিতে বসে বাইচ দেখবেন ও পুরস্কার বিতরণ করবেন। কিন্তু চারিদিকের হইচইএ তক্ষুণি টেবিল ছেড়ে ডেকের ওপর উঠে আসেন। দুরবীণ দিয়ে দেখতে থাকেন অগণিত জনতার তাণ্ডব। এ রকম পরিস্থিতির জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না উনি। থানায় মাত্র জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ। গুলি চালিয়েও আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নেই। তাতে হয়তো উত্তেজনাই বাড়বে কেবল। এক মিনিট ভেবে সারেঙকে লঞ্চ ছাড়তে হুকুম করেন। ঘন ঘন টহল দিতে থাকেন এ-মাথা ও-মাথা।

হামলাকারীরা এখন লুটপাটে মাতোয়ারা। যারা লুট করতে নারাজ তারা খেউর গেয়েই মনের ঝাল ঝাড়ছে। একদল সমস্বরেই গাইছে—

দৈ চিড়া দে শালারা—
দৈ চিড়া দে।
দৈ চিড়া না দিবার পারলে
(মাগী) মাইগ ভাড়া দে শালারা
মাইগ ভাড়া দে ॥···

হঠাৎ পুলিশ সাহেবের লঞ্চ একটি দলের পাশে এসে ভোঁ ভোঁ শব্দে সিটি মারে। দলের কর্তা গান থামিয়ে সকলকে বৈঠা চালাতে হুকুম করে। তীরবেগে ছুটে পালায় ছিপ ভাটির পথে। কিছুটা ফল হয়েছে দেখে উৎসাহিতই হন পুলিশ সাহেব। ঘন ঘনই সিটি পড়তে থাকে লঞ্চ থেকে। তীরের লুটেরা ছিপে এসে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেয়। লাল মুখকে বড় ভয়। ডেকের ওপরে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেব। এক গুলিতেই তামাম শোধ।···যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। একদল আবার রুখেও দাঁড়ায়। তাদের দাবী, স্থায্য প্রবেশপত্র নিয়ে বাইচ খেলতে এসেছে তারা। মেডেল, কাপ না নিয়ে যাবে না। বাইচ খেলা আরম্ভ হোক।···যারা ছুটে পালাচ্ছিল দাবীর জিগিরে তারাও আবার ফিরে দাঁড়ায়। নতুন করে বিপদ দেখা দেয়।

পুলিশ সাহেবও নতুন করেই ফন্দী খোঁজেন। কাছারির ঘাটে এসে লাগে লঞ্চ। রমেন্দ্রনারায়ণ নিজের রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিপদ বুঝলেই গুলি চালাবেন। সাহেব এখানে বসে বাইচ দেখবেন বলে থানার দু'জন রাইফেলধারী সিপাই সকাল থেকেই মোতায়েন আছে। সুতরাং আত্মরক্ষার কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না। কিন্তু হামলাকারীদের এভাবে বেশী-ক্ষণ সময় দিলে গঞ্জ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। পুলিশ সাহেব আর রমেন্দ্র নারায়ণের মধ্যে কিছুক্ষণ সল্লা চলে। রামকান্ত পাশেই ছিল। সে-ই জোর দিয়ে বলে, চরে খবর পাঠালে সহজেই এ হামলা দূর হতে পারে স্যার। হাজার হুই লাঠিয়াল দীনু, করিম আর পলান ব্যাপারীর মুঠোর মধ্যে···

উত্তম প্রস্তাব। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তোলা যাক। লঞ্চ পূব থেকে সটান পশ্চিম পাড়ে এসে লাগে। রামকান্ত গিয়ে খবর দেয় মোড়লদের। ছিপ প্রস্তুতই ছিল। এতক্ষণের এই হুলুস্থুল কাণ্ডের কথা বিন্দুমাত্রও টের পায়নি চরের মানুষ। গঞ্জ লুট করবে বাইরের গুণ্ডারা! কখনো হতে পারে না।···দু'খানি ছিপে বোঝাই হয়ে আসতে থাকে চরের জোয়ান জোয়ান মানুষ। দমাদ্দম পড়তে থাকে বৈঠার বাড়ি। এবার আর কেউ রুখে দাঁড়াতে সাহস পায় না ছিপ নিয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।···

বাইচ উপলক্ষে যে মেডেল কাপ পুরস্কার হিসেবে দেবার কথা হয়েছিল তা দেওয়া হয় চরের বীরদের। তাদের প্রচেষ্টাতেই গঞ্জ আজ সর্বনাশের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। পুলিশ সাহেব নিজের হাতে পরিয়ে দেন পুরস্কার। সোনার মেডেল আনন্দই পায়। কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি আনন্দর লাঠির শক্তি

এমন দুর্বার। পেট-পাগল মানুষ অষ্টপ্রহর খাওয়ার ধান্দাতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে মানুষের বাহুতে যে এত বল একথা চিন্তারও অতীত। সাড়ে তিন হাত লাঠি—কেউ রুখে দাঁড়িয়েছে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে আনন্দ তার ওপর। বোঁ বোঁ করে ঘোরে লাঠি—ঢিল ছুঁড়েও কোন ফায়দা নেই। দলবদ্ধ হয়ে যারা হামলা শুরু করেছিল দলবদ্ধ হয়েই তারা পালাবার পথ খোঁজে। দু'চারজন রুখে দাঁড়াতে গিয়ে বেদম প্রহার খায়। যেন ষাঁড়ের পিঠেই পড়ছে লাঠি। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, লেজ তুলে দৌড়।

সোনার মেডেল পেয়েছে আনন্দ—চরফুটনগরের মাথা আজ উঁচু হয়েছে। দুর্গার বুকখানাও গর্বে ভরপুর। আজ আর ও নিজকে তেমন অসহায় ভাবে না। আনন্দ যেন সকলকেই চিন্তায় ফেলেছে। পুলিশ সাহেব প্রশংসায় গদ-গদ হয়েই মেডেল পরিয়ে দিলেন। বীরের সম্মান দিতে ইংরেজ জানে। তবু চরের এই সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দেখে মনে মনে একটু ভাবিতই হন উনি। রমেন্দ্র নারায়ণের ললাটেও চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। রামকান্তর মনেও নূতন করে ভাবনার উদয় হয়। সাপের গর্তে পা দিয়েই তাহলে ও এতদিন খেলা করেছে। আনন্দ তাহলে হাবা নয়। শক্তিহীনও নয়। অভাবেই তাহলে এ রকম পঙ্গু হয়ে আছে।...

যাদের ভাবনা তারা ভাবুক। গঞ্জের মানুষ আজ চরের মানুষের কাছে ঋণী। তাদের বীরত্বেই আজ সকলের মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়েছে। যে দই চিঁড়ে প্রতিযোগিদের খাওয়ার কথা ছিল তা দিয়ে চরের সকল মানুষকে পেট ভরে খাওয়াতে থাকে। শুধু দই চিঁড়েই নয়—রসগোল্লা, অমৃতি, লালমোহনও। গঞ্জের বাজারে সেদিন যা যা তৈরী ছিল তার সবটুকু দিয়েই চরের মানুষকে আপ্যায়ন করতে চেষ্টা করে ওরা। ক্ষতি রহিমুদ্দীন খলিফারই বেশী হয়েছে। কাপড়ের থান বলতে একটিও নেই। সেলাইয়ের কল দুটিও বৈঠার আঘাতে ভেঙে চুরমার করে রেখে গেছে। তবু আনন্দ লাঠি ঘুরিয়ে পুরো দু'খান কাপড় উদ্ধার করেছে। লাঠির বাড়িতে হাতও ভেঙে দিয়েছে তিন চারটে লুটেরার।

আলস্যে আলস্যে দিন কাটছিল না চরের মানুষের। এখন প্রবল একটা উত্তেজনার মুখে দিন বেশ অনায়াসেই গড়াতে থাকে। গঞ্জের মানুষের কাছে চরের মানুষের খাতিরই এখন আলাদা। যে দোকানী কোনদিন এক পয়সার নুন ধার দিতে রাজী হয়নি সে এখন অনায়াসেই দু'এক টাকার সওদা ধারে দিয়ে দেয়। আনন্দ বাজারে এলে তো পান বিড়ি তামাক খেয়ে কূলই পায় না

ঐ তো সামান্য একটা মানুষ কিন্তু কি অসুরের শক্তি বাহুতে! ছোটদের অনেকে এসে আনন্দর বাহুর পেশীতে হাত বুলাতে থাকে। আনন্দর হাসিই পায়। দু'চারটি শিষ্যও জুটে যায় ওর। না না, ওরা শুনবে না। লাঠিখেলা ওদের শেখাতেই হবে। আনন্দ বারকয়েক আমতা আমতা করেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়। গঞ্জের মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে প্রীতির সম্পর্কে।...

॥ ২৫ ॥

রথ দেখে আর গঞ্জ রক্ষা করে চরের মানুষের আলস্যের দিনগুলো কেটে যায়। আসে পাট কাটার মরশুম। ভাদ্রের মাঝামাঝি আবার ওরা কাস্তে হাতে মাঠে নামে। চরময় কোথাও কোমর জল, কোথাও বুক জল। কিন্তু জলের ভয়ে ওরা কেউ ভীত নয়। ওদের ভয় পাটের দর নিয়ে। রথের মেলায় বাছ পাট যে দরে বেচে এসেছে গঞ্জের বাজারে অন্যান্য অঞ্চলের গাছ পাটের দরই সে পর্যায়ে ওঠেনি। পাটের বাজার একেবারেই ভোঁভোঁ। রেলি ব্রাদার্স এবার আপিসই খুললে না গঞ্জে। পূর্ণ পার্সেজার নারায়ণগঞ্জে শুধু শুধুই দৌড়ঝাঁপ করলেন।....মাঠে পাট কাটতে নেমে চরের মানুষের মনে স্বস্তি নেই। অনিশ্চিয়তায় বুক দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। দশ বারো টাকায় যদি গাছ পাট বেচতে হয় তা হলে তো ভরাডুবি নিশ্চিত। মহাজনের ঋণ শোধ তো দূরের কথা বছরের খাবার যোগানোই দায় হবে। নিতাই সা'র কি, গোঁফে তা দিয়ে দিব্যি বলে যাচ্ছে, পাটের দর নিশ্চিত বাড়বে। চাষীদের উচিত কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকা...কিন্তু সে তো আর নিজে এক ছটাকও পাট কিনছে না। কিংবা দর না উঠলে সুদের কড়িও মাপ দিচ্ছে না। তবে আর তার কথার মূল্য কি? ফি দিলে ডাক্তাররাও তো নাভিশ্বাসের রোগীকে ওরকম আশ্বাস দিয়ে থাকে। এ তো সবই ওদের নিজ নিজ ব্যবসার কথা। চাষীর দুঃখ বুঝবে কে? চটকলের মালিক তো সবই বিদেশী। রাজ্যের শাসন ভারও ওদেরই। নিতাইয়ের সাধ্য কি মাথা তোলে। সে তার নিজের টাকা চাপ দিয়ে সুদে-আসলে আদায় করে নিতে পারবেই। মরতে মরবে শুধু চাষী।... কাজে হাত ওঠে না চরের মানুষের। তবু সময়মতো পাট না কেটে উপায় নেই। খালি মাথায় এক বুক জলের ওপর দাঁড়িয়ে হতাশা আর আশংকার মধ্য দিয়েই কাটতে থাকে পাট। চরের চাষ নাবী হয়েছে তাই। নয়তো অন্যান্য

অঞ্চলের পাট এরই মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হতে শুরু হয়েছে। চারদিকের ফসলও খুব ভাল হয়েছে এবার। চাহিদা থাকলে বত্রিশ সালের চেয়েও বেশী দর ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কে জানে, হয়তো নিতাইয়ের কথাই সত্য হবে। কলওয়ালারাই সব এককাট্টা হয়ে বাজার উঠতে দিচ্ছে না। মতলব হয়তো ঐরকমই একটা কিছু হবে। পাটের সঙ্গে চাষীকেও কলে পেষাই করে ফেলতে চাচ্ছে ওরা। কিন্তু দম ধরে বসে থাকা আর চাষীর কর্ম নয়। শতকরা নিরানব্বুই জনই তো হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছে।

চাষী অনেক কিছুই বোঝে—ভাবে কিন্তু দম ধরতে পারে না। এক এক করে কাটা, জাগ দেওয়া, ধোলাই, বাছাই, শুকানো শেষ করে ফেলে। নগদা-নগদি বেচে মাঠের কড়ি হাতেও নেয় কেউ কেউ। যে পারে কিছুদিনের জন্য গোলাজাত করে রাখে। পাট নয়তো যেন সোনার ছিলকাই এক এক গাছা। এ রকম সরেস পাট গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে গঞ্জে ওঠেনি। চরেও এর আগে কোনদিন এত ভাল পাঠ জন্মায়নি। না না, কিছুতেই ওরা এ রকম মাটির দরে সোনার ছিলকা হাতছাড়া করবে না। দর নিশ্চয় বাড়বে। সব কলওয়ালাদের বজ্জাতি। প্রয়োজন হয় উপোস দিয়ে মরবে তবু মা লক্ষ্মীকে দু'পায়ে ঠেলে বাড়ির বার করবে না। না না, কিছুতেই না।....মোড়লরা সকলে একত্র বসে সল্লা করে। ফড়েরা উস্‌কাতে এলে গালাগাল দিয়ে ভাগিয়ে দেয়।... গোটা ভাদ্র মাস পার হয়ে যায়, কেউ এক ছটাক পাটও বেচে না। লাভ তো দূরের কথা এ দরে বেচলে খরচাই উঠবে না। কি ভুলই না করেছে সকলে ধানের জমিতে পাট বুনে। এতগুলো মাথা, একজনও যদি পরিণাম ভাবতে পারতো।...রবিশস্য ক্ষেতেই নষ্ট হয়েছে। পাট বুনে আশায় আশায় হাতের সর্বস্বও বেচে খেয়েছে এ ক'মাসে। এখন হয়তো হাঁড়িই চড়বে না। ওদিকে আবার নিতাইয়ের দলও সমানে আনাগোনা শুরু করেছে। আসল না হলেও সুদের কড়ি ওদের চাই-ই। না, পাট চাষীর এবার নিশ্চিত মরণ।...

ভাদ্র পার হয়ে আশ্বিন এসে পড়ে। পূজো আর ঈদের পরব এবার পাশা-পাশি পড়েছে। খাবার ঘরে থাক আর না-ই থাক পাল-পার্বণের বাড়তি খরচা যোগাতেই হবে। আর না হোক উৎসব দিনে ছেলেপুলের পোষাক-আষাক চাই-ই। বাংলার জাতীয় উৎসব এ দুটি। সারা বছর এ দুটি দিনকে কেন্দ্র করেই বাংলার মানুষ দিন গুণতে থাকে। দীনু আর পলানের ব্যাপার তো আরো সঙ্গীন। ঈদের পার্বণে পলানকে অনেকেই দিতে-থুতে হয়।

গাঁয়ের গরীব-গরবারা ওর মুখের দিকেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। দীনুর অবশ্য দান-ধ্যানের তেমন বরাদ্দ নেই। কিন্তু লক্ষীপুজোর ভাবনা বড় একটা কম নয়। দু'বছর থেকে তো আবার কবি গান শুরু হয়েছে। নিমন্ত্রণের ঘটাও বেড়েছে। এছাড়া কাল অশৌচ কেটে গেলেই বিয়ের ধুম লাগবে। পাকা ফলারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে। সব কিছুতেই চাই এক কাঁড়ি টাকা।…চিন্তায় চিন্তায় দয়াল চানের আসরও আর তেমন জমছে না। লোভে পড়ে পাট বুনেই সর্বনাশ হলো।…

ভাদ্রের ভরা বর্ষা। বংশী ধলেশ্বরী কানায়-কানায় ফুলে উঠেছে। করিমের দাওয়ার ওপর বসে তিন মোড়ল হুঁকো খাচ্ছিল আর দুর্দিনের কথা ভাবছিল। সহসা দেখা যায় একখানি ঘাষী নৌকা এসে ঘাটে লাগছে।

কে ও নিতাই সাজি না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো ছৈয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন সাজি মশায়, পলান তাড়াতাড়ি হুঁকোটা বেড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে অভ্যর্থনা করতে ওঠে। দীনু করিমও সঙ্গে যায়।

নিতাই ততক্ষণে নৌকোর ওপর থেকে পাড়ে নেমেছে। ছুটে গিয়ে অভ্যর্থনা করে ওরা। সকলে মিলে ফিরে আসে আবার দাওয়ার ওপর। করিম একটা জলচৌকি এনে নিতাইকে বসতে দেয়। দীনু এক কল্কে তামাক সেজে তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরে। জল-ছাড়া হুঁকো। জল-ভরা হুঁকোয় তামাক খেতে গঞ্জের বাবুদের আপত্তি আছে। ওতে নাকি তাদের জাত যায়।

হুঁকো হাতে নিতাইকে প্রসন্নই মনে হয়। সামনেই রয়েছে মাচার ওপর গাদা-করা পাট। গোধূলির আবীর রাগে জলজল করছে সোনার ছিলকা। নিতাই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই শুধোয়, পাট বেচলেন না আপনারা?

প্রশ্ন শুনে পলানের ইচ্ছে করে সুদ-খোরটার মাথায় বাঁশ মারে। পাট বেচবো কেন, তুমি না বলেছিলে দর উঠবে! এখন উঠছে না কেন দর? খুব তো মানুষকে লেলিয়ে দিয়েছিলে পাট বুনতে। এখন সুদের কড়ি না নিলে তো বুঝি বাপের বেটা…

রাগ যতোই হোক মনে মনেই তা চাপতে হয়। টাকা লাগাবার জন্য একদিন নিতাই ওদের গদীর ওপরে বসিয়ে খাতির করেছে—ঘন ঘন তামাক খাইয়েছে। সেদিন যেন নিতাই-ই ছিল ওদের কৃপার পাত্র। ওরা দয়া করে টাকা নিলে ওর ব্যবসা চলবে—সিন্দুক ফাঁপবে। কিন্তু অবস্থা এখন উল্টে গেছে। এখন ওর দয়ার ওপরেই নির্ভর করছে ওদের মান-সম্ভ্রম—মরা-বাঁচা। পলান

মেজাজ খাদে নামিয়েই উত্তর করে, না, বেচবার আর পারলাম কই। ই দরে বেচলে ত মইরা যামু।

আপনাদের না হয় না বেচলেও চলছে কিন্তু ছোটদের চল:বে কি করে, নিতাই আবার প্রশ্ন করে।

ছোট বড় হগলের অবস্থাই এক। পাট বেচবার না পারলে আর মান থাকব না, পলান খেদের সঙ্গেই উত্তর দেয়।

নিতাই বলে, হ্যাঁ, রকম-সকম যা দেখছি তাতে আধা-আধি পাট আপনাদেরও বেচে ফেলা উচিত। শেষ বাজারে যদি দর বাড়ে তাহলে বাকী অর্ধেকেই পুষিয়ে যাবে।

উত্তরে দীনু বলে, দর বাড়নের কতা ত আপনে কবে থেকাই কইয়া আসচেন। আমাগই কপাল মোন্দ, দর আর বাড়ব কবে।

এই দেখুন, আজো ঢাকা পঞ্চায়েতে কি লিখেছে। জাপান তো পাট কিনবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজ তাদের বাজারে নামতেই দিচ্ছে না। নিজেদের বেলায় শুল্ক নেই, ওদের বেলায় মোটা শুল্ক দিতে হবে। এ রকম একচোখো ব্যাপার হলে আর বাইরের ক্রেতারা আসবে কি করে, হাতের কাগজখানা উল্টে পাল্টে সংবাদটা বার করতে ব্যস্ত হয় নিতাই।

ক্যা, ও হালারা নিজেরাও কিনব না আবার বাইরের মাইষেরেও কিনবার দিব না ক্যা!—সংবাদ শুনে ফুঁসে ওঠে পলান।

হাসতে হাসতেই নিতাই মন্তব্য করে, সেখানেই তো মজার ব্যাপার। জাপানের সঙ্গে সমানে কল চালিয়ে ওরা পাল্লা দিতে পারবে না। উৎপন্ন মাল জাপান যে দরে বেচবে ইংরেজ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।

তয় ত দেখচি ও হালারা ডাকাইত। ইচ্ছামতো আমাগ কান ধইরা উঠাইব নামাইব। আগে জানলে কোন সব্বুদ্ধি পাট বুনত, পলানের মেজাজ সপ্তমে ওঠে।

আর বলেন কেন। দেখছেন না, এখানকার যত পাটকল সব ইংরেজের। রাজত্ব পেয়ে দুনিয়ার বাজার ওরা একলাই লুটতে চায়। তবে ভরসার কথা, লীগ অফ নেশনে কথাটা উঠেছে। হয়তো একটা কিছু গতি হবে।

আর হালার গতি। আমরা মরলে যদি কোন গতি অয়। আগে জানলে বাইচের দিন ও হালার ইংরাজ পুলিশ সাবরে আমরা গাঙের মধ্যেই চুবাইয়া মারতাম, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পলান।

যা বলেছেন—বলেছেন! ওরকম কথা মুখেও আনবেন না। পুলিশের কানে গেলে বুড়ো বয়সে টানা-হেঁচড়ায় পড়বেন, কথাটা চাপা দিতেই চেষ্টা করে নিতাই।

হ, ও হালারা আমাগ ভাতেও মারব আবার জানেও মারব, মাথায় হাত দিয়ে বসে পলান।

কি করবেন, সবই অদৃষ্ট। খোদার কাছে নালিশ জানান, তিনিই এর বিচার করবেন।

নিতাইয়ের সান্ত্বনায় পলানের চোখ মুখ দিয়ে ঠিকরে আগুন বেরুতে চায়। মুখে কোন উত্তর করতে পারে না। করিম অবস্থার মোড় ঘোরায়, নায়ে আর কে আচে, সিদা-পত্রের ব্যবস্তা করি।

নিতাই বাধা দেয়, না না, ও সবের কোন দরকার হবে না। আমি কোথাও তাগাদায় বেরুই নি। 'পঞ্চায়েৎ'খানা পড়ে ব্যাপার বেশী সুবিধের মনে হলো না বলে বেড়াতে বেড়াতে একবার খবর দিতে এলাম। আমার বিবেচনায় পাট প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বেচে ফেলা উচিত।

এতক্ষণ দম ধরে থেকে দীনু এবার ফেটে পড়ে, হ, আপনে ত সব সময় আমাগ বালো পরামশ্যই দ্যান। এহন ই দরে পাট বেচলে নিজেরাই খামু কি আর আপনারেই বা দিমু কি?

আমার জন্য আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। পূজো-পার্বণ এসেছে, কিছু বেচে কিনে নিজেদের ঘর সামলান। আমাকে যখন পারেন দেবেন। নিতাইয়ের কথার মধ্যে যেন অমৃত ঝরে পড়ে।

বাড়ি বয়ে এসে পাওনাদার কখনো এ রকম বলে! নিতাই সাজি সত্যি সত্যিই মহাজন। অতটুকু মান-অহংকার নেই! বিস্ময়ে কেউ আর মুখ খুলতে পারে না।

সুযোগ বুঝে মিতাই পুনরায় নিজের কথার জের টানে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করুন। আমার ঘরেও ছেলেপুলে আছে—আমি সব বুঝি। আচ্ছা, উঠি তাহলে এখন।

করিম এবার আর মুখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। সবিনয়ে বাধা দেয়, না না, খালি-মুখে যাইবার পারবেন না। একটা কিছু মুখে দেওয়ন লাগব।

ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। সুদিন আসুক পেট ভরে খেয়ে যাবো। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে বেরিয়েছি এখন কিছু মুখে দিতে পারবো না।

উত্তর শুনে করিম আর জোর করতে সাহস পায় না। তাছাড়া ঘরে আছে কি যে তাই দিয়ে নিতাইয়ের মতো লোককে অভ্যর্থনা করবে। রাজী হলে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছুই দিতে পারবে না। বড় জোর গাই দুইয়ে খানিকটা টাকটা দুধ। সেই ভালো, আর একদিন না হয় যোগাড়-যন্ত্র করেই খাওয়ানো যাবে। এখন সঙ্গে গোটাকয়েক আক দিয়ে দিলে মন্দ হয় না। বাড়িতে ছেলেপুলেরা খেতে পারবে। হাত জোড় করে প্রকাশ্যে নিতাইয়ের কথার জবাব দেয় করিম, তাইলে ত আর জোর দেখাইবার পারি না। আইচ্ছা, আর-এক কইলকা তামুক খান, আমি একডু আহি। দীনু তামাক সাজতে আরম্ভ করলে করিম ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়। পেছনের উঠোন থেকে ঝটপট আট-দশ-খানা বাছাই দেখে আক কেটে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে।

নিতাই দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে, এগুলো আবার কেন

ঈষৎ হেসে করিম বলে, সামান্য গোটাকতক কুশইর পোলাপানের খাইবার লেইগা বুনচিলাম। লইয়া যান, বাড়ির ছাওয়াল পাওয়ালরা খুশী অইব।

আচ্ছা, দিন তাহলে, হুঁকোটা দীনুর হাতে এগিয়ে দিয়ে নিতাই উঠে দাঁড়ায়। নিজেই আক ক'খানা হাতে করে তুলে নিতে যায়।

করিম জিভ কেটে বাধা দেয়, ছি ছি ছি, আপনে ক্যান বইয়া নিবেন! চলেন নায়ে দিয়া আহি।

নিতাই মনে মনে তাই চেয়েছিল। খাতকের বাড়ি থেকে সামান্য ক'খানা আক হাতে করে বেরুতে ওর সম্ভ্রম বাধছিল। সুতরাং আর কথা বাড়ায় না।

পল্লান, করিম, দীনু এক সঙ্গেই উঠে গিয়ে নিতাইকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসে। যেতে যেতে কথা হয়—কিছু পাট ওরা সামনের হাটেই বেচে দিচ্ছে। এযাত্রা আর কিছু দিতে পারবে না। পারে তো বাকী পাট বেচে সুদের টাকা সম্পূর্ণই দিয়ে দেবে। আর যদি তা না পারে তাহলে সুদে আসলে তমসুক পালটে দেবে।

আকের সঙ্গে অযাচিতভাবে আসল কথা শুনে নিতাই আশাতীত খুশী হয়। গদগদ হয়েই নৌকোয় গিয়ে ওঠে।

॥ ২৬ ॥

নিতাইয়ের পরামর্শ মতো পাট বেচে ঈদের নিয়ম রক্ষা করে পলান। যাকে যা দেবার রীতি আছে তা দিয়েছে। এক কথায় সবই হয়েছে। শুধু হয়নি অনাবিল আনন্দ লাভ। শংকায় বুক দুরদুর করে কেঁপেছে। এখনো জের চলেছে তার। না, পাটের দর আর এ বছর বাড়বে না। ঘরের পাট ঘরেই থেকে যাবে। নিতাই সাজিকে তমসুক বদলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওসমান বলে, আংশিক জমি বেচে দেনা শোধ করে দাও। বেটা একটা আস্ত পাগল। জমি বেচলে খাবি কিরে মুখ্যু! সংসারে ধার দেনা কার না আছে। তাই বলে কথায় কথায় অন্নদাত্রী মাকে বাজারে বিকিয়ে দিতে হবে!··· না না, তা হতে পারে না। নসিবের ফের যদি কাটে তা হলে মুগ কলাই বেচেই ও সুদের কড়ি শোধ করা যাবে। বাকীটা সামনের সন পাট বেচে। সুদে অবশ্য অনেকটা বাড়বে। কিন্তু তা আর কি করা যাবে। বিনা সুদে তো আর কোথাও কর্জ পাওয়া যায় না। নিতাই সাজি তো বেশ ভাল ব্যবহারই করছে।···

দীনুও পলানের মতোই লক্ষ্মীপুজো সারে। আসল তো দূরের কথা একটি সুদের কড়িও শোধ করতে পারেনি। কবি গান দেবার ইচ্ছা এবছর একেবারেই ছিল না। কিন্তু পাকে চক্করে শেষ পর্যন্ত রেহাই পাওয়া গেলো না। কালী কবিয়াল আঁটালির মতোই লেগে রইল। মা লক্ষীর আসরে গান না গাইলে নাকি ওর গোটা বছরটাই মাটি হবে। তা অবশ্য নগদ পয়সা একটিও দিতে হয়নি। শুধু তিনদিনের খোরাকি আর নৌকো ভাড়া। যাক গে, সবসুদ্ধ বড় জোর কুড়ি-পঁচিশটে টাকা গেছে। মা লক্ষ্মীর দয়া হলে ওতে আটকাবে না। ঘরের কোণে নতুন কুটুম রয়েছে, গান বন্ধ করালে ওরাই বা ভাবতো কি। চরের মানুষেরও বছরের আনন্দ উৎসবটা মাটি হতো।···কিন্তু খরচার তো আর এখানেই শেষ নয়। লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত শুরু হবে ভাগবত পাঠ। পুণ্যাহে অষ্টপ্রহর নাম-সংকীর্তন—মহোৎসব। চরণ দাসজী আবার তীর্থে যাচ্ছেন। বাকী জীবন বৃন্দাবন আর নয়তো মথুরায়ই কাটাবেন। সুতরাং এই শেষবার ওঁকে নিয়ে মহোৎসব করা। আর কিছু বাদ গেলেও এ উৎসবকে

বাদ দেওয়া যাবে না। এর পর আছে, সকল দায়ের সেরা দায় নিশির বিয়ে। মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চাইলেই রক্ষা নয়তো অনিবার্য মৃত্যু।…

একে একে কোনরকমে সবই মিটে যায়। দীনুকে সবটা পাটই বেচতে হয়েছে। পার্বণ শেষ করেও পলান আর করিমের হাতে আধা-আধি পাট থেকে যায়। একদিক দিয়ে বিচার করলে ভালই করেছে দীনু। পাটের দর এখন আরো এক টাকা কম। কিন্তু হলে কি হবে হাত একেবারেই শূন্য। নতুন বউ হয়ে ময়না ঘরে এসেছে। খাওয়া-পরায় কষ্ট দেখলে কুটুমের কাছে মান ইজ্জত থাকবে না। নিতাইয়ের কাছে না হয় তমসুক পাল্টে দিয়েই রেহাই পাওয়া গেছে। তিন শ টাকার জন্য সুদে-আসলে মূল দলিল গিয়ে সাড়ে পাঁচ শ'তে দাঁড়িয়েছে। খুচরো আরো কয়েক টাকা হয়েছিল কিন্তু নিতাই খাতির করে তা নেয়নি। সুদের হার সমানই থেকে গেলো। থোক দু'পাঁচ টাকা খাতির করতে রাজী নিতাই কিন্তু সুদের হার কমাতে পারবে না। তা না পারলে আর করার কি আছে। একটা পয়সাও ফিরে না পেয়ে যে শুধু কাগজ লিখিয়ে নিয়ে শান্ত আছে এইটেই ভাগ্য। চেঁচামেচি শুরু করলে তো চরে মুখ দেখানোই ভার হতো। ছেলের বিয়েতে পাকা ফলার খাইয়ে যে দেনার জন্য তাগাদা শোনে তাকে আবার পোঁছে কে। এখন মুগ কলাই ঘরে উঠলেই জাত বাঁচবে, নয়তো বরাতে কি আছে বলা যায় না। একদিক দিয়ে রক্ষা, চাল ডাল ঘরে আছে। টেনেটুনে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত চলে যাবে। নগদ টাকা একেবারেই হাতে নেই। তা কোন বিপদ-আপদ না ঘটলে ওতেও আটকাবে না। ঘরে গরুর দুধ আছে। সাক-সব্জিও ক্ষেত থেকেই পাওয়া যাবে। মাছের তো ভাবনাই নেই। শুধু তেল, নুন, আর মসলাপাতি। তাতেও আটকাবে না, চলে যাবে একরকম করে। ঠেকলে গঞ্জের বুধাই মুদীর দোকানে ধার পাওয়া যাবে।…নিশ্চিন্তে না হলেও দিন একরকম করে কাটতে থাকে দীনুর।

কিছুদিন পর পলান করিমও অবশিষ্ট হাতের পাট বেচে দেয়। না দিয়ে উপায় নেই। বৃহৎ সংসার—ধান চাল সব কিনে খেতে হচ্ছে। কম হোক বেশী হোক একমাত্র পাটই তো সম্বল। আশায় আশায় দেরি করে মিছিমিছি শুধু ঠকাই সার হলো। কি আহাম্মকই না হয়েছে ধানের জমিতে পাট বুনে। পলান সুদের একটা কানা কড়িও শোধ করতে পারে না। দীনুর মতোই সুদে আসলে তমসুকটা পাল্টে দিতে বাধ্য হয়। তিন হাজার টাকা সাড়ে পাঁচ

হাজারে দাঁড়ায়। চরের সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। একমাত্র করিমই যা ব্যতিক্রম। বাড়তি খরচা বিশেষ না থাকায় সুদের টাকাটা সম্পূর্ণই দিতে পেরেছে করিম। প্রথম মরশুমে পাট বেচলে আসল টাকাও কিছু দিতে পারতো। কিন্তু কি আর করবে। বরাত মন্দ, তাই সুদখোরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না।

প্রতিবারই জলে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীনবোট নিয়ে কাছারি ছেড়ে চলে যান রমেন্দ্রনারায়ণ। কিন্তু এবার কার্তিকের বদলে অঘ্রান পার হতে চললো কাছারি ছাড়বার নাম নেই। পিয়ারের চাকর হরিকে জিজ্ঞেস করলে বলে, কুমার বাহাদুর এবার আর সদরে ফিরবেন না। কে জানে, হবেও হয়তো। অন্তপর দূরের কথা স্বয়ং রাখালই যখন কিছু জানে না তখন আর কথা কি। আগে হলে রামকান্ত খুশীই হতো। দিব্যি পরের পয়সায় আড্ডা ইয়ার্কি খাওয়া বেড়ানো। কিন্তু এবার ও এসব চায় না। মধুর রয়েছে দু'শ টাকা ঋণ। তার ওপর দুর্গাও নিয়েছে দেড় শ টাকা। সুদের হার কম হলেও কষে দেখলে মোটা অঙ্কই হবে। একে জলের দরে পাট বেচতে হয়েছে। তার ওপর আবার ময়নার বিয়েতে দ্বিগুন খরচা হয়েছে, দুর্গার হাত একেবারেই খালি। আসল তো দূরের কথা সুদ বাবদও একটা ফুটো পয়সা দিতে পারেনি ও। কখন যে কি হুকুম হবে কে জানে। দিন-রাতই তো জপের মালা হয়েছে দুর্গা। সেদিন স্নানের ঘাটে দেখে অবধি পাগল হয়েছেন। মিথ্যা বলে বলে না ঠেকালে এদ্দিন হয়তো জুলুমবাজী আরম্ভ হয়ে যেতো। তা আর কুমার বাহাদুরেরই বা দোষ কি। ও আগুনের শিখা দেখলে কে না পাগল হবে। ভুল নিজেই করেছি। মাথা খাটাতে পারলে টাকা কড়ির প্যাঁচে না জড়িয়েও দুর্গাকে হাত করা যেতো। টাকা ধার পেতে ওর অতটুকু আটকাতো না। দীনুই ব্যবস্থা করে দিতো…রমেন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে ভয় ভাবনা রাখাল বিকাশেরও আছে। কিন্তু রামকান্তর মতো এমন বিপদ বোধ হয় ওদের কারো নয়। জালে মাছ আটকিয়ে যদি তা চিলকেই খাওয়াতে হয় তবে আর সে মাছ ধরে লাভ কি।…চিন্তায় চিন্তায় রামকান্ত বুঝি বা পাগল হয়ে যায়।

॥ ২৭ ॥

মাঘ মাস। প্রচণ্ড শীত পড়েছে এবার। চরের মানুষের সম্বল মাত্র ছেঁড়া কাঁথা কম্বল। পাটের বাজার ভাল গেলে হয়তো নতুন কিছু কিছু কিনতে পারতো। এখন তো দোকান-মুখো হবারও উপায় নেই। জামা-কাপড় অপেক্ষা পেটই ওদের দিন দিন কাবু করে ফেলছে। জীবনে বহু শীত ওরা আগুনের আলসে সম্বল করে কাটিয়ে দিয়েছে। পেট যদি ভরা থাকে তাহলে একটুও আটকায় না। কিন্তু সেই পেটেই যে খিল পড়ছে। মায় তামাকটুকু পর্যন্ত জুটছে না। তবে আর শীত ঠেকাবে কি দিয়ে। এখন একমাত্র ভরসা রবি-শস্য। চরের জমিতে মা লক্ষ্মীর পদ-রেণু রয়েছে। বীজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চারা ফনফনিয়ে বাড়ছে। মুগ, কলাই, যবের বাড়তিই বেশী। এরই মধ্যে কোন কোনটায় গুটি দেখা দিয়েছে। গরু ছাগল তাড়িয়ে রাখতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। ধার শোধ না হোক খেয়ে-পরে পাট চাষের কড়ি হাতে থাকবেই।···মনে মনে ইষ্ট দেবকে ডাকে চরের মানুষ। প্রাণ খুলে নামকীর্তন করে—দয়াল চানের আসরে জমায়েত হয়। অসময়ের জল-ঝড়ে গত সন সমস্ত নষ্ট হয়েছে। ঠাকুর যদি এবার রক্ষা করেন।

দীনু শুধু মুগ কলাই আর মটরের মধ্যেই ক্ষেতের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেনি। কয়েক বিঘা জমিতে খিরাইও (এর প্রকার শসা) বুনেছে। কুমড়ো, তরমুজ, বাঙি (এক প্রকারের খরমুজা) ক্ষেতও করেছে কয়েক বিঘা জুড়ে। মোড়লের দেখাদেখি চরের প্রত্যেকেই এবার কিছু না কিছু জমিতে ফলমূলের চাষ করেছে। রাঙা আলু আর গোল আলুর চাষও করেছে অনেকে। পলানের কাছে তো এসব সাবেকী ব্যাপার। শুধু চাষের আয়তন একটু বেড়েছে এই যা। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলন বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। দয়াল চানের দয়া হলে দুঃখ হয়তো ঘুচবে।···

আনন্দ আর এখন সে আনন্দ নেই। এখন আর ওকে কেউ কুঁড়ে কিংবা নিষ্কর্মা বলতে পারবে না। সারাদিন ক্ষেতের কাজে খাটে। যদি কোন কাজ হাতে না থাকে তা হলে বসে বসে জাল বোনে। তবু বসে থাকে না। তবে

পেটের ব্যাপারে অতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং খোরাকি আগের চেয়ে বেড়েছে। তা বাড়ুক, দিদি ভাইয়ের সংসার—ওতে আটকাবে না। তাছাড়া খাওয়ার মধ্যে আছেই বা কি। শুধু তো দুটো চাল আর একটু নুন। পোষাকী খাওয়ার মধ্যে জোটে খাঁটি একটু গরুর দুধ ও কিছু কিছু ক্ষেতের ফল-ফলাদি। ওতেই সন্তুষ্ট ওরা। ধার দেনা না থাকলে কেউ ওদের মুখের হাসি কেড়ে নিতে পারতো না। কি সর্বনাশই না করেছে ধানের জমিতে পাট বুনে। রাতারাতি বড়লোক হতে গিয়ে রাতারাতি গরীব বনে গেলো। এখন তো পর পর জুয়ো খেলে যাওয়া। পাট চাষের দেনা একমাত্র পাট বুনেই শোধ হতে পারে। অবশ্য যদি দর ওঠে। এ ছাড়া এককালীন এত টাকা হাতে আসা আর কোন কিছু থেকেই সম্ভবপর নয়। সুদখোরের হাড়িকাঠ থেকে যতদিন না মাথা টেনে আনতে পারে ততদিন নিষ্কৃতি নেই। আনন্দর মতো সহজ সরল মানুষের পক্ষেও এ সত্য বুঝে উঠতে দেরি হয় না। ভাবনায় দুর্গার দু'চোখে ঘুম নেই।...

ভগবান যখন দেন ছপ্পর ফুঁড়েই দেন। ফল মূল তরি-তরকারি থেকে অতি সহজেই চরের মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো নুন ভাত খেতে পারছে। পলান দীনু করিমও বড় বাঁচা বেঁচে খায়। মুগ কলাই ঘরে উঠতে এখনো ঢের বাকী। এগুলো ছিল বলেই রক্ষা। গঞ্জের বাজারও এবার বেশ টান যাচ্ছে। পাট বুনে যদি জমি নষ্ট না করতো তাহলে এগুলো বুনেও দায় মুক্ত হতে পারতো। কিন্তু করার কিছু নেই, সবই কপালের গেরো।

চৈত্রে মুগ মটর কলাই ঘরে ওঠে। খাসা তকতক্ করছে রং। আর কোন ভয় নেই। দয়াল হরি বিপদে ফেলেছিলেন দয়াল হরিই আবার রক্ষা করছেন। অন্যান্য অঞ্চলের আগে চরের ফসলই এবার গঞ্জের বাজারে যাবে। চরের ফসল দিয়েই হবে প্রথম সাইদ। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে ঝেড়ে পুঁছে গোলায় তোলে মা লক্ষীর আশীষ কণা। গৃহলক্ষীরাও আলাদা করে উঠিয়ে রাখে ভোগ রাগের জন্য। এরই মধ্যে ফড়েদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। না, এখন সব বেচে বরাত খারাপ করবে না। পাটের বাজার যখন মন্দা গেছে তখন এসব জিনিষের দাম চড়া যাবেই। চারদিক জুড়েই তো পাটের চাষ হয়েছে। বেশীর ভাগ জমি পাটেই গিলে খেয়েছে। এসব বুনবার মতো জমি কোথায়? তার প্রমাণ তো ধান চালের দর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। তরি-তরকারির বাজারও বেশ টান গেলো। না, দেখেশুনে ধীরে-সুস্থে বেচতে

হবে। পাটের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করতে হবে মুগ কলাই যবে…আশায় আশায় স্বপ্নজাল বোনে চরের মানুষ।

রমেন্দ্রনারায়ণ সমস্ত ঋতুই গঞ্জে থেকে গেলেন। কেন রইলেন সে খবর কেউ রাখে না। কাছারির কাজে বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রাখালকে এ নিয়ে প্রায়ই ভ্রূ কুঁচকাতে দেখা যায়। ফুরসত পেলেই বিকাশের সঙ্গে টীকা-টিপ্পনী কাটে।

ওদিন বিকেলে হিসেবের খাতা খুলে আপন মনেই কাজ করছিল বিকাশ। কাছারিতে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। রাখাল নাকের ডগা থেকে নিকেলের চশমাটা কপালে তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে, দিনরাত অতো নাক ডুবিয়ে কি লিখছ হে বিকাশ, ওতে হুজুরের মন পাবে না।

তা কি আর জানিনে দাদা, কিন্তু কি করবো, বরাতই যে মন্দ, হাতের কাজ বন্ধ করে বিকাশ উত্তর করে।

রাখাল মাত্রা চড়িয়ে পুনরায় বলে, আচ্ছা, দিনরাত ঐ ভট্‌চাযটার সঙ্গে ঘরে বসে কি করেন বলতো ?

কি আবার করবেন। বোতল বোতল মদ গিলছেন আর ফুসুর-ফাসুর করছেন।

শুধু নেশা-ভাঙই নয় হে, আরো কিছু রহস্য আছে এর ভেতরে। দেখছো না, ক্ষেন্তি ছিনালটা দিন দিন কেমন ঘুরঘুর শুরু করেছে। শুনলাম, চম্পি জেলেনীর ওখানেও বাবুর তিন চার দিন যাওয়া হয়েছে।

তা হলে তো বুঝতেই পারছেন, বাতাস কোনদিকে বইছে।

বইতে দাও হে বইতে দাও। সময়মতো সবই টের পাবে।

সে সুযোগ কি আর আসবে দাদা ?

জানেন নারায়ণ। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘর করছি। দিনরাত কাছারিতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হয়। বিনিময়ে কি পাও তাতো জানোই। বাবুর গোসা হলো চর বিলি করেছি বলে। কিন্তু এখন নিজে কি করছো যাদু! আমরা না হয় টাকাটা-সিকিটা নিয়েছি। কিন্তু আসলে চরটা গড়লে কে। কই, সে তারিফ তো একবারও করতে শুনিনে ? উল্টে ঝাল ঝাড়তে শুরু করেছেন। তোমাকে আমি বলে রাখছি বিকাশ, আমার নামও রাখাল গোসাঁই। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

দাঁড়াবে যে কোথায় সে কথা কি বুঝতে পারছেন না দাদা।

বুঝতে খুবই পারছি। কম সুদে টাকা লগ্নি হচ্ছে। এক কিস্তি আদায় না হতে আবার আর এক কিস্তি দেওয়া হচ্ছে। তুমি ভেবেছো এ সবের মানে আমি বুঝিনে?

বুঝতে আর পারছেন কই দাদা? সুদ যে দেবে, হে হে হে—

হেসে রাখালও ফেটে পড়ে, ধরেছ ঠিকই। তবে সেটি আর হচ্ছে না। ঐ যে বেটা ভট্‌চাযকে দেখছো, আসলে ও বেটা হচ্ছে একটি আস্ত খেঁকশিয়াল।

বলেন কি!

বলি ঠিকই। বাঘে মোষে লাগিয়ে দিয়ে মাঝখান থেকে ও বেটা জল খেতে চায়।

তা হলে উপায়?

উপায় আবার কি। যেমন চলছে চলতে দাও। সময়মতো এমন হেঁচকা টান দেবো বেটা পালাবার পথ পাবে না।

সহসা ভেতর বাড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যায়। বিকাশ ব্যস্তসমস্তভাবে বলে, চুপ করুন দাদা, ওরা বোধ হয় আসছে। দু'জনে চোখের পলক না পড়তে মুখ বন্ধ করে।

রমেন্দ্রনারায়ণ খানিক পরেই রামকান্তকে সঙ্গে করে কাছারির ওপর দিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে যান।

শীতের বংশী শুকিয়ে এতটুকু। বিরাট চর পড়েছে গঞ্জের এ পারে। জলে না ডোবা পর্যন্ত বেশীর ভাগ লোক হাটে-বাজারে চরের ওপর দিয়েই যাতায়াত করে। ঢাকা শহর থেকে মোটর চলাচলও শুরু করেছে চরের ওপর দিয়েই। উত্তরে শ্মশান থেকে দক্ষিণে ডাক-বাংলো পর্যন্ত সটান প্রশস্ত রাস্তা। স্বাস্থ্য-কামীরা সকাল সন্ধ্যা এ ক'মাস এ পথেই ভ্রমণ করবে। এ ছাড়া জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে আরো একটি পায়ে হাঁটা সরু পথ। বড় বড় নৌকোর মাঝিরা গুণ টেনে যায় ও পথে।

বসন্তে বংশীর কোল হিমশীতল। স্রোতে তর্জন গর্জনের লেশমাত্র নেই। শীতলপাটিই যেন পড়ে আছে একখানা। পশ্চিম দিগন্ত আবীর মাখামাখি। দিনের শেষ। দিনমণি পাটে বসেছেন। ঝিরঝির করে বইছে মলয় বাতাস। ভ্রমণকারীর সংখ্যা আজ একটু বেশীই। এতো হইচই রমেন্দ্রনারায়ণের ভাল লাগে না। ওপারের শান্ত পরিবেশ সহজেই মনকে আকর্ষণ করে। ধু ধু করছে

চর দিগন্তে! মাঝে মাঝে কলার ঝাড়ের ভেতরে ঢেউটিনের ঘরগুলো ছবির মতোই জ্বলছে। আবার খড়ের ঘরের বৈচিত্র্যও কম নয়। যবের ক্ষেতে সোনালী মায়ার সঙ্কেত। কোন কোন ক্ষেতের শস্য কেটে নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত পরিপূর্ণ। মৃদু বাতাসে হেলে দুলে নাচছে। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বৈচিত্র্যের সমারোহ। খেয়া পার হয়ে ওপারেই যান রমেন্দ্র নারায়ণ। সঙ্গে রামকান্ত। বৈরাগীর খাল ধরেই সোজা এগিয়ে যাবেন পশ্চিমে। মেঠো পথ সুন্দর নিরিবিলি। ভ্রমণে আমেজ আছে। তা ছাড়া··· কিন্তু রামকান্তকে তেমন উৎসাহী মনে হয় না। আসতে হয়েছে তাই ও এসেছে। নয়তো গঞ্জের সদর রাস্তাই ছিল বেড়াবার সুন্দর জায়গা।

বৈরাগী খালের উত্তর পার নিস্তব্ধ। গোধূলির আবছায়ায় মাঝে মাঝে শুধু রাখালগণকেই গোধন নিয়ে ছুটতে দেখা যাচ্ছে। চরের মানুষ এ সময় কেউ বড় একটা ঘাটে পথে থাকে না। মাঠের কাজ, ঘাটের কাজ শেষ করে এ ওদের বিশ্রাম নেবার সময়। তারপর কিছুক্ষণ জিরোবার পরে কিছু মুখে দিয়ে ছুটবে দয়াল চানের আসরে আর নয়তো নামগান করতে। যে না যাবে সে দাওয়ার ওপর বসে হুঁকো খাবে নয়তো ছেলেপুলের সঙ্গে গল্প গুজব করবে। বউ-ঝিরাও ঘাটের কাজ বেলাবেলিই সেরে নেয়। বেরুতে একটু দেরি হয়ে গেছে ভেবে রমেন্দ্রনারায়ণ ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দ্রুতই পা চালাতে থাকেন। তাছাড়া কিছুক্ষণ জোরে না হাঁটলে ভাল খিদে হয় না—খাবার নষ্ট হয়। ভ্রমণের প্রথম পর্বে তাই স্বাস্থ্য রক্ষার্থেই মন দেন। ভাল লাগে তো ফেরবার সময় গল্পে গল্পে ফেরা যাবে।···

রমেন্দ্রনারায়ণ দ্রুত ছুটলেও রামকান্ত তা পারে না। নিয়মিত ডাল ভাত খেয়ে অতো শক্তি কোথায় পাবে ও। বৈরাগীদের পাল্লায় পড়ে মাছ মাংস তো লুকিয়ে চুরিয়ে-খাওয়া। বেটারা নিজেরা দিব্যি কাঁড়ি কাঁড়ি মাছ গিলবে। শুধু ভাগবত পাঠকের বেলাই যা দোষ। আর ওদেরই বা দোষ কি। বেটা চরণ দাসটাই মাথা গরম করে দিচ্ছে সকলের। স্বয়ং চৈতন্যই যেন এসেছেন গঞ্জের আখড়ায়। কিন্তু কি আর করা যাবে, বরাত মন্দ। নিয়ম ভঙ্গ করলে চরে থাকা যাবে না। সব দিকেই হয়েছে জ্বালা। এত তোষামদ করে কি মানুষ কখনো বেঁচে থাকতে পারে? কোনদিকে যায় ও? দুর্গা—দুর্গা, দুর্গাই ওকে সকলের কাছে হেয় করছে। কিন্তু পাষাণী ফিরেও তাকাচ্ছে না একবার।·· চলতে চলতে দম আটকে আসে রামকান্তর।

পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছে হাঁটা থামান কুমার বাহাদুর। ছড়িতে ভর করেই ধলেশ্বরীর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। বিরাট চর। আলো আঁধারিতে ঝিক-মিক করছে শুভ্র বালুকণা। ধলেশ্বরী যেন নীল শাড়ীর পাড়ে লক্ষ কোটি চুমকীর সাজ পরেছে। বেশ লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। মনের খুশীতে রূপোর কেস খুলে একটা সিগারেট ধরান। রামকান্তকেও একটা দেন। অনেকক্ষণ পরে একটু চাঙ্গা হবার ফুসরত পেয়ে মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায় রামকান্তর। যা আশংকা করেছিল তা হয়নি। চরের কারো সঙ্গেই দেখা হয়নি। বেটারা কেউ পছন্দই করে না কুমার বাহাদুরের সঙ্গে মেলামেশা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত···

চরে সন্ধ্যা নামে। ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা শুরু হয়েছে। কোন কোন বাড়িতে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে। ধলেশ্বরীর বুকের ওপর দিয়ে ভাটিয়ালি গেয়ে চলেছে ছোট্ট একখানি ডিঙ্গি। বড় ভাল লাগে রমেন্দ্রনারায়ণের। নীরবেই বালুর ওপর বসে পড়েন। রামকান্তও পাশে বসে। সুরের মূর্ছনা অনুরণিত হতে থাকে চরময়—

ও রঙ্গিলা নায়ের মাঝি—
নিগুণ কথা কইয়া যাও শুনি।

গান দুর হতে দুরান্তে মিলিয়ে যায়। কৃষ্ণা একাদশীর ঘন অন্ধকার থমথম করতে থাকে চারদিকে। রমেন্দ্রনারায়ণ জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন কিনা বোঝা যায় না। রামকান্তর পক্ষে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়। ভাগবতের আসরে হয়তো এরই মধ্যে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে ধ্যান ভাঙায়, ফেরবার সময় কিন্তু হলো স্যার।

হ্যাঁ চলো। বড় ভাল লাগছে হে ভট্চায, উঠতে ইচ্ছে করছে না। রমেন্দ্রনারায়ণ উত্তর দেন।

রামকান্ত অধিকতর ভয় পায়। তবেই হয়েছে, রোজ রোজ এখন থেকে এখানে বেড়াতে এলে তো গেছি আর কি!···তবু সাহসে বুক বেঁধেই বলে, বেশ তো আর একটু না হয় বসুন।

না, চলো। তোমার আবার কীর্তনের সময় হয়ে এল, উঠে দাঁড়ান রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্তও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে। এবার আর দ্রুত নয়। হেলে দুলেই পথ চলতে থাকে। গল্পে গল্পে বৈরাগী ঘাটের মুখে এসে থমকে দাঁড়ায় দুজনে।

খালের মুখ থেকে বংশীর চর অনেকটা নীচু। স্নানের জন্য কোদাল দিয়ে মাটি কেটে ঘাট তৈরী করে দিয়েছে চরের মানুষ। ওকি! কলসী কাঁখে একটি স্ত্রীলোক উঠে আসছে না ঘাট থেকে! কে ও? চেনা চেনা বোধ হচ্ছে, রামকান্তর উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়।

দুর্গা সন্ধ্যার জল ভরতে বংশীর ঘাটে এসেছিল। সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাই এখন ওকে ছুটতে হয়। অন্য দিন বেলাবেলিই সব হয়ে যায়। আজ অসময়ে ক্ষ্যান্ত এসে গ্যাট হয়ে বসায় দেরি হয়ে গেছে। কি আর করা যাবে। নিজের বিবেচনায় উঠে না গেলে মানুষ মুখ ফুটে বলে কি করে। তাছাড়া যে রকম ঝগড়াটে। এই তো দু'দিন আগেও ঝগড়া গেছে, এখন আবার চলাতে শুরু করেছে। দুর্গাও অপ্রস্তুত হয়। দূর থেকেই উভয়কে চিনতে পারে। চাঁদির ওপরের ঘোমটা নাকের ডগা পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে রাস্তা দেয়। কাঁখের ওপরে মাজা পেতলের কলসীটা অন্ধকারেও ঝকঝক করতে থাকে।

রামকান্তর চিনতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না।

রমেন্দ্রনারায়ণের চোখের ওপর সহসা যেন একটি রঙিন প্রজাপতি পাখা মেলে এসে দাঁড়ালো। মনের কোণে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। একি সত্যি না স্বপ্ন! দুর্গা কি তাহলে ওকে দেখেই এই নিঝুম ঘাটে জল ভরতে এসেছে·· কি করবেন ভেবে পান না রমেন্দ্রনারায়ণ।

রামকান্ত বোবা হয়ে গেছে। একটি কথাও মুখ দিয়ে সরে না। সত্যিই কি ও দুগা! কই, এর আগে তো কখনো ওকে এ সময়ে জল ভরতে দেখা যায়নি। তবে কি···না না, হয়তো কোন কাজে আটকে গিয়েছিল। বেচারা কতক্ষণ ভরা কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে মুক্তি দেওয়া উচিত।··· রামকান্ত আর ভাবতে পারে না। সটান পার হয়ে আসে রাস্তা। ওর দেখা দেখি রমেন্দ্রনারায়ণও পার হয়ে আসেন। দুর্গা দম ফেলে তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে ছুটতে থাকে। ভরা কলসীর জল ছলকে পড়তে থাকে চলার ছন্দে। স্বর্গের উর্বশীই যেন মর্ত্যের নদীতে জল ভরতে এসেছিল। রমেন্দ্রনারায়ণ পথটুকু পার হয়ে এসেও চাতকের মতোই পেছন ঘুরে দাঁড়ান। দু'চোখে লোভাতুর দৃষ্টি।

দুর্গা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

রমেন্দ্রনারায়ণ মুখ খোলেন, তোমার সেই তিনি না ভট্চায?

রামকান্ত নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করে। তবু উত্তর না দিয়ে পারে না। কৃত্রিম রসান দিয়েই বলে, হুজুরের অনুমান সত্য।

খাসা মালটি পাকড়েছ হে ভট্‌চায। মধুতে যেন টৈ-টুম্বুর।

হুলের কথাটাও ভেবে দেখবেন হুজুর, মিটমিট করে হাসতে থাকে রামকান্ত।

রমেন্দ্রনারায়ণ বলেন, আনন্দটা গোঁয়ার না ? কিন্তু হুল আছে বলে কি মধু খাবে না রসিকজন ?

রামকান্তর ইচ্ছে করে ঠাস করে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসিয়ে দেয় বেহায়াটার গালে। কিন্তু ক্ষমতায় কুলোয় না। অবস্থা আয়ত্তে রেখেই পাশ কাটাতে চেষ্টা করে, দেখা যাক না, চারে মাছ পড়ে কিনা।

ও দেখাদেখির মধ্যে আমি নেই হে ভট্‌চায। যা করবে তাড়াতাড়ি করো।

হুজুর কি তাহলে পাইক-পেয়দা লাগাতে চান ?

প্রয়োজন হলে তা আমি লাগাবো। তবে তুমি কতদুর এগিয়েছ আগে সেইটেই জানতে চাই।

শনৈ শনৈ এগিয়ে যাওয়াই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় হুজুর !

দেখো, বেশী ঘাঁটাবে না বলছি ! কতদিন আর তুমি আমাকে লেজে খেলাতে চাও বল তো ? রমেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

রামকান্তও নিজকে বড় অপ্রস্তুত বোধ করে। ঢোক গিলে থিতিয়ে থিতিয়েই জবাব দেয়, হুজুর কি তা হলে আমাকে অবিশ্বাস করছেন ?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এটা নয়। এককাঁড়ি টাকা তুমি আমাকে দিয়ে দেওয়ালে। আসল তো দূরের কথা সুদটা পর্যন্ত আদায় হলো না। বছর ঘুরতে চললো। আমলা, মুহুরি, নায়েব সকলের মুখে চোখেই বিদ্রূপের কটাক্ষ। অথচ তোমার মধ্যে কোন সাড়া-শব্দই নেই। আরো কত কাল আমাকে তুমি ঝুলিয়ে রাখতে চাও ?

রামকান্ত থ বনে যায়। রাগে দুঃখে নিজের গাল নিজেরই চড়াতে ইচ্ছে করে। কি কুক্ষণেই না চরে „পা দিয়েছে ও। দুর্গা দুর্গা, দুর্গার জন্যই আজ লোকের কাছে ওকে অপমান সহ্য করতে হচ্ছে। টাকাটাই যদি না নেওয়া থাকতো তাহলে ও দেখিয়ে দিতে পারতো, কাশিমপুরের কুমার বাহাদুরের চেয়ে ওর ক্ষমতা কম নয়। হাজার লাঠিয়াল ওর কথায় ওঠে বসে। কুলললনার অপমান চরের মানুষ কিছুতেই সহ্য করতো না। কিন্তু দুর্গার কাছে নিজেই ও

পরাজিত। কারো বিরুদ্ধে নালিশ জানানো ওর পক্ষে আর সম্ভবপর নয়। চর ছেড়েই ওকে পালাতে হবে···ভাবতে ভাবতে মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে রামকান্তর। মুখে কোন কথাই বলতে পারে না।

রমেন্দ্রনারায়ণও কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েন। রাগের মাথায় কথাগুলো বলে যেন ভাল করেননি। পাইক পেয়দা পাঠানোর কথা মুখে বলা সহজ কিন্তু কাজে ততো সহজ নয়। চরই একমাত্র জায়গা যার আয়ে লাট কিস্তি চলে। সেই চরের মানুষ যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাহলে ঠেঙিয়ে শায়েস্তা করা গেলেও আয় নিশ্চিত কমে যাবে। না না, এ ভুল কিছুতেই করা যায় না। পুনরায় রামকান্তকেই বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করেন রমেন্দ্রনারায়ণ। হাল্কাভাবেই শুধোন, বাবু সাহেবের বুঝি রাগ হলো ?

কিন্তু রামকান্ত তবুও সহজ হতে পারে না। বড় লেগেছে আজ ওর। মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ পকেট থেকে সিগারেটের কেসটা বার করে বলেন, নাও হয়েছে, আর রাগ দেখাতে হবে না। হাসতে হাসতে নিজে একটা ধরিয়ে আর একটা রামকান্তর দিকে এগিয়ে দেন।

রামকান্ত আর স্থির থাকতে পারে না। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে সজোরে টানতে থাকে।

রমেন্দ্রনারায়ণ এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় নিজের কথায় ফিরে আসেন, দেখ হে ভট্চায, তুমি রাগই করো আর যাই বলো, ও মাগী কিন্তু সাচ্চা নয়। ঢঙ দেখলে না, কেমন পাছা দুলিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলো! কথায় আছে ঃ

জল ফেলে জল ভরতে আসে
সে যে কেমন সতী—
কদমতলায় চিকন-কালা
আয়ান মিছে পতি।···

বলি সন্ধ্যা বেলা—নির্জন ঘাটে—একা একা জল ভরতে আসা, মানে কিছু বুঝতে পারলে কি ?

রমেন্দ্রনারায়ণের কথায় আপন মনেই ধাক্কা খায় রামকান্ত। তা ঠিক বটে। আমি কতদিন চেষ্টা করেছি, নিরিবিলিতে ঘাটে পথে দুটো প্রাণের কথা বলতে। কিন্তু মাগী কোন সাড়াশব্দই করেনি। ভাবখানা, যেন কিছুই বুঝতে

পারছে না। কই, এর আগে তো কোনদিন রাত্রিবেলা জল নিতে আসতে দেখিনি! কুমার বাহাদুর ঠিকই বলছেন। ঢঙ দেখাতেই এসেছিল ছিনাল। রূপ আর রূপচাঁদের মোহে স্থির থাকতে পারেনি। কুমার বাহাদুরকে মুখোমুখি দেখবার ছুৎনোতেই জল ভরতে আসা হয়েছিল। ভেবেছিল, আমি ভাগবতের আসরে সরে পড়বো। দিব্যি একা একা নিরালায় প্রাণের কথা বলবে। কিন্তু সে-গুড়ে বালি পড়েছে। তাই আবার ঢঙ করে ঘোমটা টেনে হন্‌হনিয়ে চলে যাওয়া হলো। বেশ, তাই হবে। তোর মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ করাবো। তখন দেখে নিস, কে তোর সত্যিকারের ভাল করতে চেয়েছিল। হতভাগ্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ না বারো ঘাটের এই মড়াটা।...এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে রামকান্তও সক্রোধে জলে ওঠে। রমেন্দ্রনারায়ণের হাল্কা কথার জবাব হাল্কাভাবেই দেয়, দয়া করে আমাকে আর কয়েকটা দিন সময় দিন হুজুর। ঢঙ দেখানো আমি বার করছি।

সাবাস, এইতো চাই। জানলে হে ভটচায, জীবন তুদিনের, ভোগ সুখ যা কিছু সময় থাকতেই করে নাও।

অধম কি হুজুরের প্রসাদ পাবার আশা করতে পারে?

ভোগ আরতির আগে প্রসাদের কথা মুখে এনো না হে ভটচায, পাপ হবে।

সাধ্যমতো দেব-সেবার ত্রুটি হবে না হুজুর।

তাহলে প্রসাদ তো নিশ্চয় পাবে।

হুজুরের জয় হোক।

না না, আগেভাগে জয়গান করো না। চলো, একটু চাঙ্গা হওয়া যাক।

আজ থাক হুজুর। শুনছেন না, খোলে কেমন চাটি পড়ছে? দেরি হলেই খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। রসবোধ বলতে যদি কোন বস্তু থাকতো বেটাদের।...

তা আর কি করবে, তুটো দিন সবুর করো। নায়েব শালা আবার দলবল নিয়ে প্যাঁচ কষতে শুরু করেছে। আগে শালাকে ঢিট করে নিই তারপর সোজা বসিয়ে দেবো গদ্দিতে, হে হে হে....

মুখের কথা আর শেষ করেন না রমেন্দ্রনারায়ণ। রামকান্ত স্বপ্ন দেখতে থাকে। বলছেন কি কুমার বাহাদুর! গঞ্জের কাছারির নায়েব করবেন আমাকে! এ-ও-কি সম্ভব! তাহলে তো কোন কথাই নেই। তুদিনেই চরের জারিজুরি ভেঙে ফেলা যাবে। হাজার হোক আর লাখ হোক, বিজ্ঞানের

যুগে লাঠি-সোঁটার কাজ নয়। মাত্র ছুটো বোড়ের কিস্তি—সব শালা শায়েস্তা হয়ে যাবে। কথায় কথায় শালারা মেজাজ খারাপ করতে শুরু করেছে। ঐ ছিনাল মাগীকেও এক হাত দেখে নেবো। পায়ে ধরে সাধাবো তবে আমার নাম রামকান্ত ভট্টাচার্য।....আকাশকুসুম ভাবতে ভাবতে খেয়াঘাট পর্যন্ত এসে পড়ে রামকান্ত।

রমেন্দ্রনারায়ণ একাকী ডিঙ্গির ওপর গিয়ে ওঠেন।

রামকান্ত তীরে দাঁড়িয়েই হাত জোড় করে প্রণাম জানায়।

দেখতে দেখতে ডিঙ্গি এপার থেকে ওপারে গিয়ে পৌঁছোয়। রামকান্তও বৈরাগী বাড়ির দিকে চলতে থাকে। রাস্তায় যেতে যেতে ভাবে, নায়েবিটা একবার হাতে এলে হয়। ও শালার জমিদারী চালও ছুদিনে ঘুচিয়ে দেবো। শালার বড্ডো বাড় বেড়েছে। টাকার বিনিময়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বেশ, দেখা যাবে, কত ধানে কত চাল।...ভাবনায় ভাবনায় ছুর্গার বাড়ির কাছেই এসে পড়ে রামকান্ত। ভাবে, দেখে যাবো নাকি একবার মাগীকে। না, থাক। ভাল বুঝি তো ফেরবার পথেই নাড়াচাড়া করে দেখে যাবো ...কোন দিকে না তাকিয়ে সোজাসুজিই পা চালাতে থাকে রামকান্ত।

॥ ২৮ ॥

দোল পূর্ণিমা। দূর গগনে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের সমারোহ। চন্দন মাখামাখিই যেন নীল গগনের প্রশস্ত ললাটখানি—চন্দ্র সুষমায় উজ্জ্বল। সঙ্গীত মন্দ্রিত ভুবন গগন। এ সঙ্গীত বিরহের সঙ্গীত। আবার মিলনের মহা সঙ্গীতও এ।

কান্ত কুঞ্জে আসবেন। ঝরা পাতায় বাজছে তার পায়ের নূপুর। রঙীন পাখা মেলে প্রজাপতি গুঞ্জরন তুলছে। চামর ছুলছে কাশের বনে। বন-বিতান পুষ্পিত। শ্রীমতী প্রতীক্ষারতা বাসরঘরে। মধুযামিনী ভোর হয়ে আসে। না, কান্ত আর এলেন না। বিরহী আত্মা গুমরে ওঠে। সে বিরহ অনুরণিত হয় কোকিলের কূজনে, ঝরা পাতার মর্মরে—নীরব নিশীথে। বসন্ত এখানে রোদন-ভরা। আর কান্ত যার কুঞ্জে আসেন তার কাছে এ সঙ্গীত-মুখর—মিলন প্রতীক।...

মিলনেই মেতেছিলেন বৃন্দাবনের সখীরা সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে। কুসুমিত নিধুবন। বাতাসে মিষ্টিগন্ধ। রাগরঞ্জিত দেহ। কণ্ঠ সঙ্গীতমুখর। গোপিনীরা

উৎসবে মাতোয়ারা। মাতোয়ারা আবীর কুমকুম আর চুয়া-চন্দনে। নূপুরের রোল উঠছে, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে—প্রাণ যাচ্ছে প্রাণে মিশে। এ উৎসব যৌবন উৎসব—মদন উৎসব—বসন্ত উৎসব। শ্রীবৃন্দাবনে দোল উৎসব এ···

ময়না নিশির বিয়ের পর এই প্রথম দোল উৎসব। গঞ্জের বাজারে ধুম লেগেছে। বিহারী মজুর আর দোররক্ষীরা প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই লীলা গানে মত্ত। প্রতি রাত্রে ঢোলক বাজে—খঞ্জনী। সমস্বরে চলে গান-বাজনা—অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পরেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ওরা। পূর্ণিমার দিন দুই আগে থেকে গতি আরো বেড়ে যায়। দলের কেউ একজন নায়িকা সাজে। সকলে রসবতীকে ঘিরে সারারাত চালায় সা-রা-রা আর খিস্তি খেউর। এ কোন লীলাগান নয়। ভরা যৌবন আর বসন্তের উৎসব সঙ্গীত। আদিম যুগের কোন্ এক আদিম পুরুষ কবে যে এদের হয়ে এ সঙ্গীত ফেঁদে গেছেন তা কেউ না জানলেও আজো তার ধারা বদলায়নি। সেই আদি ও অকৃত্রিম সুরেই আজো এরা যৌবনের বন্দনা গায়—উৎসব করে।

হরির আখড়ায় দোল উৎসব চলেছে। মোহন্ত চরণ দাস তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। পুত্র সনাতন দাসের ওপর আখড়ার ভার। পিতার সমস্ত শিষ্য সামন্তকে নিমন্ত্রণ করেন সনাতন। যে যা পারে গোপীনাথের ভোগ-রাগের ব্যবস্থা করে। দু'দিন দু'রাত্রি চলে বিরামবিহীন পালাগান। চরের দল গাইছে পূর্ণিমার দিন। "নৌকা বিলাস" গাইছে তারা। মধুর মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রই এখন চরের সেরা গাইয়ে। মধুর মতো রাগ-রাগিণীতে ওস্তাদ না হলেও সুরেন্দ্রর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। আসরের আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ ওর গানে।

মাঝ রাত্রে শেষ হয়ে যায় পালা। চলে ঝুমুর আর জয়ধ্বনি। আবীর কুমকুমের ছড়াছড়ি। ভক্তগণ আজ শুধু বিগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে উৎসব।

আগামীকাল হোলি উৎসব। প্রিয়জন দেবে প্রিয়জনের গায়ে রং আর আবীর। হোলি গান বেরুবে পাড়ায় পাড়ায়। গঞ্জে বাঙালীদের দু'দল। উত্তর থেকে আসবে উত্তর পাড়ার দল আর দক্ষিণ থেকে যাবে দক্ষিণ পাড়ার দল। মাঝামাঝি জায়গায় চণ্ডীমণ্ডপের উঠানে এসে মিলবে উভয় দল। প্রত্যেক দলেই থাকবেন একজন করে রাজা। রাজার সাজ-পোষাক আবার অদ্ভুত ধরনের হওয়া চাই। গাধার পিঠে উল্টো-মুখো হয়ে বসবেন তিনি। মাথায় থাকবে ভাঙা খালুইএর মুকুট। গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা, পরনে চট নয়তো

ছেঁড়া কাঁথা। রাজার পাত্র-মিত্ররাও কেউ কম যাবে না। কারো হাতে ঝাঁটা, গাছের ডাল, বাড়ুন। হইহই করে শোভাযাত্রার আগে আগে রাজাকে তাড়া করে নিয়ে চলবে একদল। আর তার ঠিক পেছনেই ঢোলক আর করতাল বাজিয়ে আর একদল যাবে গান গাইতে গাইতে। উৎসব কেন্দ্র থেকে শোভা-যাত্রা বার করবার সময় এ গান বৃন্দাবনজীর লীলামাহাত্ম্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। শেষে এসে দাঁড়াবে খিস্তি-খেউরে। দক্ষিণ পাড়ার রাজার মুকুটে লেখা থাকে "উত্তর পাড়ার রাজা চলেছেন, সাবধান।" আবার উত্তর পাড়ার মুকুটে লেখা থাকে, "দক্ষিণ পাড়ার রাজা চলেছেন, সেলাম দাও।" সেলাম ঠিকই দিচ্ছে। রাজার পিঠে সমানে পড়তে থাকে ঝাঁটা আর বাড়ুনের বাড়ি।

চণ্ডীমণ্ডপে পৌঁছে উভয় দলের আড়াআড়ি আরো বেড়ে যায়। রং-তামাসা খিস্তি-খেউর সমানে চলে। যে দল এঁটে উঠতে পারে না তাদের কেউ একজন চুপিচুপি এসে ভিন্ন দলের ঢোলক দেয় ফাঁসিয়ে। খিস্তি-খেউর থেকে অবস্থা হাতাহাতি মারামারিতে গিয়ে পৌঁছোয়। খবর পেয়ে দু' দলের দলপতিরা ছুটে আসেন। কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর মামলা মিটে যায়। আবার লীলামাহাত্ম্য গাইতে গাইতে যে যার পাড়ায় ফিরে আসে।

দুপুর তখন গড়িয়ে যায়। বংশীর স্বচ্ছ জলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সকলে। চড়া রোদে সমস্ত শরীর তেতে গেছে। গাল, গলা থেকে আলকাতরা, বাঁদুরে রং আর এ্যালুমিনিয়ম পাউডার ঘষে ওঠাতে গিয়ে ছাল-চামড়াই উঠে যায় অনেকের।

সন্ধ্যায় আবার ঠাকুর গস্তের পালা। এবার আর কোন রং-তামাসা কিংবা বহুরূপী সাজসজ্জা নয়। ভদ্র জামা-জুতো পরে সম্ভ্রান্তরাই বেরুবেন এবার। শোভাযাত্রার আগে থাকবে পঞ্চ বাজনা। ঢোল, কাঁসর, সানাই, কাড়া-নাকাড়া। তারপর বাহকের মাথায় দোল-চৌকির ওপর বিগ্রহ। বিগ্রহের পরেই থাকবেন বাবুমশাইরা। হারমোনিয়ম, ঢোলক, করতাল-যোগে চলবে লীলাগান। মূল গায়েন আগে গেয়ে যাবে এক-একটি পদ, অন্যেরা সমবেত কণ্ঠে করবে তার পুনরাবৃত্তি। এ বেলা আর এক ফোঁটাও জলো রং নয়। শুধু আবীর আর কুমকুম। রাস্তার দু'দিকের বাড়ি থেকে পুরনারীরা বিগ্রহের উদ্দেশ্যে আবীর ছিটাবেন—উলু দেবেন—সঙ্গে লুটের বাতাসা। বেশ শান্ত পরিবেশের মধ্যেই উভয় দলের শোভাযাত্রা আবার এসে মিলবে চণ্ডীমণ্ডপে। প্রাণ খুলে একের পর এক যে যার দলের রচিত গান গেয়ে শোনাবে উপস্থিত

জনতাকে। মণ্ডপের বিরাট চত্বর লোকে লোকারণ্য। বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রদের মধ্যেও চলবে আবীর খেলা। শুভ কামনা জানাবে পরস্পর পরস্পরকে। গভীর রাত্র পর্যন্ত চলবে গান। সর্বশেষ ফিরে আসবে যে যার পাড়ায়। এবার প্রসাদ পাবার পালা। মোহন্তরা হাতে হাতে বেঁটে দেবেন খিচুড়ি, মিষ্টান্ন আর লাবড়া। উৎসবের হবে পরিসমাপ্তি।

দোল উৎসবে চরণ দাসের শিষ্যরা গঞ্জে গেলেও চরে আমোদ-প্রমোদ কম হয় না। আবীর রং খেলার ধুম চরেও জমে ওঠে। হোলির দিন ছোটরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই রং পিচকারি নিয়ে মাতোয়ারা। বড়দের মধ্যেও আবীর বিনিময় চলে। পরস্পর করে পরস্পরের জন্য মঙ্গল কামনা।

দীনুর বাড়ির ধুম এবার একটু বেশী। বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এসেছে ময়না। পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা বাড়ি ছেড়ে নড়ছেই না। সকালেই রং-এ নেয়ে ওঠে ময়না। নিশিও বাদ যায় না। পার্বতী আচ্ছা করে ওদের দু'জনকে রং মাখিয়ে দেয়। নিশিও পার্বতীকে ছাড়ে না। বড় ঘরখানায় ওরা সকলে মিলে খুব হৈ-হল্লা শুরু করে। কুসুমের ভালই লাগে এ আনন্দ-উৎসব। এবেলা আর রান্না-বান্না নেই। মুড়ি চিঁড়ে খেয়েই সকলকে পেট ভরাতে হবে। দীনু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে হরির আখড়ায় ছুটেছে। অশ্বিনীকে দিয়ে গঞ্জের বাজার থেকে এক টাকার জিলিপি আনায় কুসুম। রং খেলে কেউ খালি মুখে যাবে না। আর কিছু না হোক একটু মিষ্টিমুখ সকলকে করাতেই হবে।

নিশির হাতে রং খেয়ে পার্বতী বলে, আমারে আর রং দিয়া কি করবা নিশিভাই। গলার মালারে রং দ্যাও গা।

উত্তরে নিশি বলে, হ, আপনারা যা যা করচেন কইয়া দ্যান, তাই করি।

পার্বতী বলে, আমাগ হ্যা কালের (সেকালের) কতা ছাইড়া দ্যাও। তোমাগ রাদা যে বাঁশী শুইনা ঘরে আইচে। হ্যারে বিন্দাবন নীলা দ্যাহাও। কি কচ ল তরা ?—সরলা, কালী প্রভৃতি অন্যান্য সকলের দিকে চেয়ে হেসে ফেটে পড়ে পার্বতী।

সকলেই পার্বতীকে সমর্থন করে সমস্বরে চেপে ধরে নিশিকে, হ হ নিশি ভাই, ময়নারে কোলের উপুর বহাইয়া রং মাখাইয়া দ্যাও।

নিশি বলে, তবে তোমরা হগলে মিলা ধইরা আন অরে।

লজ্জায় মুখ ঢেকে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল ময়না। নিশির মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে সকলে মিলে টানতে টানতে ওকে নিশির কাছে নিয়ে আসে।

কোলে বসানো আর হয় না। দু'হাতে ঘন করে গোলাপী রং গুলে ময়নার মুখে মাখিয়ে দেয় নিশি।

পার্বতী এবার ময়নার হয়ে ওকালতী করে, এই মইনী, তুইও ছাড়চ ক্যান। দে না আইচ্ছা কইরা মাখাইয়া।...

কিন্তু ময়না তা পারে না। কিছুদিন আগেও যে মেয়েটি বংশীর চরময় একসঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করেছে সে আজ লজ্জাবতী লতা। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নীরবেই খিলখিল করে হাসতে থাকে শুধু।

বাড়ির সখ মিটিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ভিন্ন পাড়ায় রং খেলতে যায় নিশি। একরকম সারাদিনই চলে আবীর আর রং খেলা। হৈ হুল্লড়ে শরীর ঝিমিয়ে আসে। গঞ্জের লোক হোলিগানে গভীর রাত পর্যন্ত ডুবে থাকলেও চরের মানুষ বেশীক্ষণ রেশ রাখতে পারে না। দীনু গঞ্জ থেকে ফিরে আসার আগেই নিশি শুতে যায়। একবার ভেবেছিল, গঞ্জে গিয়ে গান শুনে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। ও তো সেই মামুলী ব্যাপার। অনেক বারই তো দেখেছে, এখন ঘুমিয়ে পড়ে সুস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। রাত দশটা না বাজতেই শোবার-ঘরে ঢোকে নিশি। একে একে সমস্ত চরই এক রকম নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। রামকান্তও বেশী পেড়াপীড়ি করেনি। হৈ হুল্লড় ওর ভাল লাগে না। চেপে ধরলে চরেও কীর্তনাদির ব্যবস্থা করাতে পারতো। কিন্তু তাতে সনাতন দাসের চেয়ে ওর নিজের ক্ষতিই হতো বেশী। নিজেকেও আটকে থাকতে হতো কীর্তনের সঙ্গে। এই বেশ ভাল হয়েছে, ওরা গেছে ওদের মোহন্তের আখড়ায়, ও পেয়েছে ছুটি। যত খুশি বেটারা নাচানাচি করুক ওর কিছু আসে যায় না। ও কুমার বাহাদুরের সঙ্গে কাছারিতে বেশ আছে। হ্যাঁ, একেই তো বলে বসন্ত-উৎসব। সুরা শাকীই যদি না রইলো তবে আবার উৎসব কিসের ? নেশার ঝোঁকে কুমার বাহাদুর অবশ্য দুর্গার জন্য হাঁপিয়ে উঠছেন। খিস্তি-খেউরও বাদ দিচ্ছেন না। তা একটু দিন, নেশা বেশ ভালই জমিছে। এখন নায়েবিটা হাতে এলেই কেল্লা ফতে। আর ও তো এল বলে। মাগী যখন ঘাটের পথে স্বেচ্ছায় পা বাড়িয়েছে তখন আর ভাবনা নেই। নাকে দড়ি দিয়ে টেনে আনবো। গোসাঁই শালাকেও তখন দেখে নেবো। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে শালা যেন মাথা কিনে ফেলেছে। একবার বসে নিই গদিতে সব শালাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।...নেশার ঝোঁকে এলোমেলো ভাবতে থাকে রামকান্ত।

সারা চরই একরকম নিস্তব্ধ। নিশি অশ্বিনীও যে যার ঘরে গেছে। শুধু চক্ষুলজ্জায় ময়না পার্বতী যেতে পারছে না। শাশুড়ীকে একা বাইরে রেখে নিজেরা ঘরে যায় কি করে। অবশ্য খাওয়া-দাওয়ার কোন ঝামেলা নেই আজ। বাড়ির সকলের ব্যাপারই চুকে গেছে। শুধু শ্বশুরঠাকুরই যা একা বাকী। কিন্তু উনি তো গঞ্জের আখড়াতেই প্রসাদ পাবেন। তবু ঠাকরুন যখন মুখ ফুটে ওদের কিছু বলছেন না তখন আর যায় কি করে। কিন্তু দু'চোখ যে ঘুমে বুঝে আসছে। সারাদিনের খাটুনীর পর কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়। হাই তুলতে তুলতে পার্বতী উঠে দাঁড়ায়। কুসুমের শরীরেও আর বইছে না। খাওয়া দাওয়ার পর পান চিবুচ্ছিল, পার্বতীর ওপর নজর পড়ে। ঢোক গিলে নিয়ে ওকেই বলে, তোমরা শোও গা বৌমা, রাইত অইচে।

পার্বতী এই অনুমতিটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছিল। সুতরাং আর কোন রকম দ্বিধা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, আপনে হুইবেন না?

হ, আমিও গিয়া গৈড় (শোয়া) দেই গা। কতক্ষণ আর বাইরে বইয়া থাকুম। ওনার ফিরতে অনেক রাইত অইব। তোমরা ঘরে যাও।

পার্বতী ময়না উঠে দাঁড়ায়। কুসুমও আর দেরি করে না।

দক্ষিণ ভিটির ঘরখানায় নিশি শোয়। চারদিক জুড়ে ঢেউটিনের বেড়া—ঢেউ টিনের চাল। পূবদিকের জানালা খুললে ঘর থেকে বংশীর জল দেখা যায়। ময়না আস্তে আস্তে এসে ঘর ঢোকে। নিশি জেগে আছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যায় না। ঘরে বিশেষ কোন আসবাব নেই। টিপটিপ করে মাটির প্রদীপ জলছে এক কোণে। কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলছে লম্বা লম্বা গোটা তিনেক শিকে। মাটির পাতিল ও পেতলের গামলায় হয়তো কোন খাদ্য দ্রব্য রয়েছে। গোটাকয়েক বড় বড় মাটির জালাও রয়েছে আর-এক কোণে। এছাড়া আছে বেড়ার সঙ্গে দাঁড় করানো ছোটবড় এক ঝাঁক কাঁটাল কাটের পিঁড়ি। বেড়ার সঙ্গেই বড় একটা কাঠের তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে আয়না চিরুনি প্রভৃতি ময়নার প্রসাধন সামগ্রী। উত্তর-দক্ষিণের বাতার সঙ্গে টাঙানো দড়ির ওপর গাদা-করা জামা-কাপড় ঝুলছে। দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে রয়েছে শোবার বড় চৌকিখানা। ময়না ঘরে ঢুকেই প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। পূবের বড় বড় জানালা দুটো দিয়ে পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না এসে ঘরে পড়েছে। জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। বংশীর কোল ঝলমল করছে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে। গঞ্জের দু'চারটে দোকান পাটে এখনো বাতি জলছে।

নিস্তব্ধতা ভেদ করে ভেসে আসছে ক্ষীণ গানের রেশ। গঞ্জের মানুষ হয়তো সারা রাতই উৎসব করবে আজ।....কিন্তু ও কি ঘুমিয়ে পড়লো এরই মধ্যে! খুব মানুষ যা হোক। অতো লোকের মধ্যে পায়ে-আবীর দিতে আমার বুঝি লজ্জা করে না!....এক ফাঁকে একখানা পেতলের রেকাবিতে করে তাকের ওপর খানিকটা আবীর এনে রেখেছে ময়না। ইচ্ছে, নিরিবিলিতে নিশির পায়ে দিয়ে প্রণাম করবে। গুরুজনের পায়েই তো আবীর দিতে হয়। কিন্তু ও যে ঘুমিয়েই পড়লো। শোয়া অবস্থায় তো আবার কাউকে প্রণাম করতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়।...ভাবতে ভাবতে ময়না জানালা থেকে চৌকির কাছে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন যেন বাধবাধ ঠেকে ওর। কিছুতেই গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে পারে না। ফিসফিস করেই ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে, এই— ঘুমাইলা নাকি। বারে, ওঠ না, এই।...

না, কোন সাড়া শব্দ নেই নিশির। বিরক্ত হয়ে ময়না আবার এসে জানালায় দাঁড়ায়। দু'চোখের ঘুম কোথায় যেন উবে গেছে। ঐ তো বংশীর বিরাট চর ঝিকমিক করছে, ঐ দেখা যাচ্ছে চরধল্লার বুড়ো বটগাছটা। কত নিভৃত সন্ধ্যায়—কত দুপুরে দু'জনে ওখানে গলাগলি ধরে খেলেছে। লোকচক্ষুর সামনেই মারামারি হাতাহাতি করেছে, লজ্জার লেশমাত্রও কোনদিন টের পায়নি। কিন্তু আজ এই নিভৃত ঘরে একি ওর লজ্জা!...না না, লজ্জা আবার কিসের! বেচারা সারাদিনের ক্লান্তিতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'দণ্ড থাক না, পরেই জাগানো যাবে। এমন কি রাত হয়েছে! এই তো বেশ লাগছে... ময়না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদের শোভা দেখতে থাকে।

ঘুম নিশির চোখেও নেই। চুপচাপ শুয়ে মজাই দেখছিল ও। কিন্তু কতক্ষণ আর পারা যায়। ময়না যে চাঁদের শোভায় ডুবে গেলো!...জল খাবার ছুৎনো করে বিছনার ওপর উঠে বসে নিশি।

ময়না শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকায়। সবিস্ময়ে বলতে থাকে, অ, তুমি তাইলে জাইগা জাইগা ঘুমাইচিলা!

কৃত্রিমভাবে চোখ রগড়িয়ে নিশি উত্তর করে, বইয়া গেচে আমার জাইগা থাকবার। তিষ্টায় বলে আমার গলা শুকাইয়া গেচে! জল আচে নাকি?

জল খাইব না হাতি! এই ন্যাও, ময়না কলসী থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিশির হাতে দেয়।

রেশ রাখবার জন্ম অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশিকে খানিকটা জল পান করতে হয়।

ময়না হাত বাড়িয়ে পুনরায় গ্লাসটা নিতে যায়।

নিশি গ্লাসটা হাতে দিয়ে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে যায় ওকে।

ময়না ধরা না দিয়ে মুচকি হেসে চলে যায় জানালায়।

নিশিও আর বিছানায় থাকতে পারে না। উঠে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। আবার চেপে ধরতে যায় ওকে বুকের সঙ্গে।

ময়না বাধা দেয়, খাড়ও, (দাঁড়াও) তোমারে একটা পেন্নাম করি।

নিশি থতমত খেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

ময়না তাক থেকে আবীরের রেকাবিখানা হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে এক মুঠো আবীর নিশির পায়ের ওপর দিতে যায়।

নিশি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বাধা দেয়, কর কি—কর কি! গবিন্দের আবীর কি মাইনষের পায়ে দিতে আচে!

ময়না ওতে কিছুমাত্র দমে না। হেসে উত্তর করে, গবিন্দের আবীর গবিন্দের পায়েই ত দেই। তুমিই ত আমার সাইক্ষাইত (সাক্ষাৎ) গবিন্দ।

নিশি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

ময়না ততক্ষণে ওর দু'পায়ে দু'মুঠো আবীর দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে ওকে। সকালে দশজনের সামনে রং দিতে পারেনি। এবার ও সাধ মিটিয়েই ওর গোবিন্দের পায়ে আবীর দিতে পারলো। নারী জন্ম সার্থক ওর। স্বামী তো সাক্ষাৎ দেবতাই। মা দিদিমা তো বরাবর এই কথাই ওকে বলে আসছে। পূর্ণিমায় দেবতার পায়ে আবীর-অর্ঘ্য এ তো ভাগ্যের কথা···ময়না অন্তরে অন্তরে গর্ব অনুভব করে।

নিশির বয়োঃসন্ধির উন্মাদনাও মুহূর্তে গলে জল হয়ে যায়। সোহাগে প্রাণের রাধাকে দু'হাতে টেনে তুলে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে। হিয়ায় মিশে যায় হিয়া।

বসন্ত হিল্লোলে কেঁপে ওঠে বংশীর কোল। অদূরে মৃদু মৃদু দুলছে পাশাপাশি দু'টি কাশ ফুলের গুচ্ছ। জানালা থেকে ফিরে আসে ওরা বিছানায়। ঘুমিয়ে পড়ে মনের সুখে।

॥ ২৯ ॥

চরের মানুষের বরাতই মন্দ। গোলা ভর্তি প্রত্যেকেরই খি-কলাই, যব, সোনা-মুগ। কিন্তু গঞ্জের বাজারে এগুলোর যেন কোন দামই নেই। প্রথম মরশুমে তরি-তরকারির দাম দেখে মনে হয়েছিল, রবিশস্যের দামও চড়া যাবে। কিন্তু চড়া তো দূরের কথা এখন যে কোন খরিদ্দারই নেই গঞ্জে। লোকে এখন গরু খাওয়ানোর জন্য কলাই কিনছে। এক টাকা, ঊর্ধ্বে পাঁচ সিকের বেশী নয় কলাইয়ের মণ। যবের অবস্থাও তথৈবচ। সোনা মুগের দর কিছু বেশী আছে বটে। কিন্তু হলে কি হবে, সোনা মুগ আর ক'জনের গোলায় আছে। কাঁড়ি কাঁড়ি কলাই তো রয়েছে এক একজনের হাতে। অন্য পর দূরের কথা পলানের মতো চাষীও বাজার গতিকে মাথায় হাত দিয়ে বসে। দীনু করিমের বুক শুকিয়ে কাঠ। না, কসাইয়ের হাত থেকে আর বাঁচার কোন আশা নেই। সুদখোর মহাজন ওদের ললাটের লিখন। বিধাতা ওদের হাড়ের রস টেনে বার করার জন্যই শয়তানের সৃষ্টি করেছেন। এরপর পাট চাষ আর হবে কি দিয়ে। ভগবানই রুষ্ট হয়েছেন চরের ওপর। বানের জল ঘরে ঢুকে আসল জল টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। টিনের ঘর-দোর তো যাবেই —ভিটেমাটিও থাকবে কিনা সন্দেহ।...

রামকান্ত এখন আর নিয়মিত ভাগবতের আসরে আসে না। কেউ তার জন্য কোন কথাও তোলে না। আসর কই যে তা নিয়ে মাথা গরম করবে। সন্ধ্যার পর দু'পাঁচজন আসে, কোনরকমে খোলে চাটি দিয়ে ধ্বনি দেয়। বাদও পড়ে কোন কোন দিন। চিন্তায় চিন্তায় মানুষ সব ভুলতে বসেছে। দয়াল চানের আসরও ফাঁকাই যায় একরকম। সকলে মিলে জড় হলেও গান বাজনা অপেক্ষা দুর্দিনের আলোচনাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিন্তা ভাবনাকে ঠেলে ফেলবার জন্য কোন কোন দিন করিম জোর করে একতারা নিয়ে বসে। গলা ঝেড়ে সুরও ধরে। কিন্তু সে তো গান হয় না। মরা কান্নাই যেন কাঁদে সকলে মিলে।

দুর্গাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে। পাট চাষ এখন শুরু না করলেই নয়। পাঁজিতে লিখেছে, জল এবার গোড়াগোড়িই আসছে। কিন্তু কি দিয়ে কি হবে। মুগ কলাই হাতে যা আছে তা বেচে আধা-আধি জমির চাষও হবে না।

ক্ষেত মজুররা ঘোঁট পাকিয়েছে, পেট ভরে ওদের প্রত্যেককেই খেতে দিতে হবে। তা না হলে কেউ কাজ করবে না। কিন্তু ওদের পেট ভরাবার মতো চাল ডাল পাবে কোথায় চাষী! ধান চাল বলতে তো চরের কারো হাতে কিছু নেই। গোলা ভর্তি আছে শুধু গরুর খাদ্য—মাষ-কলাই। অনেক সালিসী দরবারের পর সকালের নাস্তার সময় পান্তা ভাতের বদলে ছাতু গুড় খেতে রাজী হয়েছে বটে ক্ষেত মজুরেরা। কিন্তু দুপুরের ভাতের ঝুঁকিও কম নয়। হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কাঁড়ি কাঁড়ি ভাতই গিলবে এক একজন। লোক রেখে চাষ করাতে হলে এ দাবি মানতেই হবে। বেকারের সংখ্যা অনেক হলেও কেউ ভাত না খেয়ে কাজ করতে রাজী নয়। রোজের পয়সা আট আনার বদলে সাত আনা দিলে চলবে। কিন্তু পেট ভর্তি ভাত না হলে চলবে না।

দুর্গা একবার ভাবে, এ সাল আর পাট বুনবে না। কিন্তু আনন্দ তা কিছুতেই হতে দেবে না। কাজে নতুন উৎসাহ এসেছে বেচারার। একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। তা ছাড়া পাট না বুনলে মহাজনের ঋণই বা শোধ হবে কি দিয়ে। চরের মানুষ তো সকলেই বলছে, পাট চাষ করবে না। জমি দু'সাল পতিত থাকবে তা হলেই পাটের বদলে ধান বোনা যাবে। ধান ঘরে থাকলে আর যা হোক খাবার ভাবনা থাকবে না।...কিন্তু ভাবা পর্যন্তই সার। মহাজনের তাড়াতেই সুড়সুড় করে সকলকে ক্ষেতে নামতে হবে। নাচতে নামলে ঘোমটা টানা চলে না।

চৈত্রের শেষ শেষ নিতাই আবার একদিন চরে আসে। ওসমান, গণিকে ওর বড় ভয়। কেমন যেন চাঁচা ছোলা কথা বলে ছোকরা দু'টো। তাই চর-ঘাটায় না গিয়ে সোজা করিমের বাড়িতে ওঠাই স্থির করে নিতাই। সুযোগ হয় পেটের কথা খুলে বলবে নয়তো ফকিরের দু'টো গান শুনে উঠে পড়বে। সন্ধ্যার পর খেয়া পার হয়ে হাঁটা পথেই রওনা হয়। বেশ ভাল মতোই এসে পৌঁছোয়। পলান, করিম, দীনু সবেমাত্র একত্র হয়েছে। বার বাড়ির উঠোনে পা পড়ে ওর। তিন মোড়ল হকচকিয়ে ওঠে। যে যেভাবে পারে অভ্যর্থনা জানায়। পলান বিস্ময়ের সঙ্গে শুধোয়, খবর কি সাজী মশায়? হঠাৎ সাইন্‌জা বেলা আইলেন?

নিতাই পেটের কথা পেটে রেখেই উত্তর দেয়, আর বলেন্ কেন। গিয়ে ছিলাম ছোট মেয়ের বাড়ি জয়মণ্টপ। বেয়াই মশায় এ-কথা সে-কথায় দেরি করে

ফেললেন। চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কেন যেন মনে হলো ফকির সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাই। তাই আর কি...

তোবা তোবা, ইত আমগ সৌভাগ্য। বহেন, তামুক খান, জল চৌকিখানা এগিয়ে দিয়ে করিম উত্তর করে।

নিতাই বলে, সৌভাগ্য আমারই। আপনাগ মতো গুণীজনের সঙ্গ লাভ ক'জনের ভাগ্যে ঘটে ?

কি য্যান কন্, সব খোদা তাল্লার মর্জি। আমি হ্যার গুণগান কতটুকুন জানি। একটু ঠাণ্ডা হন, আমি হাত মুখ ধোয়নের পানি লইয়া আহি, উত্তরের অপেক্ষা না করে ভেতর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে যায় করিম!

নিতাই বাধা দেয়, বলেন কি! আপনার হাতের জল দিয়া হাত পা ধোবো! মহা পাতক হবে না আমার! আপনি বসুন, আমি এক্ষুণি উঠবো।

করিম হাসতে হাসতেই জবাব দেয়, আপনাগ শাস্ত্রে ত আচে, অতিথি নারায়ণ। তবে আর হ্যার সেবা শুশ্রূষা করলে গুণা অইব ক্যান! একটু বহেন, আমি আমু আর আমু।

না না, শরীর আমার বেশ ঠাণ্ডাই আছে। পানির আর দরকার হবে না। দয়া করে আপনি আমাকে একটা গান শোনান।

হেই বালো, কাম নাই পানি দিয়া। সাজী মশায় কিছুতেই আপনার আনা পানি দিয়া হাত পাও ধুইব না, পলান সায় দেয়।

তা যদি কন তয় রহিম আইনা দেউক পানি।

না না, পানির কোন দরকার হবে না। আপনি গান ধরুন। আপনার মুখের গান শুনলেই প্রাণ জুড়াবে।

করিম আর কথা বাড়ায় না। দীনু তাড়াতাড়ি এক কল্কে তামাক সেজে নিতাইয়ের হাতে দেয়।

বেড়ার গা থেকে একতারাটা টেনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে করিম। মৃদু ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ বুজে আসে। পলান দীনুও তৈরী হয় দোহারের জন্য। আবেগে সারা চর অনুরণিত হতে থাকে—

(অ মন) দিন চারি পাঁচ ফালাফালি (লাফা লাফি)
করিচ না তর ভাঙা নায়।
আগার থেইকা পাছায় যেইতে (যেতে)
কখন তরি ডুইবা যায়।

সুরের মূর্ছনায় নিতাই কেমন যেন থিতিয়ে পড়ে। ফকির কি তা হলে ওর মনোভাব জানলে! ওদের তরি ডোবাতে গিয়ে শেষটায় না নিজেরই ভরা ডুবি হয়।...তিন মোড়ল তন্ময় হয়ে গাইতে থাকে। নিতাইয়ের হৃদ্‌-তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে ওঠে। এর চেয়ে না আসাই বোধ হয় ছিল ভাল।...

গান থেমে যায়। নিতাই আসনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। না, আজ আর কোন কথা হতে পারে না। মনটা কেমন যেন বিবাগী হয়ে উঠছে। করিম হয়তো যাদুই জানে। বলা যায় না, পেটের কথাও বলে দিতে পারে। গানের ভাষাতেই পারে। মানে মানে এখন উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিতাই বেরিয়ে আসতেই চায়।

করিমের তখনো মোহ কাটেনি। এ রাজ্যেই যেন নেই ও। হঠাৎ নিতাইকে উঠতে দেখে প্রশ্ন করে, গান কি মনে ধরল না সাজী মশয় ?

অপ্রস্তুত হয়ে নিতাই বলে, কি যে বলেন! এমন প্রাণ মাতানো গান তা আর কার মনে না ধরবে। ইচ্ছে তো করে, দিনরাত আপনার কাছে পড়ে থাকি। কিন্তু কি করবো। ভগবান যে কেবল জোয়াল টানতেই সংসারে আমাদের পাঠিয়েছেন।

হেসে করিম বলে, কাজ সংসারে কার না আছে সাজী মশায়। তবু দিন গেলে একবার দীন দয়ালরে ডাইকেন।

আশীর্বাদ করেন, তা যেন পারি।

তোবা তোবা, আমি কেরা আশীর্বাদ করবার, তাঁর কাচে দোয়া মাগেন।

ঢোক গিলে নিতাই বলে, জানেন দয়াল। তাঁর কৃপাতেই যদি অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

অইব অইব, উঠলেন ক্যান ? আর এক কইলকা তামুক খান, খোলাখুলি উচ্ছ্বাস জানায় পলান।

দীনু আবার তামাক সাজে। একসঙ্গে দু'কল্কে। একটা জল ছাড়া হুঁকোর মাথায় বসিয়ে নিতাইয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। আর একটা করিমের দিকে।

নিতাই নির্বিবাদে টানতে থাকে।

করিম বাধা দেয়, আগে তুমিই ধুমা বাইর কর।

দীনু হুঁকোটা পলানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ব্যাপারী সাব চোপার জোর আপনারই বেশী। আপনেই টান দ্যান।

এ-কথায় সে-কথায় আসরের গাম্ভীর্য শিথিল হয়ে আসে। সুযোগ পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নিতাই। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করে, চাষ আবাদের এবার কি করলেন সকলে?

পলান সোজাসুজি জানায়, না, পাট আর ইবার বুনুম না ঠিক করচি। ও হালা (শালা) ইংরাজের হাতে যহন কলকাটি তহন বেগার খাইটা কাম নাই।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিতাই বলে, এবার কিন্তু অবস্থা একটু অন্যরকম। যত শুল্কই ধার্য হোক, জাপান এবার পাট কিনবেই।

হ, হাবারও ত আপনে কইচিলেন জাপান পাট কিনব। তা হালারা পানিতে ডুব দিচিল ক্যান?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলছেন। পানিতে ডুবিয়েই মারছিল বেচারাদের। তবে "লিগ অব নেশন" নজর দেওয়ায় এবার কিছু সুবিধা পাচ্ছে ওরা। পাটের দর এবার ভাল যাবে বলেই আমার মনে হয়।

মনে ত আমারও অয়। ও সন যহন মোন্দা গেচে ইসন চড়া যাইবই। কিন্তু ও হালা বোম্বাইটাগ যে আগা পাছা কিছু বুজন যায় না। তাছাড়া পাট বুনুম কি দিয়া? টেক ত গড়ের মাঠ, আক্ষেপের সঙ্গেই পুনরায় মন্তব্য করে পলান।

এতক্ষণের চেষ্টায় আসল জায়গায় পৌঁছুতে পেরে স্বস্তির হাঁপ ছাড়ে নিতাই। কৃত্রিম দরদ দিয়েই বলে, টেঁকের ভাবনা আপনাদের ভাবতে হবে না। আসলে চাষ করবেন কি না সেইটেই স্থির করুন।

তা যদি কন তয় আমরা এক পায় খাড়া। পাটে ডুবচি—পাটেই উঠুম, উল্লাসে ফেটে পড়ে পলান।

তাই-ই তো উচিত। জেনে রাখুন, নিতাই সা সব সময়েই আপনাদের পেছনে আছে।

খোদা রসুল, আপনার বালো করব, পলান উচ্ছ্বাস জানায়।

নিতাই বলে, তা'হলে আর দেরি করবেন না। কাজ আরম্ভ করুন।

আপনে আমগ বাঁচাইলেন সাজী মশায়। একটা পয়সাও দিবার পারি নাই বইলা আপনার ধারে কাচে যাই নাই। দয়াল চানই আইজ আপনারে টাইনা আনচে ইদিগে, করিম উদাসীন থেকেই মন্তব্য করে।

নিতাই হুঁকোটা বেড়ার গায়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আসি তাহলে আজ। টাকার দরকার হলেই জানাবেন। কোনরকম সংকোচ করবেন না।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে খেয়াঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে নিতাইকে। ঝিমিয়ে-পড়া প্রাণে আবার জোয়ার আসে। আবার চরের ক্ষেত ভরে উঠবে সোনার ফসলে।...

মাত্র পঞ্চাশ টাকা সম্বল করেই পাট চাষ আরম্ভ করে দেদার। বোনা এক রকম করে হয়ে যায়। কমলী আছে তাই রক্ষা। তিন সের সাড়ে তিন সের দুধ দেয় কমলী। ও থেকেই আসে তেল নুন মসলা-পাতির পয়সা। ঠেকলে দু' পাঁচ সের চা'লও কেনা চলে। কান্দনী ঘোষের লোক রোজ ডিঙি বেয়ে এসে দুধ দুইয়ে নিয়ে যায়। নিঃশেষেই নিয়ে যায়। বাড়ির ছেলেপুলেগুলোর আঙুল চোষাই সার হয়। তা আর কি করা যায়, দুধ খেয়ে তো আর পেট ভরবে না। পেট ভরাতে চাই নুন-ভাত—গুড়-মুড়ি।

বৈশাখের শেষ-শেষ ক্ষেতে নিড়ানি পড়বে। আবার চাই মুঠো ভর্তি টাকা। সময়মতো নিড়িয়ে দিতে না পারলে আগাছাই বাড়বে, পাট যাবে তলিয়ে। কিন্তু টাকা কোথায়? হাতে যে একটা পয়সাও নেই। মুগ, মটর, কলাই যা হাতে ছিল তাতে এ পর্যন্ত নুন-ভাত কোনরকমে জুটেছে। কমলীই সব রাস টেনে চলেছে। নিড়ানির পয়সা কোত্থেকে পাওয়া যাবে? রবিশস্যের দর ভাল থাকলেও না হয় কথা ছিল। কলাই তো গঞ্জের মানুষ গরুকে খাওয়ানোর জন্য কিনছে। মাটির দর বললেই হয়। তিন মণ কলাই বেচলে এক মণ ধান পাওয়া যায়। বাছ-পাট উঠতে এখনো মাস দুই দেরি। এ দু'মাস হাঁড়ি চড়বে কী ভাবে তাই-ই এক ভীষণ সমস্যা। মোড়লরা তো পাট বুনবে না বুনবে না করেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত জমিতেই পাট বুনেছে। তাদের বোনা-নিড়ানো নির্বিঘ্নেই চলছে। গঞ্জের বড় মহাজন নিতাই সাহা তাদের সহায়। হাঁ করতে থলে ভর্তি টাকা বাড়ি বয়ে এনে দিয়ে যায় নিতাই। মরতে মরবে ছোটরাই। দশবার গদিতে গিয়ে ধর্না দিলেও দু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায় না। কি আহাম্মকিই না হয়েছে সমস্ত জমি পাটের করে। আধা-আধি যদি ধানের থাকতো তাহলে আর খাবার ভাবনা থাকতো না।...অনেক ভেবে চিন্তে দেদার ঋণের জন্যই ধর্না দেয়। মহাজন রসিক ঘোষের কাছে সুদের হার একটু চড়া হলেও ছোটরা একমাত্র তার কাছেই আমল পায়। দেদারও রসিকের শরণাপন্ন হতেই মন স্থির করে।

শনিবারের হাটবার। চরের চাষী মাত্রই পণ্য নিয়ে গঞ্জে যায়। সকলে

মিলে নৌকো ঠিক করেছে। গোটা বর্ষা ওতে করেই যাতায়াত চলবে। যার যেমন পণ্য তাকে সেই পরিমাণে পয়সা দিতে হবে। নৌকো ছাড়া এক পা-ও কোথাও যাবার উপায় নেই। নৌকোই চলাফেরার একমাত্র সম্বল। দেদার সকালেই একটা ডুব দিয়ে নুন-পান্তা নিয়ে বসে। বউ তাহেরা একটা পেঁয়াজ ছাড়িয়ে দেয়। ইচ্ছে করলে গরম ভাত বেঁধে দিতেও পারতো তাহেরা। কিন্তু দেদার মত দেয়নি। এত সকালে গরম ভাত খেয়ে পোষাবে না। হাটে বাজারের কাজে পান্তা খেয়ে শান্ত হওয়াই ভাল। মেজাজও ঠিক থাকে, খিদেও মরে।....

পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে তিন থাবায় খেয়ে ওঠে দেদার। তাহেরা এক খিলি পান আর হুঁকোটা এগিয়ে দেয়। দাওয়ার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে বেশ আমেজের সঙ্গেই হুঁকো টানতে থাকে ও। মেজাজটা আজ সবদিক থেকেই খুশী—নিড়ানির জন্য আর ভাবনা নেই। গত হাটেই রসিক সম্মত হয়েছে। এখন টাকা ক'টা এনে কাজে লাগাতে পারলেই হয়। লোকে তো বলছে, পাটের দর এবার চড়া যাবে। এক সাল মন্দা গেলে তার পরের সাল ভাল না হয়ে যায় না। তা যদি হয় তাহলে আর ভাবনা নেই। সব ক'টা টাকা দিয়ে ধানের জমি করতে হবে আগে। তা হলেই নিশ্চিন্ত। পাট থেকে আসবে বাড়তি খরচার পয়সা—ধানে সংসার চলবে।....

দেদারকে প্রসন্ন দেখে তাহেরা হাটের সওদার জন্য ফর্দ পেশ করে। নুন আর লঙ্কা এই হাটেই আনতে হবে। চাল যা আছে তাতে সামনের হাট পর্যন্ত চলে যাবে।

ফর্দ পেয়ে দেদার আজ আর বিরক্ত হয় না। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আইচ্ছা, আনন যাইব নে। আর কিছু ত লাগব না? যা কইবার একবারে কও। শ্যাষটায় য্যান আবার পিছনে ডাইকো না, শুব কামে যাইবার নৈচি।...

হেসে তাহেরা বলে, আনলে ত কত জিনিষই আনন লাগে। তবে আর কাম নাই। নুন লঙ্কা অইলেই চলব।

গিন্নীর উত্তরে খুশীই হয় দেদার। নবীর মা হিসেবী বলেই এখনো সংসার চলছে। নয়তো কবে যেতো তাদের ঘর ঝড়ে উড়ে...

নবীর বড় আদর দেদারের কাছে। কোলের ছেলে, ছোটবেলায় বেশ দেখাতো ওকে। খোদাই করা নাক, মুখ—হৃষ্টপুষ্ট। বড় হয়ে দিন দিন কেমন

যেন মেদা মেরে যাচ্ছে। কে দেখে বলবে পাঁচ বছরের ছেলে। ঠিক যেন বছর তিনেকের বাচ্চা। পেট মাথা ফুলে ঢোল, বুক যাচ্ছে শুকিয়ে। আর হবে না-ই বা কেন? জন্মে অবধি তো দুধ কাকে বলে চোখে দেখেনি। বড় দুঃখ হয় দেদারের নবীর দিকে চাইতে। এতটা বয়েস হলো ভাল একটা জামাও দিতে পারলো না।...হুঁকো খেতে খেতে নবীকে বাঁ হাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে থাকে দেদার।

নবী ওকে খুশী দেখে বায়না ধরে, আমি তোমার লগে যামু বাজান।

ওর দু'গালে দুটো টোকা দিয়ে দেদার বলে, কিয়ের লেইগা যাবি বাজান? আমি যে আটে (হাটে) যাই।

আমিও আটে যামু।

বুচ্‌চি, জিলাবী খাইবার মতলব। তা তর যাওয়ন লাগব না। আমি দুইখান জিলাবী অনুম নে তর লেইগা।

না, আমি তোমার লগে যামু।

তাহেরা কাছে দাঁড়িয়েছিল। নবীর আবদারে ধমক দেয়, কিয়ের লেইগা যাবিরে তুই রৈদ্রে রৈদ্রে? কইলই না জিলাবী আনব।

মার কাছে ধমক খেয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে দাঁড়ায় নবী। আর কিছু বললে হয়তো কেঁদেই ফেলবে। দেদার ওকে সান্ত্বনা দেয়, ন রে বাজান ন। নায়ের মধ্যেই যাবি তার আবার রৌদ্রে কি করব! খারইয়া রইলা ক্যান, তাও না ছ্যামরারে জাইঙ্গাডা পরাইয়া?

হ, আল্লাদ দিয়া দিয়া তুমিই ত পোলাডার মাতা খাইলা, দেদারের উদ্দেশ্যে মুখ ঝামটা দিয়ে প্যাণ্ট আনবার জন্য ঘরের ভেতরে যায় তাহেরা।

বেলা দশটা নাগাদ পণ্য বোঝাই চরের নৌকো গঞ্জের ঘাটে এসে লাগে। হাট মাত্র জমতে শুরু হয়েছে। দেদারের তেমন কিছু মালামাল নেই। ছোটবড় গোটা দশেক মিষ্টি কুমড়ো মাত্র সম্বল। ঘণ্টা খানেকের ভেতরেই খুচরো বেচে ফেলে। পাইকাররা অনেক ঝকাঝকি করেছিল। কিন্তু দেদার ওদের কাউকে বেচে নি। একে ত পয়সা কম তাতে আবার দাম দেবে শেষ বেলায়। না না, ওসব বাজে ঝামেলায় আজ আর ও যাবে না। যা পায় নগদাই বেচবে।...দর বেশ ভালই পাওয়া গেলো। ন'টা কুমড়োতে মোট দশ আনা হলো। সবচেয়ে বড়টা আর বেচলে না। ওটা হাতে করেই রসিকের বাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা হয়। নুন আর লঙ্কা নৌকোয় উঠবার আগে কিনলেই হবে'খন। কিন্তু নবীর মুখখানা যে এরই মধ্যে শুকিয়ে উঠেছে। বেচারা, মিষ্টি খাবার লোভেই এতটা পথ এসেছে।....পথে কান্দনী ঘোষের দোকানে বসিয়ে এক আনা দিয়ে দুটো বড় রসগোল্লাই কিনে দেয় ওকে দেদার। পয়সায় দু'খানা করে জিলিপি তো অনেক দিনই খেয়েছে। আজ যখন এসেছে ও তখন রসগোল্লাই খাক। বেঞ্চের ওপর বসে কলার পাতায় করে একদমে রসগোল্লা দুটো খেতে থাকে নবী। দেদার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি টানে। নবীর খাওয়া হয়ে গেলে ওকে সঙ্গে করে টানবাজার থেকে একখানা তমসুক কাগজ কিনে দ্রুত পা চালিয়ে দেয় রসিকের বাড়ির দিকে।

দুপুরের আহার শেষ করে গদির ওপর বসে তামাক টানছিল রসিক। মনে মনে হয়তো সুদের অঙ্কই আওড়াচ্ছিল। দেদার এসে উপস্থিত হয়। কুমড়োটা মেঝেয় নামিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আদাব জানায়। বড় ভাল সময়ে এসেছে ও। গদি একদম ফাঁকা। ভিড় হবে আবার সেই বিকেলের দিকে। হাটুরেরা সব হাটের বেচা-কেনা শেষ করে আসবে টাকা কর্জ করতে।

কুমড়োটার আকৃতি দেখে রসিক প্রশ্ন করে, কতো দিয়ে আনলিবে দেদার? বেশ পুরুষ্টু তো!

দেদার বলে, কি য্যান্ কন্ কত্তা! কুমড়া আবার আমরা কিনা খামু নাহি! আমাগ বাড়ির চালে ঐচে। আপনার সেবার লেইগা লইয়া আইলাম।

না না না, এ তোর ভারী অন্যায়। রোজ রোজ এটা-সেটা দিবি ক্যান্! নিয়ে যা তুই, কুমড়োর কোন দরকার নেই আমাদের, রসিকের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

দেদার হাত জোড় করে মিনতি জানায়, বাড়ির জিনিষ হাউস (সখ করে) কইরা আনচি। গরীব বইলা যদি ফিরাইয়া দ্যান তাইলে আর কি করুম।

ঐতো তোদের এক কথা, গরীব। বেশ, এনেছিস আজ নিচ্ছি। তবে আর কোনদিন কিন্তু কিছু আনবি নে। দেদারের মিনতিতে মনে মনে খুশী হলেও কৃত্রিম আভিজাত্যই বজায় রাখে রসিক। কুমড়োটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নবীর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে, এটি আবার কে রে?

দেদারের ঠোঁটে হাসি খেলে। লজ্জা জড়িত কণ্ঠেই জবাব দেয়, আমার ছোট ছাওয়াল, নবী। বাড়ীর থেইকা বাইরনের সময় কিছুতেই পাছ ছাড়ল না।

তা বেশ—বেশ। ছেলে তো তোর খাসা হয়েছে দেখছি। কিন্তু এত রোগা করে ফেললি কি করে?

আর কন্ ক্যান্ কত্তা। দিন রাতই খালি খাইব আর হাগব। আমাগো চাষার গরের (ঘরের) পোলাপানের কথা ত জানেনই।

তা কিছু ভাবিস নে। ও খেতে-নিতেই ভাল হয়ে যাবে। এক সময় সকলের ঘরের ছেলেপুলেরাই ওরকম করে। ওরে কালী, দেদারের ছেলে এসেছে। তোদের গিন্নীমাকে কিছু খেতে দিতে বল। দেদারের কথার জবাব দিয়ে ভৃত্য কালীর উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ে রসিক।

দেদার অপ্রস্তুত হয়ে বাধা দেয়, না কত্তা, অরে আইজ আর কিচু খাইবার দিবেন না। বাজারের থেইকা আইবার সময় কান্দনী ঘোষের দোকানে জল খাওয়াইয়া আনচি। একদিনে বেশী খাইলে প্যাট ছাড়ব।...

আরে না না। বাড়ির জিনিষ খেলে কিছু হবে না। তা ছেলের কি যেন নাম বললি?

আর কত্তা, আমাগ আবার নাম ধাম! নবী বইলাই হগলে ডাকি অরে।

কেন রে, নবী তো বেশ খাসা নাম! বোস রে বাপ, দেদারকে তারিফ করে নবীকে বসতে ইঙ্গিত করে রসিক।

নবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ চারদিকের দেয়ালের শোভা দেখছিল। কত বিচিত্র রকমের পট। পেট মোটা গণেশ ঠাকুরকে দেখে ওর তো গা ছমছম করতে থাকে। কে জানে, শুঁড় দিয়ে যদি গলায় একটা হেঁচকা টান মারে! লক্লক্ করছে মা কালীর টুকটুকে জিভ। ভয়ে কেমন যেন থ' মেরে গেছে বেচারা। মুখ দিয়ে একটা কথাও সরে না। দেদারের গা ঘেঁষে কোনরকমে চুপচাপ বসে থাক।

কালী ইতিমধ্যে একটা বেতের কাঠার মধ্যে মোয়া, মুড়ি, মুড়কি নিয়ে হাজির হয়। পরিমাণ যা হবে তাতে শুধু নবীর একার নয়, দেদারেরও পেট ভরবে।

গিন্নীর কাণ্ড দেখে রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে রসিকের। ছোট্ট একটা বাচ্চা খাবে, শুধু দু'টো মোয়া পাঠালেই হয়ে যেতো। তা না, বাটি ভর্তি মুড়কি দেওয়া হয়েছে। ওদের আর কি, নিজেরা তো উপার্জন করে খায় না! পরের ধনে পোদ্দারি সকলেই করতে পারে।...কিন্তু করা যাবে কি? দিয়ে যখন ফেলেছেই তখন আদর আপ্যায়ন করাই ভাল। খোলাখুলিই বলে রসিক,

নে রে দেদার, ছেলে নিয়ে খেয়ে নে। দলিলের কাগজ এনে থাকিস তো রে, লেখাপড়াটা এই ফাঁকে সেরে নিই।

দেদার লুঙ্গির গোঁজা থেকে তমসুকখানা বার করে। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, রোজ রোজ খাওয়ন কিসের কত্তা! অরে একটা মোয়া দ্যান খালি। আমি এহন কিছু খাইবার পারুম না।

রোজ আবার তোর ছেলে এল কই রে! টাটকা তিলের মোয়া, খেয়ে দেখ, ভাল হয়েছে।

হ, গিন্নীমার হাতের জিনিষ তুখার অয়। গেলো বার দিচিলেন, মনে নাই?

গতবারের চেয়েও এবার ভাল হয়েছে। আর দেরি করিসনে, খেয়ে নে। আমি এদিকের কাজ সারি।

তা যদি কন তয় বাড়িই লইয়া যাই। হগলেই চাইখা দেখবনে।

বেশ, তবে তাই নিয়ে যা।

দেদার কাঠাসুদ্ধু মোয়া মুড়কি গামছায় বাঁধতে যায়। নবীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে রসিক বাধা দেয়, ও কিরে! তুই যে সবগুলোই বেঁধে ফেলছিস! ওর হাতে দুটো মোয়া দে!

দেদার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা মোয়া নবীর হাতে দিয়ে বলে, না কত্তা, এহন দুইডা দিলে আবার বাড়ি গিয়াও ছাড়ব না। এহন একটাই খাউক।

খুব সন্তুষ্ট না হলেও নবী কোনরকম গোলমাল করে না। ছোট ছোট দাঁত দিয়ে কচকচ শব্দে কামড়িয়ে খেতে থাকে হাতের মোয়াটা।

রসিক দলিল লেখায় মন দেয়। কুড়ি টাকার ঋণ পত্র। দৈনিক টাকা প্রতি দশ পয়সা সুদ।

মোয়াটা সম্পূর্ণ খেয়ে জলের জন্য বায়না ধরে নবী। নিজেকে বড় অপ্রস্তুত মনে হয় দেদারের। এখন আবার জল পায় কোথায়? বাবুদের ঘটি গেলাসে তো আর জল খাওয়া চলবে না!···কিঞ্চিৎ বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চুপ কর। নায়ে গিয়া খাইচনে।

নাক ডুবিয়ে দলিল লেখা শুরু করলেও কথাটা কানে যায় রসিকের। নবীকে কিছু না বলে উল্টো দেদারের ওপরেই দাঁত খিঁচোয়, ওকে ধমকাচ্ছিস কেন? ছেলেমানুষ, মিষ্টি খেয়েছে জল খাবে না?

দেদার কাঁচুমাচু হয়েই জবাব দেয়, নায়ে গিয়াই খাইবনে কত্তা। দয়া কইরা তড়াতড়ি একটু ছাইড়া দ্যান আমাগ!

খুব বুদ্ধি তো তোর! তেষ্টা পেয়েছে এখন আর জল খাবে দু'ঘণ্টা পরে! ঐ বদনাতে ভাল জল আছে, ছেলেকে খাইয়ে দে, তাকের ওপরের পিতলের বদনাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রসিক।

স্নানের সময় তেঁতুল আর বালি দিয়ে নিজের হাতে বদনাটা মেজেছে রসিক। ঝক্‌ঝক্ করছে। একটাতেই দু'কাজ চলে যায়। নিজের শৌচের কাজ আর খাতকদের জল খাওয়া।

পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই বলে ঢালা হুকুম পেয়েও তেমন উৎসাহ বোধ করে না দেদার। ওরা তো জল খায় মাটির সানকিতে আর না হয় কলাইয়ের গ্লাসে। কর্তা হয়তো দায়ে পড়েই বদনাটার জাত মারতে দিচ্ছেন। ইতস্ততঃই করতে থাকে দেদার।

নবীর ঘ্যান-ঘ্যানানি বেড়েই চলে। দেদার তবু উঠে গিয়ে বদনাটা ছুঁতে সাহস পায় না।

রসিক আবার ধমক দেয়, কই রে, ছেলেকে জল দিলিনে?

দেদার আর বসে থাকতে পারে না। সংকোচের সঙ্গেই উঠে গিয়ে বদনাটা নামিয়ে নিয়ে আসে।

রসিক পুনরায় দলিল লেখায় মন দেয়।

জল খেতে খেতে নবী তো অবাক। এ আবার কি জিনিষ! বাড়িতে তো জল খায় কলাইয়ের গ্লাসে। এ রকম ঝকঝকে জিনিষ তো কোনদিন দেখেনি! মোয়ার চেয়েও অদ্ভুত ঠেকে বদনাটা নবীর কাছে। এ জিনিষটা ওর চাই-ই। হ্যাঁ, এইটেই নেবে ও···বাপের কাছে ঘুন্‌ঘুন্ শুরু করে, বাজান, ইডা আমি নিমু।

ছেলের আব্দার শুনে দেদারের চক্ষুস্থির। বলে কি বেটা! কর্তা যে জল খেতে দিয়েছেন এই তো ওর বাপের ভাগ্যি। উনি শুনলে ভাববেন কী!···চোখ টিপেই ছেলেকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। নবীর বায়না বেড়েই চলে। এতক্ষণ ঘুন্‌ঘুন্ করছিল এবার কান্নার স্বরেই ধ্বনি তোলে, অ বাজান, আমি এইডা নিমু। অ বাজান···

দেদার ফাঁপরে পড়ে। বিরক্তির সঙ্গেই ধমক দেয়, চুপ কর হারামজাদা। ইডা দিয়া কি করবি রে?

রসিক দলিল লেখায় ব্যস্ত থাকলেও নবীর আব্দার কানে পৌঁছুতে বিলম্ব

হয় না। এতক্ষণ দম ধরে থেকে বদনাটার পরকাল সম্বন্ধেই শুধু ভাবছিল। না, হতাশ হবার কিছু নেই। সামান্য একটা পেতলের বদনা। বড় জোর পাঁচ সিকে দেড় টাকা দাম। ওটা ও দিয়েই দেবে নবীকে। হ্যাঁ স্বত্ব ত্যাগ করেই দিয়ে দেবে। মনের জোর নিয়েই দেদারকে প্রতিরোধ করে, কিরে, ওকে অতো ধমকাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?

না কত্তা, কিচু অয় নাই। একটু হকাল কইরা ছাইড়া গ্যান আমাগ, বেলা গেল।

কিছু হয়নি মানে! আমি বুঝি শুনিনি! তুই আচ্ছা লোক তো! ছেলে-মানুষ, সামান্য একটা বদনার বায়না ধরেছে তার জন্যই গালাগাল করছিস! নেরে বাপ্, তুই ওটা নিয়ে যা, দাতা কর্ণের মতোই কথাগুলো ঝরে পড়ে রসিকের তরফ থেকে।

নবীর মুখে হাসি খেলে। দেদার তো ভেবেই পায় না, স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি-সত্যি কর্তার মুখ থেকেই কথাগুলো শুনছে ও! যে মানুষ সুদের একটা কানাকড়ি ছাড়ে না সে মানুষ দামী বদনাটা দিয়ে দিচ্ছেন নবীকে!...

রসিক হয়তো দেদারের মনোভাব বুঝতে পেরেই বলে, ওরে, ব্যবসা করি বলে কি আমি মানুষ নই! মায়া মমতা বলতে কি আমার কিছু নেই তুই বলতে চাস? আমার ঘরেও বাচ্চা-কাচ্চা আছে। ওটা ওকে আমি প্রাণ খুলেই দিলাম।...

দেদার আর ভাবতে পারে না। নতুন করে যেন বেহস্তের দ্বার খুলে যায় ওর চোখের ওপর। আবেগের সঙ্গেই উত্তর করে, আপনাগ দয়াতেই ত বাইচা আচি কত্তা। ই পোলাপানও আপনাগই।

আবেগের উত্তর আবেগের সঙ্গেই দেয় রসিক, সবই তাঁর ইচ্ছা রে—সবই তাঁর মর্জি। তুই কোন দ্বিধা করিস নে, হাতে করে নিয়ে যা। ছেলেপুলে সন্তুষ্ট হলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। আর এই নে টাকা কুড়িটে। এখানে একটা টিপসই দে।

দেদার বশীভূতের মতই সব করে যায়। টাকাগুলো টেঁকে গুঁজে ছেলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়েই রসিককে হাত তুলে আদাব জানায়।

বাজানের দেখাদেখি নবীও হাত তোলে। বদনাটা নিজেই বয়ে নিয়ে চলে ও। ওটা আর কারো হাতে দেবে না। কিছুতেই না। এতো বদনা নয়, সাত রাজার ধন গুপ্ত মাণিক। নবীর মুখ চোখ খুশীতে ডগমগ।

রসিক উঠে এসে হাত দিয়ে ওর গাল টিপে দেয়। হাসতে হাসতেই বাপ বেটা বেরিয়ে আসে গদিঘর থেকে।

চরে ফিরে এসে বদনাটা সকলকে ডেকে ডেকে দেখাতে থাকে নবী। বদনার জল ছাড়া এখন আর জল মুখে দেয় না ও। শিয়রে বদনাটা না থাকলে ঘুমোয় না। কাউকে হাত দিয়ে ছুঁতে পর্যন্ত দেয় না।

বৈশাখের পর দেখতে দেখতে আষাঢ় আসে। পাটের ফলন মন্দ হয় নি। আশানুরূপই প্রত্যেকে বাছ-পাট পায়। এখন দর উঠলেই সব জ্বালার অবসান। সামনেই রথযাত্রা। পাট ব্যবসায়ীদের প্রশস্ত দিন। সকলেই তৈরী হতে থাকে। মহাজনরাও ওতপেতে আছে। চাষী ঘরে টাকা উঠলেই নজেদের ভাগ বসাবে। গত সন শেষ মরশুম খা যাওয়ায় আদায় উশিল কিছুই হয় নি। এবার প্রথম পর্বেই সম্ভবমত টানতে হবে। তাছাড়া বাজারের কথা বলা যায় না। গাছ-পাটের দর যদি এবারও মন্দা যায় তা হলে চাষী তো মরবেই—মহাজনও অনেকে ঝুলবে। সুদের লোভে অনেকেই কম সুদে নিজেদের সোনাদানা বন্ধক রেখে বেশী সুদে লগ্নি করেছে। সুদখোরদের ধরণ ধারণই আলাদা।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল ঠিক তাই হলো। রথের মেলায় পাটের খরিদ্দারই নেই। রেলি ব্রাদার্স এবারও খরিদে নামলে না। কাঁড়ি কাঁড়ি পাট নিয়ে ফিরে আসে চরের মানুষ। মহাজনকে কিছু দেওয়া তো দূরের কথা নিজেদের কি দিয়ে কি হবে তাই এক সমস্যা। মাসখানেক পরেই গাছ-পাট লাগছে। কাটাই, বাছাই, ধোলাইএ খরচা কম নয়। চরের মানুষ মাথায় হাত দিয়ে বসে। তাগাদার ভয়ে কেউ আর ইদানীং হাটে বেরুচ্ছে না। দেদারও দিনকয়েক পালিয়ে চলে। কী বলবে গিয়ে ও রসিককে। বিপদে শুধু টাকাই ধার দেয়নি রসিক। স্নেহবশত নবীকে বদনাটা পর্যন্ত দিয়েছে। ও যে বরাবর বলে অসছে, বাছ-পাট বেচে কিছু দেবে তাকে। এখন কী উপায় হবে—ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ঘুম হয় না দেদারের।

দেদার পালিয়ে চললেও রসিক বুক ফুলিয়েই একদিন এসে চরে হাজির হয়। বেশ সুযোগই মিলেছে। দেদার গদিতে এসে দেখা করলে চরে আসতে সংকোচই হতো ওর। কিন্তু ভগবানই ওকে সে লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছেন। কোলের ছেলে শিবুকে সঙ্গে করেই একদিন ভোরে এসে

উপস্থিত হয় রসিক দেদারের বাড়িতে। মাত্র বছর পাঁচেক বয়েস শিবুর। বাপের সঙ্গে চরে যেতে কোন আকর্ষণই নেই ওর। কিছুতেই ও যাবে না। কিন্তু রসিক নাছোড়বান্দা, যেতেই হবে ওকে ওর সঙ্গে। বড়ের কিস্তি বড়ে দিয়েই দিতে হবে। বেটা, টাকা বদনা গিলে দিব্যি ডুব দিয়ে আছে। দেখা যাক, নরুনের বদলে নাক আদায় হয় কি না।...প্রথমে মিষ্টি কথা, তারপর শাসানি, সর্বশেষ নগদ এক আনা খরচ করে দু'টো রসগোল্লা কিনে হাতে দিতেই অবাধ্য শিবু বশ মানে। দিব্যি গট্‌গট্‌ করতে করতেই বাপের হাত ধরে গিয়ে নৌকোয় ওঠে। বর্ষায় বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। ভীষণ স্রোতের টান। খানিকটা উজিয়ে গিয়ে পাড়ি দিতে হবে। সময় সাপেক্ষ। রসগোল্লা দুটো খাওয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়ে যায় শিবুর। আবার নেমে যেতে বায়না ধরে। বিচক্ষণ রসিকের এ পাট জানা ছিল। বুদ্ধি খরচ করে আগে থেকেই সে তাই তৈরী হয়ে আছে। রব তুলে কান্নার আগেই পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙাটা বার করে রসিক। শিবুর আজ পোয়াবারো। একটা না শেষ হতেই আবার একটা খাবার জুটছে। কই, বাবাকে তো এর আগে কখনো এমনটি দেখেনি ও। আজ তাহলে অনেক মজা আছে। ঠোঙাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে শিবু।

বৈরাগী খালের বাঁকটা ঘুরতেই দেদারের বাড়িটা সোজাসুজি নজরে পড়ে। চার পাঁচখানা খড়ের ঘর নিয়ে বাড়িটা। চারদিক জুড়ে কলাবাগান। বংশীর বুকের ওপরে যেন ভাসছে। ঘাট থেকে ভিটির ওপর উঠতেই একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে কমলী। খানিক আগেই কান্দনীর লোক এসে সবটুকু দুধ নিংড়ে নিয়ে গেছে। বাছুরটা দুধের তেষ্টায় বার বার বাঁটে মুখ লাগাচ্ছে। কিন্তু দুধ না পেয়ে থেকে থেকে মাথা দিয়ে গুঁতোচ্ছে। বিরক্তিতে কমলীও মাঝে মাঝে লেজের বাড়ি মারছে—পা ঝটকা দিচ্ছে। কালো হাড় জিরজিরে বাছুর—কপালে সাদা চাঁদের টিপ। তাড়া খেয়ে ছুট দেয়।

রসিক দূর থেকেই আঙুল দিয়ে দেখায় শিবুকে। বাছুরটা দেখে শিবুরও খুব ভাল লাগে। অবাক হয়েই চেয়ে থাকে দেদারের বাড়ির দিকে। রসিক মনের ভাব বুঝতে পেরে জিজ্ঞেস করে, ওটা তুই নিবি শিবু?

হুঁ, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায় শিবু।

খুশী হয়ে রসিক বলে, তাহলে চল, আগে ওটা নিয়ে আসি।

ত-ল, (চলো) শিবুর উৎসাহ বেড়ে যায়।

রসিক আবার জিজ্ঞেস করে, বাছুর তো নিবি, ওর মাকে নিবি না ?

না।

না কি রে! মাকে সঙ্গে না নিলে যে বাছুর তোর সঙ্গে যাবেই না।

তা অলে অর মাকেও নেব।

বেশ বেশ। কি বলবি বল তো ?

শিবু কোন উত্তর দিতে পারে না। ফ্যালফ্যাল করে রসিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রসিক বলে, বলবি, বাবা আমি গরু নেবো—বাছুর নেবো। কেমন বলতে পারবি নে ?

হুঁ, শিবু আবার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়!

রসিক খুশীতে গদগদ হয়ে মাঝিকে দেদারের ঘাটে নৌকা ভেড়াতে বলে।

উঠোনে বসে কমলীর জন্য নতুন দড়ি পাকাচ্ছিল দেদার—নৌকা ঘাটে লাগতেই আঁৎকে ওঠে। রোজ এই আশংকাই করছিল ও। কিন্তু কি করবে। এখন তো আর পালাবার পথ নেই। হাতে পায়ে ধরে যদি রেহাই পাওয়া যায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় দেদার। খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে দাওয়ার ওপর বসতে দেয়। বাড়ীর ভেতরে ছোটে জলছাড়া বড় হুঁকোটার খোঁজে।

রসিক পেছন থেকে বাধা দেয়, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না রে দেদার। আমরা এক্ষুনি উঠবো। ও নৌকায় বেড়াবে বলে বায়না ধরেছিল, তাই ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম।

দেদারের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে। যাক, কর্তা তাহলে তাগাদায় আসেন নি। কিন্তু কি দিয়ে খাতির করে খুদে কর্তাকে। ঘরে তো গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু নেই! একটু আগে এলেও না হয় কান্দনী ঘোষের লোকের কাছ থেকে পোয়াটাক দুধ রাখা যেত। কিন্তু এখন কি করা যায়…তবু সবিনয়েই বলে, বেড়াইতে আইচেন তয় এত তড়াতড়ি কিসের ? সিদা দেই রান্না-বান্না করেন।

আরে না না, তোকে অতো ব্যস্ত হতে হবে না। পারিস তো এক ছিলুম তামাক দে।

দেদার তাড়াতাড়ি তামাক সেজে দেয়।

হুঁকো টানতে টানতে রসিক জিজ্ঞেস করে, রথের বাজার এবার কি রকম গেলো রে দেদার?

আর কত্তা কন ক্যান্। বাজার আর কই। হগলেই ত পাট ফেরত লইয়া আইচে।

তবে তো দেখছি কিছুই দিতে পারবিনে।

তাই কন কত্তা, আপনাগই কী দিমু আর আমরাই কী খামু?

কথা তো ঠিকই বলছিল, তবে তোদের সঙ্গে আমাদেরও যে মরতে হবে দেখছি।

হগলেই ইবার মরব কত্তা। চরের কেউ আর বাঁচব না।

দেখ, গাছ পাটের দর ওঠে কি না!

আর উঠচে, আমরা মরলে যদি ওঠে।

ঈশ্বরকে ডাক, তিনি ছাড়া আর কে রক্ষা করবে। আজ উঠি রে তাহলে।

কন কি কত্তা! ছোটকত্তায় আইল, হুদা মুখে যাইব!

তোর মন যা চায় দে ওকে খেতে।

কি আর দিমু কত্তা, ঘরে ত গুড় মুড়ি ছাড়া কিচুই নাই!

কেন রে, গুড় মুড়ি কি খারাপ জিনিষ হলো নাকি! বাড়িতে আবার কী খাই আমরা? ও খায় তো তাই দে ওকে।

দেদারের দুশ্চিন্তা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। না, কত্তার দেখছি আমাদের ওপর টান আছে। গুড় মুড়িতেও কোনরকম আপত্তি নেই, হন্তদন্ত হয়েই বাড়ির ভেতরে ছুটে যায়।

শিবুকে একা পেয়ে উস্কাতে চেষ্টা করে রসিক, কী রে, তুই বলে গরু বাছুর নিবি, কিছু বলছিস নে যে?

শিবুর এখন আর কমলীর ওপর কোন ঝোঁক নেই। লাল ঝুঁটিওলা গোটা কয়েক মোরগ ঘুরে বেড়াচ্ছে উঠোনের ওপর দিয়ে। পাখনার রংয়ের কি বাহার। ভারি আশ্চর্য ঠেকে ওর। জীবনে কখনো এতো সুন্দর পাখী দেখেনি। পাটি থেকে উঠে মোরগের পেছু পেছুই ছুটতে থাকে। রসিকের প্রশ্নের কোন উত্তরই দেয় না।

বড় বিরক্তি বোধ হয় রসিকের। এত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত সব গোল্লায় যাবে নাকি? ব্যস্তসমস্তভাবে পুনরায় শিবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে, শোন, দেদার এলে আমাকে বলবি, বাবা, আমি হাম্বা নেবো, কেমন?

না, আমি হাম্বা নেব না। ঐ-তা নেব, আঙুল দিয়ে বড় মোরগটার দিকে ইঙ্গিত করে শিবু।

রসিক বেকায়দায় [illegible] দাঁত খিঁচোয়, উঃ, ঐ-ত[illegible]ব! ওটা দিয়ে কি হবে রে হতভাগা? হাম্বা নে দুধ খেতে পারবি।

না, আমি হাম্বা নেব না, জেদ বেড়ে যায় শিবুর।

রসিক আর ধৈর্য রাখতে পারে না। চটাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর বাঁ গালে।

শিবু ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

কি অইল, কি অইল, বলতে বলতে দেদার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসে।

মোরগগুলো তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালায়। শিবুও কাঁদতে কাঁদতে পেছু নেয়।

হাসতে হাসতে দেদার মন্তব্য করে: ওয়া ত আপনারা ছুইবেন না কত্তা। নইলে ত এহনি একটা ছাড়াইয়া দিবার পারি।

রসিক সুযোগ বুঝে নাক সিঁটকায়, রামচন্দ্র, রামচন্দ্র! এটা কি একটা কথা হলোরে! নে, আর দেরি করিস নে। কী আনবি আন।

না কত্তা, আর দেরি অইব না! বাড়া অইয়া গেচে। আমি যামু আর আমু, দেদার আবার ছুটে বাড়ির ভেতরে যায়।

ফাঁক বুঝে রসিক শিবুকে পুনরায় ধমকাতে থাকে, কি রে হারামজাদা, হাম্বার কথা বললি নে যে?

না, আমি হাম্বা নেব না, শিবু অচল অটল।

ফের বজ্জাতি হতভাগা! আবার একটা চড় বসিয়ে দেয় রসিক শিবুর গালে।

শিবু আবার ডুকরে ওঠে।

দেদার নতুন একটা এ্যালুমিনিয়মের বাটিতে করে কিছু গুড় মুড়ি নিয়ে দৌড়ে আসে। ভাগ্যিস্ রথের মেলা থেকে বাটিটা এনেছিল তাহেরা। তা না হলে কিসের মধ্যে খেতে দিতো ছোটকর্তাকে। দেদার এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলেও শিবুকে কাঁদতে দেখে ফাঁপরে পড়ে। বিস্ময়ের সঙ্গেই রসিককে শুধোয়, আবার উনি কান্দে ক্যান কত্তা।

ওর কথা ছেড়ে দে। কত করে বারণ করলাম নৌকোয় বেড়িয়ে কাজ নেই। তা কে শোনে। এখন আবার এটা চাই, ওটা চাই, যত সব ঝামেলা।

কী চান উনি?

সে তোকে বলা যাবে না। এখন কী এনেছিস দে, গিলুক।

দোহাই কত্তা, আল্লার কিরা লাগে। কন, উনি কী চায়?

তুইও কি ক্ষেপে গেলি নাকি! ছেলেপুলের কথায় কখনো কান দিতে আছে?

তা হউক। আপনে কন, কী উনি চান?

আরে চাবে আবার কি! তোর ঐ গরুটা নাকি নেবে বজ্জাতটা।

দেদারের মাথায় যেন সহসা আকাশ ভেঙে পড়ে। হায় হায়, কী সর্বনাশের কথা! কমলীই তো সংসারের একমাত্র লক্ষ্মী। ও আছে তাই এখনো উপোস দিতে হচ্ছে না। ষড়যন্ত্র—সব ষড়যন্ত্র। বাপ বেটায় ষড়যন্ত্র করেই কমলীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে।...বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে দেদারের। সহসা চোখ পড়ে সামনের ঘরের দাওয়ার ওপর। সূর্য কিরণে ঝক্‌ঝক্ করছে বদনাটা। নবীর আব্বার মতো আজো তেঁতুল আর বালি দিয়ে যত্ন করে মেজেছে তাহেরা। দেদারের দু'চোখ বোধ হয় অন্ধ হয়ে যায়।

রসিক ওর মনের কথা বুঝে কৃত্রিমভাবে পাশ কাটাতে চেষ্টা করে—কই রে, হাঁ করে যে দাঁড়িয়ে রইলি। কী দিবি দে, বেলা হয়ে যাচ্ছে না!

দেদার মুড়ির বাটিটা শিবুর হাতে দেয়। শিবু বাটি হাতে করেই মোরগের পেছু পেছু ছুটতে থাকে। নিজে এক মুঠো মুখে দিলে তিন মুঠো ছিটিয়ে দেয় মোরগের দিকে, কমলীর দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। মোরগ নিয়েই মেতে ওঠে।

সাদাসিধে বুদ্ধি হলেও সবই বুঝতে পারে দেদার। এ চাল রসিকের নিজেরই। বদনা দানের কথানি হাড়ে হাড়ে বার করছে। কিন্তু—কি আর করা যাবে। শকুনির দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন দিতেই হবে। গত সনের টাকা সুদে-আসলে জমেছে। এবারও কম হবে না। টান দিলে যে কোনদিন সব কেড়ে নিতে পারে। কমলী তো দূরের কথা চাল-চুলো কিছুই থাকবে না। তবু যদি ক্ষুধিত দানবকে কিছু দিয়ে-থুয়ে সময় পাওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে বলে, কত্তা, আপনাগ দিবার পারি এমুন কি আচে আমাগ। তাই বইলা পেরথম দিন বাড়ি আইহা ছোট কত্তা সামান্য এক জোড়া গরু বাছুরের বায়না ধরচে পরাণ থুইলা তাই দিবার পারুম না! দোহাই কত্তা, কমলীরে আপনার ক্ষাওয়নই লাগব...

তুই কি সত্যি ক্ষেপে গেলি দেদার?—রসিকের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

দেদারের ইচ্ছে হয় শয়তানটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

কিন্তু পারে না। অতিথির সম্মান রেখেই অনুরোধ করে, কত্তা, গরু আপনাগ কাছে সাক্ষাইত ভগবতী। আপনাগ কাছে অর অযত্ন অইব না। আমি বালো কইরা খাওয়াইবার পারচিলাম না অরে। দয়া কইরা লইয়া যান।

কী যা তা বলছিস তুই! আমি চললেম, উঠে দাঁড়ায় রসিক।

একটু খারন কত্তা, আমি অরে লইয়া আহি, দেদার আর উত্তরের অপেক্ষা না করে কমলীর দিকে ছোটে।

কিস্তি সফল হওয়ায় রসিক রসিয়ে রসিয়েই হুঁকো টানতে থাকে।

বাছুরটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কলা-বাগানে ঢুকেছে। দেদার—'হাম্বা আয়—হাম্বা আয়,' ডাকতে ডাকতে গিয়ে খপ্ করে ধরে ফেলে। নতুন একগাছা পাটের দড়ি পরিয়ে দেয় গলায়।

উদ্‌গত অশ্রু অবরুদ্ধ রেখেই কমলীকে নৌকোয় তুলে দিতে যায় দেদার। নবী, তাহেরা দূর থেকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বদনাটা সূর্য কিরণে তেমনিই জ্বলছে। পথে যেতে যেতে হাম্বা লাফঝাঁপ শুরু করে। কমলী ঘাড় বাঁকা করে গোঁজ হয়ে থাকে। দেদার জোর করেই টানতে টানতে এগিয়ে যায়। পাঁজরার হাড়গুলো এক এক করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন ওর। শিবু মোরগের জন্য আছড়া-আছড়ি করতে থাকে। রসিক টানতে টানতেই ওকে নিয়ে নৌকোয় তোলে। হতভাগা নাক কাটালে আজ।

নৌকোয় ওঠার আগে লাফঝাঁপ দিতে শুরু করেছিল কমলী। কিন্তু নৌকোয় উঠে কেমন যেন থিতিয়ে পড়ে। বড় বড় চোখ তুলে করুণভাবে তাকিয়ে থাকে দেদারের দিকে। ক্ষোভে দুঃখে দেদারও মুষড়ে পড়ে। হালে চাড় দিয়ে নৌকো ছেড়ে দেয় মাঝি। স্রোতের টানে দেখতে দেখতে বাঁকের মোড়ে মিলিয়ে যায়। উদ্‌গত অশ্রু অঝোরে বইতে থাকে দেদারের দু'চোখ বেয়ে। বংশীর অতো জলেও বোধ হয় তার পরিমাপ হয় না।

॥ ৩০

চরের মানুষের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। পলান, দীনু, করিমের ভাবনার অন্ত নেই। দু'হাতে বুক চাপড়াতে থাকে। পাটের দর গত সালের চেয়েও এবার মন্দা। শেষ পর্যন্ত কোন বিদেশী ক্রেতাকেই বাজারে দেখা যায়নি। জাপান বোধ হয় পানিতেই ডুবে মরেছে। নিতাইয়ের কাছে সকলে মিলে

গিয়েছিল একদিন। সর্বনাশের জন্য মৃদু অনুযোগ জানাতেও ছাড়েনি। কিন্তু হলে কি হবে, এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে নিতাই। তার কি দোষ। কাগজে যা দেখেছিল তাই সে জানিয়েছিল মাত্র। বাজার তো আর তার হাতের মুঠোর মধ্যে নয়। কাজ কারবারের কথায় কে আবার নিশ্চয়তা দিতে পারে! সম্ভাবনা ছিল তাই জানিয়েছে।···

সকলে মিলে নিতাইকে দু'কথা শোনাতে গিয়েছিল উল্টো নিতাই-ই সকলকে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছে। শুধু নিজের পক্ষে সওয়ালই করেনি। টাকার তাগিদও দিয়েছে। বছরের পর বছর কৈফিয়ত শুনে তার পেট ভরবে না। সুদে-আসলে সমস্ত টাকাই তাকে শোধ করে দিতে হবে।

সহানুভূতি লাভের আশায় দুটো সুখ-দুঃখের-কথাই ওকে বলতে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু সহানুভূতির পরিবর্তে পেয়েছে তিরস্কার। ক্ষুধার রুটি চেয়েছিল জুটেছে প্রস্তর-খণ্ড। বরাত খারাপ, কিছু বলার নেই। টাকা ধার দেবার জন্য যে মানুষ চিরকাল চেষ্টা যত্ন করে এসেছে সেই মানুষই আজ বেপরোয়া। তাগাদা মৃদু হলেও তার ভেতরেই ওর হিংস্ররূপটি ফুটে উঠেছে। পলান নিজকে বড় অপমানিত বোধ করে। গোলায় যা পাট আছে তা বেচে আসল না হোক সুদের টাকা টেনেটুনে হয়ে যায়। নিতাই মুখে যাই কেন বলুক না সুদ পেলে আবার সব ভুলে যাবে। ওরা তো ছারপোকার জাত। অস্থিচর্ম চায় না। শুধু প্রাণের রসটুকুই ওদের কাম্য। অস্থিচর্ম নিয়ে যে যেভাবে পার বেঁচে থাক— শুধু রসটুকু যুগিয়ে যেয়ো। আসলের প্রয়োজন নেই, সুদ পেলেই যথেষ্ট। পলান ভাবে, এখনকার মতো তাই দিয়ে দেবে। তারপর খেয়ে না খেয়ে আর এক কিস্তিতে আসলও। যদি ফসল থেকে না পারা যায় তাহলে পরিমাণ মতো জমি বেচেই ঋণ মুক্ত হবে। ওসমান বয়সে ছোট হলে হবে কি, ঠিকই বলেছিল। দশ জায়গায় ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া কিছুটা কালির আঁচড়ও পেটে আছে। ছারপোকাদের চিনতে ও ঠিকই পেরেছে। কি থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছে। সামান্য হাজার চারেক টাকা সুদে-আসলে এখন নাকি দশ হাজারের ওপর দিতে হবে। ব্যাঙের ছাতাই যেন ফনফনিয়ে বাড়ছে দিনকে দিন। মনের বাসনা ওসমানকেও খুলে বলে পলান। কিন্তু না, ওসমান কিছুতেই রাজী নয়। সমস্ত টাকা দিয়ে দিলে নিজেদের চলবে কি করে! ধান তো ঘরে কিছুমাত্র নেই। সমস্তই কিনে খেতে হবে। তাছাড়া এত মোটা সুদ কেন দেবে নিতাইকে? আইনে এত চড়া সুদ আদায়ের রীতি নেই। সদরের রোহিনী মুক্তার আইন

ঘেঁটেই পরামর্শ দিয়েছেন।...ওসমান তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই উত্তর দেয়, সাজী মশয়রে কও গা, টেকা যদি ঘরে নিবার চায় তাইলে সুদ ছাইড়া দ্যাওয়ন লাগব। নইলে একটা ফুটা পয়সাও ঘরে যাইব না। হ্যাগ মতন মাইনষেরে কেমুন কইরা টিট্ করন লাগে তা আমি শিকা আইচি (শিখে এসেছি)।

পলান সাদাসিধে মানুষ। ওসব ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না। টাকা ধার করেছে টাকা শোধ দেবে। এতে আবার শেখা-শেখির কি আছে!...একটু বিরক্ত হয়েই ওসমানকে শুধোয়, কি আবার শিকা আলিরে?

ওসমান মনের উল্লাসেই মন্তব্য করে, শিকচি—শিকচি। ও হালা সুদ-খোররা যদি কতা না হোনে তাইলে একটা পয়সাও হালারা চরের থেইকা পাইব না।

আরে শিকচ্ কি তাই ক না, বিরক্তিতে খেঁকিয়ে ওঠে পলান।

ওসমান বলে, এমুন কিচু না। বুজাইয়া কইলে তুমিও বুজবার পারবা। হালারা যদি সুদ না ছাড়ে তাইলে সমস্ত ক্ষ্যাত খামার আম্মাজানের নামে বেনামী কইরা ফালাও। দেহি কি করবার পারে।

তুই কচ কি ওসমান! তিনকাল গেচে এককাল আচে এই বয়সে বেইমানী করুম! করাল কইরা টেকা আনচি, না দিলে কি ধম্মে সইব? ও কথা আর মুকে আনিচ না। নোকে (লোকে) হুনলে মুখে থুথু দিব।...

ওসমান তবু নিজের গোঁ ছাড়ে না। জোর দিয়েই বলে, নোকের (লোকের) মুকের কতায় কি যাইব আইব আমাগ। টেকা থাকলে হগলের মুখই বন্ধ করন যাইব। আর তা না অইলে......

মুখের কথা শেষ হয় না ওসমানের পলান গর্জে ওঠে, চুপ থাক হারামজাদা। অমুন বেইমানীর কতা আমার সামনে কইচ না। আমি কারুর মাথায় বাড়ি দিবার পারুম না।

না পার না পারবা। বেইচা কিনা সব দিয়া থুইয়া মাইন্‌ষের দুয়ারে দুয়ারে মালসা লইয়া মাগগা, সমতা রেখেই জবাব দেয় ওসমান।

মালসা লইয়া মাগুম ক্যারে। খোদায় আমারে হাত-পাও দেয় নাই? দরকার অয় খাইটা খামু।

হ, খাটলেই এত বড় সংসার চলব। ক্যান, তাহন যে কইচিলাম, দেনা কইরা রাজা উজীর অইবার কাম নাই। হ্যা কতা হুন্‌চিলা?

রাগের মাথায় ওসমানের গালে একটা চড় বসিয়ে দিতেই যাচ্ছিল পলান।

কিন্তু কি জানি কেন, শেষ পর্যন্ত তা পারে না। গলার স্বর কতকটা খাদে নামিয়েই বলে, আমি তগ বালোর লেইগাই সব করচিলামরে, খোদায় আমার মুক রাখল না।

হের লেইগাই ত কই, ও হালারা যেমুন কুকুর অগ লেইগা তেমুন মুগুরের ব্যবস্থা কর। কও ত আমি রুহিনী মুক্তারের লগে কতা কই।

না না না, অমুন কতা মুকে আনিচ না। ছল-চাতুরী কইরা কি খোদার কাচে ঠেকুম, পলান দৃঢ়ভাবে বাধা দেয়।

অভিমান ভরে ওসমান বলে, তবে মর, আমি আর কি করুম।

সত্যি, করার বোধ হয় আর কিছু নেই। সোনার সংসারে অলক্ষীর বাতাস লেগেছে। সবই হয়তো উবে যাবে। পলান চোখে মুখে অন্ধকার দেখে।

দীনুর অবস্থা আরো শোচনীয়। সংসারের আবিলতা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। টাকা-কড়ি জিনিষপত্রে কূল নেই। তাছাড়া আধা-আধি পাট আগুন লেগে পুড়ে যাওয়ায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়েছে। দর মন্দা বলে সমস্ত পাট মাচার ওপরে মজুত করা ছিল। কি করে যে আগুন লাগলো ভাবাই যায় না। আর একটু হলে পাট তো সম্পূর্ণ ই পুড়ে ছাই হয়ে যেতো সঙ্গে ঘর-দোর পর্যন্ত। শনির কোপই পড়েছে। নয়তো এমন হবে কেন। বাকি পাট বেচে এখন আর একটা পয়সাও মহাজনকে দেওয়া যাবে না। না খেয়ে থেকে মানুষ কি করে ঋণ শোধ করতে পারে।...ভাবনায় ভাবনায় কাঁচাপাকা চুলের সব ক'গাছাই দিন দিন সাদা হয়ে উঠছে দীনুর। কুসুমের মনেও শান্তি নেই। তা হলে কি ক্ষ্যান্তর কথাই সত্যি! ময়না অপয়া! বাড়িতে ওর পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে।...সারাদিন মুখভার করেই থাকে কুসুম।

আহ্লাদে আহ্লাদে মানুষ ময়না। শাশুড়ীর মুখ চোখের দিকে চাইতেও কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। আভাষে ইঙ্গিতে হলেও সবকথা বুঝতে ওর বাকি থাকে না। ওকে বিয়ে করেছে বলে নিশির আদর-যত্নও যেন দিন দিন কমছে। পার্বতী তো পারলে পাশ কাটিয়েই চলে। ওর ছেলেকে ছুঁতেও দিতে চায় না ওদের স্বামী স্ত্রীকে। একমাত্র বাড়ির কর্তা ঠিক আছে বলে মুখ ফুটে এখনো কেউ কিছু বলতে পারছে না। শাশুড়ীর তাড়নায় এর ভেতরেই তো হাতে গলায় গণ্ডা কয়েক মাদুলি উঠেছে। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় কে জানে?

দুর্গার মনেও সুখ নেই। ঋণের জ্বালা তো আছেই তার ওপর ঘরের কোণের কুটুমও কম জ্বালাতে শুরু করছে না। মাঝে মাঝেই মেয়ের জন্ত খোঁটা শুনতে হয় ওকে। ক্ষেন্তি তো এক কথাকে দশখানা করে এসে লাগাচ্ছে। কি আর করা যাবে। কপাল যখন পুড়েছে তখন সবই সহ্য করতে হবে। রাম-কান্তর মনে কি আছে তাও বোঝা যায় না। এত সাহস ভরসা দিয়েছিলেন এখন রীতিমতোই ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। দিন দিন বড় উদাসীন মনে হচ্ছে ভট্‌চাযকে। সাধলে এখন আর তামাক পর্যন্ত খান না। কুমার বাহাদুরকে কোন কিছু বলতে বললেও সোজা কাছারি আর গ্রীনবোট দেখিয়ে দেন। একটুও বুঝতে চান না, চুপি চুপি কর্জ নেওয়া হয়েছে। কথাটা কানে গেলে বৈরাগীর কাছে মুখ দেখানো যাবে না।...সংসারে সকলেই মরে বেঁচেছে, একা যত দায় হয়েছে ওরই বেঁচে থেকে।...ভাবনায় ভাবনায় রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারে না দুর্গা।

নিতাই বসে নেই। তলায় তলায় মাকড়সার জাল বুনেই চলেছিল। কানাঘুষায় ওসমানের মতলবটা কানে আসতেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। এতদূর স্পর্ধা! হেলে চাষা আমাকে চায় বক দেখাতে! আচ্ছারে আচ্ছা, টের পাবি। আর দুটো দিন সবুর কর। তাহলেই বুঝতে পারবি চাষার বুদ্ধিই বুদ্ধি না এই শর্মার বুদ্ধিই বুদ্ধি। যেমন বুড়ো আঙুল দেখাবার মতলব আঁটছিস তেমন ভিটেমাটি থেকে ঘাড় ধরে নামাবো তবে আমার নাম নিতাই সা। না, আর তায়-তাগাদা নয়। চরেও আর নয়। নিতাই কাগজপত্র সোজা পাঠিয়ে দেয় অবনী উকিলের কাছে। তিলমাত্র ফাঁক রাখা হবে না। সমন নোটিশ চেপে এক তরফা ডিক্রি করতে হবে। তারপর সোজা ঢোল শহরৎ। না না, দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো চলবে না। যেভাবেই হোক, চরধল্লার ঐ শস্যভাণ্ডার পেতেই হবে। মা লক্ষ্মী তো একরকম হাতের মুঠোয় তুলেই দিয়েছেন ওকে। এখন সামান্য একটু কৌশল মাত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ, শাস্ত্রেই আছে, বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা। যোগ্য ব্যক্তির জন্যই ধন-দৌলত—সংসার। মূর্খ কিংবা দুর্বলের ঠাঁই নেই এখানে।... নিতাই মনে মনেই গর্জে ওঠে। মহাভারতের শকুনিই এসে ভর করে মগজে।

অঘ্রানের সকাল। সবে সূর্যোদয় হয়েছে। চরধল্লার গাছে গাছে শিশির বিন্দুর ঝলক। সাকিনা বাসি হাত-মুখ ধুয়ে কাঠের উনুন জ্বেলে ফেনাভাত

চাপিয়েছে। ছেলেরা কেউ ঘুম থেকে উঠেছে, কেউ ঘুমুচ্ছে। পলানের শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। রোজ বিকেলের দিকে জ্বর হচ্ছে। খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসে, ভোর রাত্রে ছেড়ে যায়। এতদিন ভাতই খাচ্ছিল, আজ দুদিন কিছুই মুখে দিতে পারছে না! খেতে বসলে ঠেলে বমি আসে। দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে শরীরটা। সারা রাত ঘুম হয় না। ঋণ আর রোগ অবিরত হুল ফোটাতে থাকে। বুঝি বা পাগল হয়ে যাবে ও। রাত পোহালে হাঁড়ি ভর্তি ভাত চাই। একবার নয় দিনে চারবার। পাট বেচে একটা পয়সাও নিতাইকে দেওয়া যায় নি। খেতে পরতেই সব উবে যাচ্ছে। নেই বলতে একটা পয়সা রুজি-রোজগার নেই। ওসমান গণি টাকার অভাবে ঠায় বসে আছে। ধান চালের কিস্তি বন্ধ। গস্তি দুটো ঘাটে পড়েই পচছে।...

উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ ক্ষেতের দিকে চোখ পড়ে সাকিনার। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ—কুয়াশাচ্ছন্ন। এখনো মুগ কলাইয়ের ডগা সবুজ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অতোগুলো লোক ওখানে কি করছে! ঢোল বাজছে কেন? বিস্ফারিত চোখেই চেয়ে থাকে সাকিনা সোনামুখী ক্ষেতের দিকে। লোকগুলো যে এদিকেই এগিয়ে আসছে। পাইক পেয়াদা পুলিশও রয়েছে সঙ্গে। তবে কি সর্বনাশই শুরু হলো! কাঁপা গলায় চেঁচাতে থাকে সাকিনা, ওরে, তরা ওঠ্‌রে। অ ওসমান, অ গণি, তড়াতড়ি ওঠ্‌। দ্যাখ, ক্যারা য্যান সব আইবার নৈচে। ওঠ্‌।

চেঁচামেচি শুনে ওসমান, গণি, কেরামৎ লাফ দিয়ে বাইরে আসে। ফজলুল কাশেম ঘাটে গিয়েছিল ওরাও ছুটে আসে। সারা রাত ছটফট করে ভোরের দিকে পলানের দু'চোখ বুজে এসেছিল। পলানও লাফ দিয়ে উঠতে যায় কিন্তু পারে না। মাথা ঘুরে বিছানার ওপরেই পড়ে যায়। সাকিনা ছুটে গিয়ে দু'হাতে ওকে আগলে ধরে।

ঢোলে কাঠি দিতে দিতে আদালতের লোক ততক্ষণে বাড়ির ওপর এসে পড়ে। নিতাই নিজে আসেনি। তার বদলে এসেছে গোমস্তা ননীমাধব। মূলের চেয়ে শিকড়ের ফড়ফড়ানি বেশী। ননীমাধবের যেন আজ চৈত্রোৎসব। একবার ছুটে এদিকে যাচ্ছে আর একবার ওদিকে। দেখে দেখে ওসমানের মাথার পোকাগুলো কিলবিল করে ওঠে। একবার ভাবে, ছুটে গিয়ে বল্লমটা নিয়ে আসে। এতবড় স্পর্ধা নইনা চোরার! শালাকে না হাটে বাজারে সকলেই

চোরা বলে ডাকে! দুদিন নিতাই সার গদিতে তামাক সাজার কাজ পেয়েছে। না, শালার ভবের ভাত উঠিয়েই দিতে হবে।—তিড়িং করে লাফ দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকে ওসমান।

গণি একটু স্থির বুদ্ধির মানুষ। ব্যাপারটা বুঝতে আদৌ দেরি হয় না। লজ্জায় অপমানে ওর কান মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজেদের অক্ষমতার কথা বুঝে দাঁতে দাঁত চেপেই সব সহ্য করে যায়।

নিতাই সুচতুর। জীবন নাশের ভয়ে কিংবা চক্ষুলজ্জায় নিজে সঙ্গে আসেনি। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার কিছুই ত্রুটি রাখেনি। বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে সরাসরি পুলিশের সাহায্য নিয়েছে! টাকায় সবই হয়। এখন বাধা দিতে যাওয়া মানে তোপের মুখে এগিয়ে যাওয়া। গণিও ওসমানের সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ঘরের ভেতরে যায়।

এক হাতে বল্লম ও আর-এক হাতে ঢাল নিয়ে বেরিয়ে আসছিল ওসমান, গণি শক্ত করে কোমর জড়িয়ে ধরে ওর।

ওসমানের রাগ চরমে উঠেছে। বল্লমের একটা খোঁচা শেষটায় না গণির তল পেটেই পড়ে। কিন্তু গণিকে ঢিল দিলে চলবে না। ওসমানের বউও এসে সাহায্য করে। দু'জনে ধস্তাধস্তি করে হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় ঢাল আর বল্লম। রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে ওসমান। দশ হাজার তিনশ' টাকার ডিক্রি। কিছু দিয়েই কিছু করার নেই। ঘোষণা না করেই যুদ্ধে দুর্ধর্ষ ফৌজ পাঠিয়েছে নিতাই। আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাথা নীচু করেই হাঁপাতে থাকে ওসমান।

ওদিকে পলান চেঁচাতে থাকে, কইরে, তরা সব গেলি কোনহানে? আমারে সাজী মশর কাছে নিয়া যা না। দুইডা দিন সময় দেউক আমারে। আমি হার টাকা সুদে-আসলে সব দিয়া দিমু! অ গণি, অ ওসমান, ইদিগে আয় না?

গণি ওসমানের আসার আগেই ননীমাধব তেড়ে আসে, আর কারো এসে কাজ নেই। ভালয় ভালয় বেরুবে তো বেরোয় মিঞা।

ননীর আচরণে পলানের বুকের রক্ত টগবগিয়ে ফুটতে থাকে। হাতের কাছে একটা জলের গ্লাস ছিল, ইচ্ছে করে ছুঁড়ে মারে চোরার মুখের ওপর। তবু নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে করুণভাবেই জিজ্ঞেস করে, সাজী মশয় আছে নাই পাল মশয়?

ননী স্বভাবসুলভভাবেই দাঁত খিঁচোয়, কেন, সাজী মশয় কি তোমার

কেনা গোলাম যে ডাকলেই হাজির হবেন ? মিঞা, তাড়াতাড়ি বেরুবে তো বেরোও নয়তো ঘাড় ধরে বার করাবার ব্যবস্থা করবো।

কি কলি বেইমান…অসমাপ্ত কথা আর সমাপ্ত করতে পারে না পলান। উত্তেজনায় মূর্ছা যায়।

সাকিনা ডুকরে ওঠে।

ওসমান, গণি, কেরামৎ দৌড়ে আসে ওঘর থেকে। বউরাও সব আসে। কাশেম ফজলুলকে আগেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে পুলিশ। ওরা ঘটি বাটি নিয়ে টানাটানি করছিল। ওরা আর আসতে পারে না।

পলানের অবস্থা দেখে সকলের চোখ দিয়েই জল গড়াতে থাকে। সাকিনা আঁচলে মুখ ঢেকে বিলাপ করেই কাঁদতে থাকে। মাকে সান্ত্বনা দেবার মতো কারো মুখে কোন ভাষা নেই। ঘুষঘাষ খেলেও নাজিরের প্রাণেই কিঞ্চিৎ অনুকম্পা জাগে। ননীমাধবের বাড়াবাড়ি দেখে কষেই এক চোট ধমকে দেয়। বেগতিক দেখে চোরা কিছুক্ষণ মুখ বুজেই থাকে।

নাজির গণিকে লক্ষ্য করে সহানুভূতির স্বরেই বলে, আমি বেশীক্ষণ সময় দিতে পারব না ভাই। তোমরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ছাড়বার ব্যবস্থা কর।

ভরসা পেয়ে গণি হাত জড়িয়ে ধরে নাজিরের, বাবু মশয়, দয়া কইরা একটা দিন সময় ছ্যান। টাকার যোগার আমরা করবার পারুম।…

উত্তরে নাজির বলে, আইনের কাছে আমার হাত-পা বাঁধা ভাই। আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

আপনার পায়ে পড়ি বাবু মশয়। বাজান ফিট অইয়া পড়চে। দয়া কইরা একটা দিনের সময় আমাগ ছ্যান, গণি আবার হাতজোড় করে।

ধরা গলায় নাজির বলে, তোমাদের বিপদ আমি বুঝতে পারছি ভাই। কিন্তু কিছুই করতে পারব না। সঙ্গে যে খেঁকী কুকুরটা রয়েছে, ননীমাধবের দিকে ইঙ্গিত করে নাজির।

না না, ননীর মতো ইতরের কাছে কোন অনুরোধ উপরোধ চলে না। বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে ওরা। ওসমান দীর্ঘশ্বাসে ফেটে পড়ে, বাবু মশয়, তাইলে গাছতলায়ই বাইর কইরা দিলেন আমাগ ?

ক্রুদ্ধ আবেগে নাজির উত্তর করে, কি করব ভাই, আমি আদালতের চাকর।

একে একে সকলেই বেরিয়ে যেতে থাকে বাড়ি ছেড়ে। বুড়ী বটের

ছায়াই এখন একমাত্র সম্বল। তারপর যদি চরের কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। একটা খাটিয়ার ওপর শোয়ানো অবস্থাতেই পলানকে ধরাধরি করে বার করানো হয়। বেচারা, চেতনা থাকলে হয়তো কিছুতেই বার হতে চাইতো না। সাকিনা হাঁপাতে হাঁপাতেই পেছন নেয়। ভাতের হাঁড়িটা উনুনের ওপর ফুটছিল। কে যেন একটা বাঁশ মেরে ভেঙে দেয়। চারদিক থেকে কাক, চিল, কুকুর, বেড়াল হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। পলানের সোনার সংসার মুহূর্তে শ্মশানে পরিণত হয়। ননীমাধবের ইঙ্গিতে ঢোলে কাঠি পড়ে—ডুম্ ডুম্ ডুম্…

॥ ৩১ ॥

পলান ব্যাপারীকে আশ্রয় দিতে চরের অনেকেই এগিয়ে আসে। চরস্ফুট নগর থেকে দীনু করিমও পাশে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু পলানের কারো আশ্রয়ই আবশ্যক হয় না। মূর্ছা ভাঙলেও ভাল করে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। জ্বরের বিকারে থেকে থেকেই চিৎকার করতে থাকে, আমার বল্লম, আমার বল্লম কোথায়? বেইমান, সব বেইমান…

চব্বিশ ঘণ্টা বুড়ী বটের ছায়ায় কাটিয়ে পরের দিন ভোরে দেহ ত্যাগ করে পলান। সাকিনা আর গলা ছেড়ে কাঁদতে পারে না। পলান বোধ হয় ওকেও সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই দাঁত লাগছে হতভাগিনীর। সোনার সংসার, প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় তছনছ হয়ে গেলো। ওসমান গণি ভেবে পায় না, কি করবে—কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এতকাল পলান ছিল বট গাছের মতোই ওদের মাথার ওপর। যত ঝড়-ঝাপটা ওর ওপর দিয়েই গেছে। ওরা সকলে ছিল নিশ্চিন্ত। হুকুম মতো কাজ করেছে, বাকী সময় ফুর্তি আহ্লাদ করে বেড়িয়েছে। কিন্তু এখন তো তাসের ঘরের মতোই সে বটবৃক্ষ ঝড়ে ভেঙে পড়লা। এখন আর কে দেবে আশ্রয়—আশা ভরসা। পাশার ছকে হেরে পঞ্চপাণ্ডবের মতো বনবাসে যেতে হবে ওদের। এখন সব চেয়ে মুশকিল হলো মৃত পলানকে নিয়ে। কোথায় ওকে ওরা গোর দেয়। নেই বলতে যে নিজস্ব এক ছটাক জমিও নেই। নর-রাক্ষস এক থাবায় সব গিলে খেয়েছে। চরের সর্বশ্রেষ্ঠ ভুঁইয়ার আজ সামান্য সাড়ে তিনহাত পরিমিত জমিও জুটছে না। হয়তো এতবড় একজন মানী লোকের দেহ ধলেশ্বরীর

জলেই ভাসিয়ে দিতে হবে। সামান্য সৎকারটুকু পর্যন্ত হবে না।...দু'চোখ ছলছলিয়ে ওঠে পাঁচটি জোয়ান ছেলের। শোকের চেয়ে লজ্জাই বেশী হয়। পলানের খুন রয়েছে ওদের শিরা-উপশিরায়। হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে ওরা পারবে না। দীনু করিম হাজারবার বলেও রাজী করাতে পারে না। বলে কি মোড়লরা, চরধল্লার বাদশা যাবে চরফুটনগরের মাটি নিতে! না না, তা হতে পারে না। কিছুতেই না। ওসমান জমির খোঁজেই বার হয়। চরধল্লার মানুষ যদি দয়া করতে চায় ওদের তবে এই দয়া করুক, যাতে ওরা উচিত মূল্যে একফালি জমি পায়। বউদের গহনা বেচেই জমির দাম শোধ করবে। তবু পারবে না কারো কাছে হাত পাততে কিংবা ধলেশ্বরীর জলে আব্বাজানকে ভাসিয়ে দিতে।...

অনেকে অনেক পরামর্শই দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞাতিভাই রহমানের কথাটাই মনে ধরে ওদের। বুড়ী বটের ছায়া-শীতল পীরতলাতেই গোর দেওয়া হোক মোড়লকে। ও গাছ তো মোড়লই একদিন নিজের হাতে লাগিয়েছিল। কম করেও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগের কথা। ছোট্ট চারা শাখা-প্রশাখায় বিশাল এক মহীরুহ এখন। ঘুরতে ঘুরতে কোত্থেকে এক পীর এসে আশ্রয় নেন ছায়া-শীতল তরুমূলে। বড় নিষ্ঠাময় জীবনযাপন করতেন পীরসাহেব। পলানের হৃদয় গলে যায়। বিঘা দুই জমি লিখে দেয় ও পীরের নামে। চরের মানুষ আপদে-বিপদে পীরের শরণ নেয়। জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়-ফুঁকে জমে ওঠে আসর। বটতলা—পীরতলায় পরিণত হয়। পীরসাহেব আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর আসনের কাছে আজো মানুষ প্রতি সন্ধ্যায় মোমবাতি জেলে দেয়। বিপদে-আপদে স্মরণ করে তাঁকে। পলানকে তাঁর পাশেই গোর দেওয়া সাব্যস্ত হয়। চরের আবালবৃদ্ধ এসে জড় হয়। করিম নতজানু হয়ে প্রার্থনা করে সুহৃদের জন্য। দীনুও চোখের জল দিয়েই তর্পণ করে। সকল তাপ জ্বালা থেকে মুক্তি পায় পলান।

পলান চির শান্তির রাজ্যে ঘুমিয়ে পড়লেও চরের মানুষ গর্জে ওঠে। সাকিনাকেও দিনকয়েক আগে গোর দিতে হয়েছে পলানের পাশে। ওসমান গণিরা পাঁচ ভাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। চরের শত শত জোয়ান মানুষও ওদের দলে। নিতাই একবার জমি চাষ করতে চরে এলে ওরা দেখে নেবে কত শক্তি ধরে সে। ওরা তো কেউ চাষ করবেই না, অন্য কাকেও তা করতে দেবে না।...

নিতাইয়ের ভাবনার অন্ত নেই। আইনের প্যাঁচে জমি দখলে পেয়েও ভোগে আনতে পারছে না। এ পর্যন্ত নিজে একটি দিনের জন্যও চরে আসতে সাহস পায়নি। চরের মানুষ যেভাবে ক্ষেপে আছে তাতে কোনদিন বা বেঘোরেই প্রাণটা যায়। এতটা বাড়াবাড়ি বোধ হয় না করাই ছিল ভাল। আগুন নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে। কিন্তু এখন তো আর থামবার উপায় নেই। সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো মাথার ওপর ছোবল পড়বে। পলানের উচ্ছেদে কেবল চরের লেজটিই খসে পড়েছে। এখনো পেট মাথা বাকি। মোড়ল সব ক'টাকে ঘায়েল না করা পর্যন্ত শান্তি নেই। কিন্তু উপায় কি। ননী মাধবটাকে তো মুঠোভর্তি টাকা দিয়েও রাখা গেলো না। বেটা ভয় পেয়ে পালালো। আর ভয় না পেয়েই বা করে কি। পলানের ছেলে পাঁচটা তো শুনছি আস্ত ডাকাত। শালারা নাকি দিনরাত আমাকেই খুঁজে বেড়ায়। করিম ফকিরটা একটু শান্ত-মেজাজেরই আছে। কিন্তু আর-একটা গোঁয়ার হচ্ছে বৈরাগীটা। হিন্দু হয়েও গলায় গলায় শালার নেড়েদের সঙ্গে ভাব। আচ্ছারে শালা, আচ্ছা। তোর বিষ দাঁতটাই আগে ভাঙছি।...ননীমাধব প্রাণের ভয়ে কাজে ইস্তফা দিলে নিতাই নিজেই তদ্বির তদারক শুরু করে। দীনুর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। সেই একই ভানুমতীর খেলা। সমন চেপে একতরফা ডিক্রিলাভ। নৌকো পথেই সদরে যাতায়াত করতে হয় নিতাইকে। তবে খুব সতর্ক ও। কখনো একা একা চলাফেরা করে না। সদা-সর্বদা কেউ না কেউ সঙ্গে থাকে।

কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সতর্ক থেকেও কেমন করে যেন ফাঁদে পড়ে যায় নিতাই। দীনুর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি পেয়ে সদম্ভে বাড়ি ফিরছিল। কাজের তাড়ায় সঙ্গীরা সব মাঝ পথে নেমে গিয়েছে। নিতাইয়ের মনটা খুঁতখুঁত করলেও তেমন কোন ভয় ভাবনা হয় না। কে আর দেখছে ওকে। তাছাড়া মাঝি দু'জন তো রয়েছেই।... ছৈয়ের ভেতরে বসে বেশ আমেজের সঙ্গেই তামাক টানতে থাকে নিতাই। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে মগজের ঘিলুর মধ্যেও কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। এই বেশ ভাল ব্যবস্থা হলো। তিন হাজার টাকার ডিক্রিটা নগদ তিন হাজারেই কুমার বাহাদুর কিনে নিলেন। এবার চাঁড়ালের পো টের পাবে, কত ধানে কত চাল। রড্ডো বেড়েছে শালা। কত করে তোষামদ করলুম, চর দখল করতে আমাকে সাহায্য কর, আমি তোর সমস্ত সুদ মাপ করে দিচ্ছি। আসলও না হয় আরো

ছু'বছর পরে দিস্। আমি লিখে পড়ে দিচ্ছি। কিন্তু শালা কথাটা কানেই তুললে না। ফুটুনি ঝাড়লে, নেমকহারামী করতে পারবো না। বলি শালা পলান সেক কি তোর বাপ্‌দাদা চৌদ্দ পুরুষ—না সেই শালাই তোকে ধার কর্জ দিয়েছে ?···এখন দেখি কোন বান্ধব তোকে রক্ষা করে। এ আর নিতাই সা নয় যে চোখ রাঙাবি। শক্ত মরদ রমেন্দ্রনারায়ণ। বুকে বাঁশ ডলবে আর টেনে ঘর থেকে বার করবে।····ভাবতে ভাবতে মাথার পোকাগুলো কিলবিল করতে থাকে নিতাইয়ের। দীনুকে যদি কুমার বাহাদুর শায়েস্তা করতে পারেন তাহলে পলানের ছেলেগুলোকে বাগে আনা যাবেই। তারপর যদি চরধল্লার জমি দখলে আসে তাহলে আর সুদের কারবার না করলেও চলবে। আইন তো অধিকার দিয়েছেই। এখন ঠ্যাঙাড়েগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই হয়। দেখা যাক, কুমার বাহাদুর কি করেন।···হুঁকো রেখে একটু কাত হয় নিতাই। জলো হাওয়ায় ছু'চোখ বুজে আসে।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে নিতাই। বৃষ্টির গতি বেড়ে যায়। হাওয়াও জোরে বইতে থাকে। মাঝিরা টোকা মাথায় দিয়ে—প্রাণপণ শক্তিতে দাঁড় টেনে চলেছে। বৃষ্টির ধকলে আশপাশের কোন কিছু নজরে পড়ছে না। নৌকোর ভেতরের লণ্ঠনটাও দমকা হাওয়ায় নিভে গেছে। চারদিক জুড়ে থমথম করছে ঘন অন্ধকার। কোনরকমে বাঁক ঘুরতে পারলে অনুকূল হাওয়া পাওয়া যাবে। এ পথটুকু যেতে শক্তির কসরতই করতে হবে। তাই করে চলেছে বাপ-বেটায়। আর শ'খানেক হাত এগুতে পারলেই বাঁকের মোড়। ছেলেকে তাড়া দিয়ে পেছনের হালে ঘন ঘন চাড় দিতে থাকে বড় মাঝি। ছেলেও প্রাণ-পণ শক্তিতে যুঝতে থাকে। ঢেউএ যেন এক-একবার তলিয়েই যাচ্ছে সামনের গলুই। ঝলকে ঝলকে জল উঠছে। ভয় নেই, মোড়টা ঘুরতে পারলেই নিশ্চিন্ত। একজন হালধরে বসে থাকবে। আর একজন সানকি দিয়ে সেঁচে ফেলবে জল। মোড়ে তো একরকম এসেই পড়েছে। এখন হালটা ঘুরিয়ে ধরলেই নৌকো ঘুরে যাবে। বড় মাঝি সেই চেষ্টাই করতে যায়। হঠাৎ পাশ কেটে এসে একখানা বড় ডিঙ্গি পথ রোধ করে দাঁড়ায়। ডিঙ্গিতে পাঁচটি লোক। বড় ছু'জনের মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বাতাসে ফরফর করে উড়ছে। মালকোঁচা করে লুঙ্গি পরনে। কোমরে শক্ত করে গামছা বাঁধা। বাকী তিন-জনও বেশ আঁটসাঁট। বড়জন হাঁকে, এই মিঞা, নাও ভিড়াও।

বড় মাঝি প্রতিবাদ করে, ক্যা,নাও ভিড়ামু ক্যা ? কি কইবার চাও তোমরা ?

কইবার চাই তোমার মাথা শালা। নাও ভিড়াইবা নাকি ভিড়াও। নইলে···ঝপ করে একটা বল্লম তুলে উঁচিয়ে ধরে গণি!

বৃষ্টির ধকল কমে এখন টিপটিপানী শুরু হয়েছে। বাতাস নেই বললেই হয়। বড় মাঝি তবু ভাল করে চোখ খুলতে সাহস পায় না। পাঁচটি জল্লাদই যেন ক্ষেপে উঠেছে। নিতাইকে আস্তে আস্তে গোটা দুই ডাক দিয়ে হাল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

ওসমান গণি ডিঙ্গি থেকে লাফ দিয়ে এসে নিতাইয়ের নৌকোয় ওঠে। ওসমানের হাতে একটা শানিত রামদা। গণির হাতে বল্লম।

মাঝির ছেলে ছোট মাঝি ভয়ে চেঁচাতে থাকে।

ওসমান খেঁকিয়ে ওঠে, এই শালা, চেঁচাবি ত দুই টুকরা কইরা ফালামু। বালো চাচ্ ত চুপ কইরা বইহা থাক।

ছোট মাঝি দু'চোখ বুজে ভয়ে কাঁপতে থাকে। বড় মাঝিও থ বনে যায়। ঢোক গিলে জড়িত কণ্ঠেই অনুরোধ জানায়, আমাগ ছাইড়া দ্যান সাবরা। নায়ে কিছু নাই। আমাগ···

মুখের কথা শেষ করতে পারে না বড় মাঝি—ওসমান আবার গর্জে ওঠে, চুপ কর বেটা। ছাইড়া দিব! নায়ে তগ কিছু নাই, না? চামার শালা কুথায়?

উত্তর আর মাঝিকে দিতে হয় না। চেঁচামেচি শুনে নিতাই আচমকা জেগে ওঠে। ভয়-জড়িত কণ্ঠেই শুধোয়, নৌকোয় কে? কার সঙ্গে কথা বলছিস, এই খলিল?—

তোমার বাবার লগে কতা বলচে শালা। বাইরইয়া আহ চামারের পো, খলিল উত্তর দেবার আগে ওসমান ভেংচি কাটে।

ওসমানের কণ্ঠস্বরে নিতাই চমকে ওঠে। এক ঝলক চোখ চাইতেই দেখে, সাক্ষাৎ যম শিয়রে দাঁড়িয়ে। কাঁপা গলায় অবস্থা লঘু করতে চেষ্টা করে, কে, বাবা ওসমান! কি চাই বাবা তোমাদের?

চাই তোমার মাথা শালা, ওসমানের কণ্ঠে খানখান হয়ে ঝরে পড়ে প্রতিহিংসার কর্কশ কণ্ঠস্বর।

নিতাইয়ের মুখে আর বাক্য সরে না। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।

গণি ছৈয়ের ভেতরে মাথা গলিয়ে তামাসা জোড়ে, কি সাজী মশয়, চরে একবার নাম। এত জমিজমা পাইলা একবার দেইখা যাও।

নিতাইয়ের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। হাত জোড় করেই অনুরোধ

জানায়, আমাকে তোরা ক্ষমা কর বাবা। আমি তোদের সমস্ত জমি ফিরিয়ে দেবো। আমাকে—

ইস্, শালা আমার ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির রে! সব জমি আমাগ দান করব! ও শালার লগে কতা কওয়নের কি কাম? শালারে টাইনা বাইরে আন না। অর জমি অর গোয়া (পাছা) দিয়া ভইরা দেই, নিতাইয়ের মুখের মতো জবাব দিয়ে গণিকে আদেশ করে ওসমান।

গণি শ্লেষের সঙ্গেই আবার টিপ্পনী কাটে, আহেন সাজি মশয়, একডু বাইরে আহেন। ক্ষ্যাত খামারের দিকে একবার চাইয়া ভাহেন, বলতে বলতে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে গণি।

নিতাই মাস্তুলের বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে কাতরাতে থাকে, দোহাই তোদের আল্লার, আমাকে ছেড়ে দে। মা লক্ষ্মীর নামে শপথ করছি, তোদের সমস্ত জমি আমি ফিরিয়ে দেবো আমাকে ছেড়ে—

শা-লা, জমি ফিরাইয়া দিবি! বাজানরে আমরা কুথায় ফিরা পামুরে শালা। তর নোকরে কত কইরা কইচিলাম, তুইডা দিন আমাগ সময় ভাও—সব টেকা আমরা দিয়া দিমু। হুনচিল শালা?··· ক্রোধে গজরাতে থাকে গণি।

নিতাই আবার কাতরাতে থাকে, আমি আসিনি বাবা। আমি এলে নিশ্চয় তোমাদের কথা রাখতাম।···

ইস্, শালায় য্যান এহন কিছু জানে না। মার শালা চামাররে, বলতে বলতে এক হেঁচকায় বাইরে টেনে এনে দা দিয়ে কাঁধের ওপর কোপ বসিয়ে দেয় ওসমান—।

বড় মাঝি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল ওসমানকে। কেরামৎ এক বল্লমের খোঁচায় ঘায়েল করে ফেলে ওকে। বাবারে-মারে বলে চীৎকার করতে করতে লাফ দিয়ে জলের ওপর গিয়ে পড়ে মাঝি। ছোট মাঝিও বাজানরে মাইরা ফালাইল, বাজানরে মাইরা ফালাইল বলে, চীৎকার করতে থাকে।

গণি ওকেও বল্লমের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে জলের ওপর ফেলে দেয়।

বাপ-বেটায় ভেসে চলে পাড়ের দিকে।

ওসমান একাই নিতাইকে কোপাতে থাকে। বার দুই চিৎকার করেই গলা নিস্তব্ধ হয়ে আসে নিতাইয়ের। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে লাফ দিয়ে জলের ওপরে পড়ে।

তীরে উঠে মাঝিরা প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে থাকে। বৃষ্টি নেই, থমথম করছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পাড়ে কোলাহল শোনা যায়। আর্তনাদ শুনে দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। নিতাই জীবিত কি মৃত দেখবার আর ফুরসত নেই। ডিঙ্গি নিয়ে দ্রুত গা ঢাকা দেয় পাঁচ ভাই। দুঃশাসনের রক্তে পিতৃতর্পণ আজ সার্থক হলো ওদের। বেহস্তে নিশ্চয় তৃপ্ত হয়েছেন আব্বাজান। আর কোন ভয় নেই। ফাঁসি, কালাপানি, কারাবাস হাসিমুখেই বরণ করবে ওরা।...

ক্ষণিকের জন্যও মনের কোণে কোন গ্লানি উপস্থিত হয় না। নিতাইকে মৃত দেখে এলে আর কোন ভাবনাই থাকতো না। এখন ভাবনা শুধু ঐটুকুই। না না, নিতাই মরবেই। নিয়তিই ওকে টেনে নিয়ে যাবে। অধর্ম কখনো টিকে থাকতে পারে না...মনের জোরেই বৈঠায় খোঁচ দেয় পাঁচ ভাই। কুরুক্ষেত্র বিজয়ী পঞ্চপাণ্ডবই যেন এগিয়ে চলে।

নিতাই মরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, বেঁচে থেকেও যেমন অনেককে জ্বালিয়েছে মরেও তেমনি জ্বালাচ্ছে। মাঝিদের সোরগোল শুনে জল পুলিশের নৌকো এসে উদ্ধার করে আহত নিতাইকে। যন্ত্রণায় জলের ওপর দাপাদাপি করছিল। উত্থান শক্তি রহিত হলেও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় নি। অঝোরে খুন ঝরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। উদ্ধার করে সাব ইন্সপেক্টর রমণীমোহন তাড়াতাড়ি ওর জবানবন্দী নিতে উদ্যোগী হন। চারদিক থেকে আরো অনেকে এসে জড় হয়েছে। ডিঙ্গি নিয়ে জলপথেও আসে কেউ কেউ। কারো হাতে লণ্ঠন, লাঠি, বল্লম। কারো বা খালি হাত। এঁটো হাতেও এসেছে অনেকে। বিপদে মানুষের পাশে ছুটে আসাই গ্রামের মানুষের ধর্ম। পরের জন্য জান কবুল করতেও ওরা ভয় পায় না। প্রয়োজন হলে ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করতেও জানে। কিন্তু এক্ষেত্রে নিতাইয়ের বীভৎস মুখের দিকে চেয়ে অনেকেই শিউরে ওঠে। আহা-হা, কি সর্বনাশ করে গেছে বেচারার। একেবারে জানে খতম করে দিয়ে গেছে।...কিন্তু খুনেরা গেল কোথায়? এত তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়। খুঁজলে এখনো ধরা যাবে।...যে যেদিকে পারে এগিয়ে যায়। ডিঙ্গি নিয়েও এমাথা ওমাথা খোঁজাখুঁজি করে একদল। কিন্তু কোথাও কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। মাঝিরাও সঠিক কিছু বলতে পারে না। বড় মাঝি তো বেশ যখম হয়েছে। ছোটর অবস্থাও সঙ্গীন। ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে বেচারা। কাকেও চিনতে পারেনি। বড় মাঝিও না।...ভিন্ দেশী

মানুষ ওরা। হালে এসেছে এ অঞ্চলে নৌকো নিয়ে। রমণীমোহনের উপর্যুপরি জেরার উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে পারে, ডাকাতরা দলে পাঁচজন ছিল। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা। সহসা বাঁকের মোড়ে ডিঙ্গি নিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ায়।...

ডিঙ্গির কথা শুনে আবার দু'দল দুদিকে ছুটে যায়। কিন্তু এবারও কোথাও কিছু নজরে পড়ে না। ধলেশ্বরীর কোল খাঁ খাঁ করছে। আকাশ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার জোর নেই। কেমন যেন থমথমে ভাব। সকলে মিলে ফিরে আসে নিতাইয়ের পাশে। রমণীমোহন ডাইরী লিখে চলেন। এক ঢোক জল গিলে কাতরাতে কাতরাতে শেষ জবান-বন্দী দেয় নিতাই, পলান ব্যাপারীর পাঁচ ছেলে আমাকে খুন করেছে দারোগা সাহেব। ওসমান,...আর কিছু বলতে পারে না নিতাই। মূর্ছায় ঢলে পড়ে। হয়তো বা নিভেই যায় জীবন দীপ। কলম বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি নাড়ী টিপে ধরেন রমণীমোহন। না, এখনো ধিক্‌ধিক্ করে চলছে ধমনীর ক্রিয়া। সময়মতো সদরে পৌঁছানো দরকার। চেষ্টা করলে হয়তো বেঁচেও যেতে পারে। রমণীমোহন মিছিমিছি দেরি না করে তাড়াতাড়ি আর একখানি নৌকো যোগাড় করে গঞ্জের থানায় পাঠিয়ে দেন নিতাইকে। সঙ্গে যায় দু'জন কনেষ্টবল আর উপস্থিত জনতার মধ্য হতে জনকয়েক বলিষ্ঠ মানুষ। আসামীদের গ্রেপ্তার না করে নিজে ফিরবেন না। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে সরাসরি পলানের বাড়ির দিকেই রওনা হন।

ওসমান, গাণ, কেরামৎ সকলেই ওরা সরাসরি বাড়িতে এসে উঠেছে। কোন রকম চাঞ্চল্য নেই ওদের মধ্যে। ছুটেও পালাবে না কেউ কোথাও। পুলিশের কাছে স্বেচ্ছায়ই ধরা দেবে ওরা। আদালতে গিয়ে বুক ফুলিয়েই বলবে, ওরা কোন দোষ করেনি। নিতাইয়ের মতো পিশাচকে মারায় কোন দোষই হতে পারে না। খুনের শাস্তি খুন। নিতাই একা ওদের অনেককে খুন করেছে—ভাতে মেরেছে। এই ওর উপযুক্ত শাস্তি। কোন ন্যায় বিচারক কখনো ওদের শাস্তি দিতে পারেন না। বরং পুরস্কার পাওয়াই ওদের উচিত। নিজেরা মরেও একটা কৌশলী ডাকাতের হাত থেকে অনেককে বাঁচিয়েছে ওরা।...কাশেম, ফজলুল, কেরামৎ কিছুটা ভেঙ্গে পড়লেও গণি ওসমান ঠিকই থাকে।

রাতের নাস্তা খেয়ে শুতে যাবে সকলে, রমণীমোহন সদলবলে এসে বাড়ি ঘের দেন। ভয় না পেলেও এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে পুলিশ আসবে একথা

কল্পনাও করতে পারেনি ওরা। বরং ভেবেছিল, কোন খোঁজই হবে না। নিতাইয়ের জবানবন্দী না পেলে হয়তো হতোও না কিছু। কিন্তু ভাগ্য দোষে অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছে। তা হলে কি এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শয়তান! সকল চেষ্টাই তাহলে বিফলে গেলো! আব্বাজানের আত্মা তাহলে আর তৃপ্ত হলো না! অনন্তকাল তৃষ্ণার্তই থেকে যাবে! ভাগ্য ভাগ্য, সবই ভাগ্যের ফের।...বেঁচে থেকে আর লাভ কি? ওসমান স্বেচ্ছায়ই ধরা দেয়। গণি, কাশেম, ফজলুল, কেরামৎও কোনরকম গোলমাল করে না। এত সহজে সকলকে গ্রেপ্তার করা যাবে রমণীমোহন কল্পনাও করতে পারেননি। মনে মনে তাই খুশী হয়েই সকলকে নিয়ে রাতারাতি থানায় ফেরেন।

নিতাইয়ের অবস্থা শোচনীয়। এ পর্যন্ত আর জ্ঞান ফিরে আসেনি। নাড়ীর অবস্থা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। শত চেষ্টা করেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি। খবর পেয়ে ছেলে, বউ, মেয়েরা থানায় এসে দাপাদাপি শুরু করেছে। সকালে নৌকোয় উঠবার সময় চলতি এক জেলে নৌকো থেকে ইলিশ মাছ কিনে দিয়ে গিয়েছিল নিতাই। ফিরে এসে ঝোল ভাত খাবে। নিতাইয়ের বৌয়ের বিলাপে পাষাণের বুক ফেটেও বোধ হয় কান্না বেরুবে। এক গাদা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করছে বেচারা। টাকা-কড়ি সবই চরে রয়েছে। কপাল পুড়লে খাবে কি তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ধনেপ্রাণেই ওদের মেরে রেখে যাচ্ছে নিতাই। দুটো মুখের কথাও বলে যেতে পারছে না।

রাত বারোটা। অচেতন নিতাইকে নিয়ে রমণীমোহন স্বয়ং সদরে রওনা হন। জলপথে প্রায় ষোল সতেরো মাইল পথ। যদি আর কোন নূতন উপসর্গ দেখা না দেয় তাহলে হয়তো কোনরকমে গিয়ে পৌঁছোনো যাবে। আর দুটো কথা বলে যেতে পারলেই আসামীর ফাঁসী কেউ রুখতে পারবে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওসমান খুন করেছে। তবু আইনের রায় বোঝাবুঝির ব্যাপার নয়। বিধিমতো সোজাসুজিই আসামীকে সনাক্ত করতে হবে। এত বড় খুনী মামলায় শাস্তি হলে নিশ্চয় পদোন্নতি আশা করা যায়। নিতাইয়ের স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সঙ্গে রমণীমোহনের চোখেও ঘুম নেই! অষ্টপ্রহর হাঁ করে মুখের কাছে বসে আছেন। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মাঝ পথেই নিতাইয়ের ভবলীলা শেষ হয়ে যায়।

বিচারে ওসমানের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও গণি কেরামতের দশবছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ফজলুল আর কাশেমের তিন বছর করে।

পলানের সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত হয়। মেহেরার দুঃখে করিমও কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। প্রতি সন্ধ্যায় আর দয়াল চানের আসর বসে না। একতারার তার ছিঁড়ে গেছে।

দীনুর মনেও স্বস্তি নেই। অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েই দিন কাটছে। ডিক্রি-খানা রমেন্দ্রনারায়ণ কিনে নিয়েছেন। কে জানে কি আছে তার মনে। নিতাইকে তবুও না হয় অনুরোধ উপরোধ করা যেতো। কিন্তু কুমার বাহাদুরের কাছে তো ঘেঁষবারও উপায় নেই। রামকান্ত ইচ্ছে করলে খোঁজ খবর দিতে পারেন। খুব গলায় গলায় ভাব দু'জনের। উনি অনুরোধ করলে সবকিছু চেপে যাওয়াও অসম্ভব নয়। মানী লোক হয়ে মানী লোকের সম্মান রাখাটাই স্বাভাবিক। নিতাই ছিল সুদখোর—চামার। কুমার বাহাদুর তা নন। বনেদী বংশ, প্রশস্ত দিল।....কিন্তু মুশকিল হয়েছে ভট্‌চায মশায়কে নিয়ে। চরের প্রতি দিন দিন কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠছেন। সমস্ত চর তো এযাবৎ মাথার মুকুট করেই রেখেছে ওঁকে। বিনিময়ে এটুকু দয়াও কি উনি করতে পারেন না!...দাওয়ার উপর বসে হুঁকো টানতে টানতে এলোমেলো ভাবতে থাকে দীনু।

নিভৃতে রামকান্তকে কথাটা বলবে বলে ক'দিন ধরে ভাবছিল দীনু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর উৎসাহ থাকে না। রামকান্ত এখন আর সে রামকান্তই নেই। আগে দীনুর সামনে হুঁকো খেতে পর্যন্ত সমীহ করতো। কিন্তু এখন যেন দিন দিন কেমন বেপরোয়া হয়ে উঠছে। নিজে প্রকাশ্যে গ্লাস না ধরলেও খোলাখুলিই এখন সে রমেন্দ্রনারায়ণের দোসর। মদ, গাঁজা, আড্ডা, ইয়ার্কিতে একরকম প্রকাশ্যেই ওর তোয়াজ করে। গঞ্জের মানুষ তো বলে, ইদানীং ভটচাযই কুমার বাহাদুরকে উস্‌কাচ্ছে! নয়তো মাঝখানে বেশ সংযতই ছিলেন উনি।...ছি ছি ছি, গুরু পুরোহিত জ্ঞানেই চরের আবালবৃদ্ধ ওঁকে ভক্তি করে আসছে। শোক তাপে বেচারা জর্জরিত। তবু কি লজ্জা সরম নেই!...

প্রতি বছর বর্ষাতেই কুমার বাহাদুরের 'বোট' খালের মুখে এসে নোঙর ফেলে। মেয়েদের স্নানের ঘাট সেখান থেকে কিছুটা দূরে থাকায় অসুবিধা হলেও কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত তা নিয়ে প্রকাশ্যে কেউ কোন দিন প্রতিবাদ করেনি। শান্তি বজায় রেখেই চলেছে। কিন্তু এবারের অবস্থা শোচনীয়। সকাল নেই সন্ধ্যা নেই একরকম ঘাটের কাছ ঘেঁষেই 'বোট'

বাঁধা হচ্ছে। মেয়েরা কেউ আর এখন খুলে-মেলে স্নান করতে পারে না। অনেকে ঘাটে আসা ছেড়েই দিয়েছে। দু'জোড়া লোলুপ চোখ যেন অবিরত ওদের গিলে খেতে ব্যস্ত। যেন তির্যগ দৃষ্টিতে উলঙ্গ করেই ওরা ওদের দেখতে থাকে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। প্রতিবাদ তো দূরের কথা অনুরোধ উপরোধ জানাবার মতো সাহসও কারো নেই। আড়ালে আব-ডালেই চলে বিক্ষোভের গুঞ্জরন। কেউ কেউ মোড়ল হিসেবে দীনু করিমের কাছেও নালিশ করে। কিন্তু কি করবে ওরা! পলানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মাথাই গুঁড়িয়ে গেছে। চরধল্লা তো এখন নিষ্প্রাণ নির্জীব। যারা প্রাণে বেঁচে আছে তাদেরও মাথা তুলবার উপায় নেই। নিতাই তাদের হৃৎপিণ্ডে ভীতির ছায়া রেখে গেছে। রমেন্দ্রনারায়ণ হয়তো এই সুযোগই চাচ্ছিলেন। নিতাইয়ের মতো শুধু সুদের কারবার ওর নয়। সাতপুরুষের জমিদারি। শিরায় শিরায় রয়েছে কূটবুদ্ধির বীজ। নিতাই ভুল করেছিল। কাল সাপকে কখনো লেজ কেটে ছেড়ে দিতে নেই। আহাম্মক—পাকা কলার কাঁদি দেখে কালনাগিনীর গর্তে হাত গলিয়ে দিলে। ছোবলের ভাবনা ভাবলে না। না না, নিতাইয়ের মতো ওর কখনো ভুল হবে না। মোড়ল দীনুকে শুধু ভিটে ছাড়া করলেই চলবে না। লোক চক্ষুর আড়ালেও পাঠাতে হবে। প্রয়োজন হয়···না, তার আর প্রয়োজন হবে না। খুন গুমের চেয়েও ভাল রাস্তা আছে। কোনরকমের ঝুঁকি নেই অথচ নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাবে।—ভাবতে ভাবতে কপালের বলি রেখাগুলো ফুলে ওঠে রমেন্দ্রনারায়ণের।

সেদিন সূর্য গ্রহণ। বিকেল পাঁচটায় রাহুগ্রাস থেকে মুক্তি পাবেন দিনমণি। চরের নরনারী মাত্রেই মুক্তি স্নানের পুণ্যার্জনে ব্যস্ত। অনেক দিন পর রাম-কান্ত আবার এসে কীর্তনের মাঝে যোগ দেয়। হয়তো গ্রহণ-দানের মধ্যেই রয়েছে ওর যোগদানের উৎস। চাল, ডাল, টাকা, পয়সায় মিলিয়ে পাওয়া মন্দ হবে না। স্নানযাত্রী মাত্রেই কিছু না কিছু দান করবে। শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও চরের মানুষ আজ আবার প্রাণপ্রাচুর্যে মেতে উঠেছে। দুঃখ তো ওদের নিত্যই লেগে আছে। পাপ থেকেই দুঃখের উৎপত্তি। আজকের এই পুণ্য দিনে নাম-গানে যদি সে পাপ কিছুটা দূর হয়। দীনুর বাড়িতে এসেই সকলে জড় হয়। সেখান থেকে নগরকীর্তন বেরুবে। সকলে মিলে একত্রে গ্রহণ-স্নান করবে।···

বেলা চারটে নাগাদ খোলে চাটি পড়ে। রামকান্তই আজ মূল গায়েন, দীনু খোল ধরে। উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনির পর শুরু হয় নাম-গান। ভাবাবেগে নাচতে থাকে কেউ কেউ। সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্নানের ঘাটে এসে দাঁড়ায় কীর্তনের দল।' ঝুমুরের তালে তালে চলে উচ্চকণ্ঠের নাম-গান। জয়ধ্বনি দিয়ে গান শেষ করে জলে নামতে যাবে সকলে, মেয়েদের ঘাট থেকে লোক ছুটে আসে। বউ-ঝিরা কেউ জলে নামতে পারছে না। 'গ্রীনবোট' প্রায় ঘাটের সংলগ্ন করে বাঁধা হয়েছে। কীর্তনের মধ্যে ডুবে থাকায় এতক্ষণ কারো নজরে পড়েনি। এবার ঘোরতর অসন্তোষ দেখা দেয়। চ্যাংড়াদের ভেতরে কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়েই উপযুক্ত জবাব দিতে চায়। কিন্তু দীনু বাধা দেয়। ও জানে ফল তাতে ভাল হবে না। সকলে রামকান্তকেই অনুরোধ করে, কুমার বাহাদুরকে 'বোট' অন্যত্র সরিয়ে নিতে।

রামকান্ত মহা ফাঁপরে পড়ে। কুমার বাহাদুর তো দিব্যি বোটের ছাদের ওপর বসে ডেক-চেয়ারে দুলছেন। ইচ্ছে করেই তো মজা লুটছেন। বাধা দিয়ে ও কেন বিষ নজরে পড়তে যাবে! ওর কি দায় পড়েছে! ওর তো আর ঝি-বউ কেউ নেই!···মাথা চুলকাতে চুলকাতে উত্তর করে রামকান্ত, আমার তো মনে হয় নাম-গান শুনতেই এসেছেন উনি। কীর্তন ওঁর খুব প্রিয়। অনর্থক বাজে কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দেওয়া হবে। তার চেয়ে মেয়েরা গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে স্নান করে নিক।

উত্তর শুনে রাগে দীনুর গা মাথা জ্বলে উঠে। কোথায় কীর্তন আর কোথায় উনি! হাঁ করে মেয়েদের দিকে চেয়ে আছে শয়তান। দুলে দুলে সিগারেট ফুঁকছে। ভক্তি তো কত, একবার নেমে পর্যন্ত এল না। কীর্তন শুনছে না, ছাই। ভট্‌চায মিছেই ওর হয়ে ওকালতি করছেন। ভাগবত পাঠ করে এমন বেহেডটার সঙ্গে মেলামেশা করেন কি করে! আজকাল ওঁর নিজের চালচলনও ভাল ঠেকছে না।···রামকান্তর কথায় কোন জবাব না দিয়ে দীনু নিজেই যায় ঘাটের দিকে। কীর্তনের দলের আরো জনকয়েক ওর সঙ্গ নেয়। পাড়ে দাঁড়িয়ে 'বোটের' মাঝিদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি শুরু করে।

রমেন্দ্রনারায়ণ সবই লক্ষ্য করছিলেন। এ রকম একটা কিছুর জন্যই অপেক্ষায় ছিলেন উনি। দাসু সর্দার গোড়াগোড়িই প্রস্তুত আছে। ডেক-চেয়ারে দুলতে দুলতেই দীনুকে শুনিয়ে হালের মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, ওরা কি বলছে রে বিপিন?

বিপিন মনিবের মেজাজ বুঝেই জোরালোভাবে সায় দেয়, পানসী ঘাটের থন সড়াইয়া নিবার কয় হুজুর।

—কে বলছে এ কথা? রমেন্দ্রনারায়ণ গর্জে ওঠেন।

হাত জোড় করে দীনু উত্তর করে, আইজ্ঞা, আমরাই কইছিলাম। ম্যায়া ছাইলারা ছান করবার পারচে না।

রমেন্দ্রনারায়ণ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দেন, কেন, জলে কি কুমীর আছে নাকি যে মেয়েরা স্নান করতে পারছে না! বোট তো অনেকটা ফাঁকেই রয়েছে।

আইজ্ঞা হুজুর, তাইলেও ম্যায়া ছাইলারা লজ্জা পাইবার নৈচে। দয়া কইরা একটু ফাঁকায় লইয়া যাইবার হুকুম ছান।

না না, এখন নোঙর তুলবার মতো লোক নেই। মাঝিরা ফিরলে দেখা যাবে'খন।

দীনু দেখছে, চার-পাঁচজন মাঝি গলুইর সামনে বসে হাতের কাজ করছে। নোঙর তুলতে বড় জোর দু'জনের দরকার। কুমার বাহাদুর তাহলে ইচ্ছে করেই বদমাইসি করছে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। কিন্তু ওর কিছু বলার আগেই মদন লাফ দিয়ে জলের ওপর পড়ে একাই নোঙরের দড়ি ধরে টানতে থাকে।

মদনের সাহস দেখে রমেন্দ্রনারায়ণ থ বনে যান। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে হুঙ্কার ছাড়েন, ও শালা কেরে দাসু, বোটের কাছিতে হাত ছোঁয়ায়? মার শালার মাথায় লাঠির বাড়ি।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে দাসু ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুধু লাঠির বাড়ি মেরেই ক্ষান্ত থাকে না। চুলের মুঠি ধরে মদনকে বোটের ওপর তুলে এনে একটার পর একটা কিল, চড়, ঘুষি মারতে থাকে।

গায়ের জোর মদনেরও কম নয় কিন্তু হকচকিয়ে গেছে বেচারা। ভাল বুঝে নিজের হাতে নোঙর তুলতে গিয়ে যে অপরাধ করে ফেলেছে একথা ও ভাবতেই পারে না। দাসু যত না ওকে নাকে খত দেবার জন্য চেঁচাচ্ছে ও ততোই রাগে ফুলছে। হয়তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ডই বাঁধবে।

দীনু ফাঁপরে পড়ে। পাড়ে মদনের মা দাপাদাপি করছে, পোলারে মাইরা ফালাইল। তোমরা যাও না গ, অরে ছাড়াইয়া আন···

দলের জোয়ান ছোকরারাও আবার ক্ষেপে ওঠে। মোড়ল হুকুম

করলেই একহাত দেখিয়ে দেবে। ও সর্দার-টর্দারের ভয় ওরা করে না। দীনুর বুকের রক্তও টগবগিয়ে ওঠে। বেশ ভাল কথা, আজ শক্তির পরীক্ষাই হোক। রোজ রোজ এত জ্বালাতন ভাল লাগে না। যা'হোক একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।…কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার গরম রক্ত হিম শীতল হয়ে আসে। রণে আশু জয়লাভের সম্ভাবনা থাকলেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কুমার বাহাদুরের এক তুড়িতে দলে দলে আসবে পুলিশ। প্রয়োজন হলে সৈন্য সান্ত্রীরও অভাব হবে না। দানবের পদতাড়নায় চর ধ্বংস হয়ে যাবে—ধন প্রাণ নিশ্চিহ্ন…সকলকে মাথা ঠাণ্ডা রাখার উপদেশ দিয়ে দীনু একাই জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য, বলে-কয়ে মদনকে ছাড়িয়ে আনা।

কিন্তু উপস্থিত জোয়ানরা সে কথায় কান দেয় না। দীনুর সঙ্গে ওরাও জন কয়েক জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে। সাঁতার কেটে তীর বেগে এগিয়ে যায় বোটের কাছে।

দীনু অন্য কাকেও কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই কুমার বাহাদুরের উদ্দেশ্যে কাকুতি জানায়, অরে ছাইড়া গ্যান হুজুর। আমি আপনার কাছে মাফ চাইচি। ছাইড়া গ্যান…

দাসুর যতো হিম্মৎই থাক চরের একগাছা লাঠির কাছেও সে দাঁড়াতে পারবে না। গত বাইচের সময়েই সে পরীক্ষা হয়ে গেছে। সুতরাং ফাঁপরে রমেন্দ্রনারায়ণও পড়েন। ভেবেছিলেন, চোখ রাঙিয়েই ইজ্জৎ বজায় রাখবেন। কিন্তু দাসুর বাড়াবাড়িতে অবস্থা এখন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। গোঁয়ারগুলো হয়তো বোটখানাই পা দিয়ে ডুবিয়ে দেবে। কে জানে, লাঠির ঘায়ে মাথাটাও চৌচির হয়ে যেতে পারে।…মানে মানে মদনকে ছেড়ে দেবার হুকুমই দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দাসু সে সুযোগ দিলে না। দীনুর কাকুতির জবাবে ভেংচি কাটে, ছাইড়া দিমু কি তোমার ভয়ে নাকি বৈরাগী ?

কতাবাত্তা হিসাব কইরা কও সর্দার। বালো অইব না, দীনুর কণ্ঠে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

কি বালো অইব না ! কি করবি তুই চাড়ালের পো ?

লজ্জায় অপমানে দীনুর মাথার রক্ত ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। মুখে আর কোন কথা না বলে কনুইতে ভর দিয়ে জলের ওপর থেকে এক লহমায় বোটের ওপর লাফিয়ে পড়ে ! সঙ্গে সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন। দাসুর লাঠি উঁচিয়ে ধরাই সার হয়।

কে যেন ধাক্কা মেরে জলের ওপর ফেলে দেয় ওকে। অন্যান্য মাঝিরা পুতুলের মতোই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঠকঠক করে কাঁপতেও। ফউ কেউ. রমেন্দ্রনারায়ণ পেছনের গলুই দিয়ে নেমে গিয়ে পায়খানার মধ্যে আত্ম-গোপন করেও স্বস্তি পাচ্ছেন না। জলের মধ্যেই হয়তো ডুবে মরতে হবে আজ। দাস্থ তো বেশ কয়েকবার নাকানি-চোবানি খেলে। দীনু বাধা না দিলে মরেই যেতো বেচারা। চরের মানুষ ক্ষেপে উঠেছে আজ। লাঠির বাড়িতে টুকরো করে ফেলবে বোট। আর নয়তো মাঝ গাঙে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে দেবে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে ওরা। আর নয়। শয়তান ওদের ঘরের বউ-ঝিদের ওপর নজর দিয়েছে। না, আজ আর কারো কথা শুনবে না ওরা! কোথায় পালালো শালা জানোয়ার!···পাড় থেকে আরো দলে দলে মানুষ সাঁতার কেটে এসে বোট ঘেরাও করে। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তেও শুরু করেছে। রামকান্ত প্রথম বারকয়েক থামাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জনকয়েক ওর ওপরেও হামলা করবার উপক্রম করলে চুপচাপই গা ঢাকা দেয়। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। না, মানসম্ভ্রম সবই গেলো। কুমার বাহাদুরের কাছেও আর মুখ দেখানো যাবে না। চর ছেড়ে পালানোই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। তাই যাবে ও। আর নয়, ঢের শিক্ষা হয়েছে।···

দীনু রামকান্তকেই খুঁজছিল। ওরা দু'জনেই যদি সমবেত চেষ্টায় ক্রুদ্ধ জনতাকে থামাতে পারে। কিন্তু কোথায় গেলেন উনি!···জনতা ইতিমধ্যে অন্যান্য মাঝিদের ওপর হামলা শুরু করে দিয়েছে। বোটের ওপরও দুমদাম করে লাঠি মারছে কেউ কেউ। জনকয়েক ঠেলে বোটখানাকে মাঝ নদীতে নেবারই মতলব আঁটছে। একা দীনু একজনকে আটকায় তো আর একজন এসে ফেটে পড়ে। ভাগ্যি ভাল যে আনন্দ এর মধ্যে নেই। সর্দি জ্বরে দু'দিন বিছানায় শুয়ে আছে ও। গায়ে হাতে ভীষণ বেদনা। দীনুকে একাকী বেসামাল দেখে বুড়োদের মধ্যে কে যেন ছুটে গিয়ে করিমকে খবর দেয়। করিম নামাজ পড়ছিল। খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। অনেক কষ্টে দুই মিতায় রমেন্দ্রনারায়ণের সম্ভ্রম রক্ষা করতে সমর্থ হয়। বোটখানারও এমন কিছু ক্ষতি হয়নি। সামান্য দু'চার টাকা খরচ করলেই মেরামত হয়ে যাবে। মদনকে ছাড়িয়ে নিয়ে সকলে মিলে চলে আসে বোট ছেড়ে।

রমেন্দ্রনারায়ণ ভয়ে এতক্ষণ কাঁপছিলেন। মুক্তি পেয়ে কূটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। জানোয়ারদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারা শক্ত। বুদ্ধির

জোরেই ওদের মাথায় ডাণ্ডা মারতে হবে। বোট যেমন আছে তেমনই থাকে। দাসু সর্দারকেও ভিজে কাপড়-জামা ছাড়তে দেন না। বোটের জিনিষপত্র নিজেরাই উলটুল করে রাখেন। কিছু কিছু কাগজপত্র পুড়িয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। তারপর নিজেই ডিঙ্গি নিয়ে যান থানায়।

চরের মানুষ ভেতরের ব্যাপার কিছুই টের পায় না। খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে যে যার মতো স্নান করে বাড়ি ফেরে। কেউ কেউ দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাবুডুবু খায়। কিন্তু দীনুর উদ্বেগ বেড়ে যায়। অপমানিত হয়ে চুপ করে থাকার লোক রমেন্দ্রনারায়ণ নন। শীগগীরই এর সমুচিত জবাব আসছে। হয়তো ভিটেমাটি ছাড়াই করবেন। বাগে পেলে জান নিতেও কসুর করবেন না। কিন্তু কি আর করা যাবে। সবই গ্রহের ফের। বিধাতা বোধ হয় ওদের কপালে সুখ লেখেন নি।...ভাবতে ভাবতে দীনুও একটা ডুব দিয়ে ঘাট থেকে উঠে যায়।

সন্ধ্যা সাতটা। গ্রহণের পর মাজা হাঁড়ি হেঁশেলে সবে রান্না চেপেছে। খেতে আজ একটু রাতই হবে। দীনু সামান্য একটু গুড় মুখে দিয়ে জল খায়। করিমের বাড়ির দিকেই পা বাড়াতে যাবে এমন সময় চারদিক থেকে লাল পাগড়ি এসে ছেঁকে ধরে। রমেন্দ্রনারায়ণের এজাহারে স্বয়ং রমণীমোহন এসেছেন সদলবলে। প্রকাশ্য দিবালোকে লুটপাট খুন-জখম করার মজা এবার দেখিয়ে ছাড়বেন।...

রমণীমোহনের মুখের ওপর কোন কথা বলার সুযোগ পায় না দীনু। চরের সকল মানুষই থ বনে যায়। বলছেন কি দারোগাবাবু! খাজনা আদায় করতে এসেছিলেন কুমার বাহাদুর, মোড়ল চরের মানুষকে উসকিয়ে তাঁর দলিল দস্তাবেজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে—টাকা-কড়ি লুট করেছে! মাথার ওপর কি ধর্ম নেই! নিজে বেহায়াপনা করলেন উল্টো ওদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন! মা বোনদের ইজ্জৎ বাঁচাতে চরের মানুষ না হয় একটু মরিয়া হয়েই উঠেছিল। কিন্তু মোড়ল তো ওঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট করতে দেয়নি। যেখানে লজ্জা পাওয়া উচিত উল্টো নিজেই সেখানে গায়ে পড়ে থানা পুলিশ করছেন!...দীনুর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। হাত জোড় করে যতবার রমণীমোহনকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে যায় রমণীমোহন ততোবারই ওর কথায় গর্জে ওঠেন। খুন ডাকাতির অভিযোগে কোমরে দড়ি বেঁধেই টানতে টানতে থানায় নিয়ে চলেন। করিম, রহমৎ, মদন কেউ বাদ যায় না। একা আনন্দ ছাড়া চরে জোয়ান মানুষ আর কেউ থাকে না। হয়তো ওদের মনের ভুল।

কিংবা অন্য কোন কারণও হতে পারে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল ওঠে। সামনেই পাট কাটার মরশুম। হাত সকলেরই শূন্য। গোলায়ও কিছু বলতে কিছু নেই। না খেয়েই মরতে হবে সকলকে। ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই পচবে।

রমণীমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা ও রমেন্দ্রনারায়ণের পাকা মাথার চালে কেউ নিস্তার পায় না। রামকান্ত স্বয়ং সাক্ষী দেয়। ও স্বচক্ষে দেখেছে, করিম আর দীনু লোককে উসকিয়ে 'বোট' লুট করিয়েছে। কুমার বাহাদুরকে খুন করতেও চেষ্টা করেছিল। শুধু ভাগ্যগুণে উনি জলের ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন। দাসু সর্দারের আপ্রাণ চেষ্টাতেই তা সম্ভবপর হয়েছে। সে নিজের জীবন পণ করে মনিবকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে। অনেক দিন থেকেই ওরা ষড়যন্ত্র করছিল। খাজনা দেবার নাম করে ডেকে এনে কাজ হাসিল করবে।...

রামকান্তর সাফাই সাক্ষীতে দীনু করিমের ওপর পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। অন্যান্যদের কারো তিন বছর, এক বছর, ছ'মাস।

সাক্ষী দিয়ে বহাল তবিয়তেই ফেরে রামকান্ত। তবে চরে আর নয়। সোজা রমেন্দ্রনারায়ণের কাছারিতে। নায়েবী না জুটলেও মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে খোদ মালিকের একান্ত সচিবের পদ জুটে যায়। এককালীন বকশিশ হিসেবেও মন্দ লাভ হয় না। আগেকার সমস্ত দায় দেনাই মাফ করে দেন কুমার বাহাদুর। ভিখিরী রামকান্তর মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হয়। আর ওকে অসভ্যের মতো ধেইধেই করে নাচতে হবে না। চাল চিঁড়েও আর চিবোতে হবে না। এবার প্রকাশ্যেই মাছ মাংস খেতে পারবে। হরির আখড়ার বাবাজী এখন যত খুশি শিষ্য করতে পারেন। ও আর চরে যাবে না। যদি যায়ও সে অন্যভাবে। মনিবের আদায় ওয়াশিলের জন্যই যাবে। গুরুগিরি, পুরুতগিরি আর জীবনে করবে না। না-না-না।

রায় দানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে পড়ে যায় দীনু। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য। হাকিমও বিচলিত হয়ে পড়েন। ধর্মাবতার ঠিকই বোঝেন, সব ষড়যন্ত্র। কিন্তু করার কিছু নেই। সাক্ষী প্রমাণে হাত-পা তাঁর বাঁধা। তবু সম্ভব মতো সুযোগ সুবিধা দিতে তিনি কসুর করেন না। সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে দীনুর ওপর। কয়েদী জীবনে হয়তো কঠোর শ্রমই করতে হবে ওকে। যে কাজ জানে না হয়তো সে কাজও করতে হবে।

না পারলে দাণ্ডাবেড়ী পড়বে। মেয়াদ আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে।...হাকিম বাহাদুরের প্রাণে দয়ার উদ্রেক হয়। সাধারণ জেলখানায় না পাঠিয়ে দীনুকে সোজাসুজি উনি হাসপাতালেই পাঠিয়ে দেন। বুড়ো মানুষ, অপমানের ধকলটা সইতে পারছে না। কে জানে, প্রাণে বাঁচবে কি না বেচারা...বুকের ভেতরটা কেমন যেন মোচড়াতে থাকে ধর্মাবতারের।

দীনু অপমানে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেও করিম অতো সহজে কাবু হয় না। মনের কোণে ঝড় বইতে থাকে! এই বিচারশালা! এরই নাম ন্যায় বিচার! বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে যারা উন্মত্ত জনতার গতি রোধ করলো উল্টো তাদেরই শাস্তির ব্যবস্থা! না না, সংসারে ধর্ম বলে কোন বস্তু নেই। সব ভোজবাজী—ধাপ্পা। বুদ্ধিই ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড। সে বুদ্ধি শুভ অশুভ যা-ই কেন হোক না। বুদ্ধির দৌলতেই মানুষ, রাজা, প্রজা, উজীর, নাজির। ওরা বোকা। বুদ্ধির দাপটে নিতাইরা তাই ওদের বারে বারে ঠকায়—জেলে পাঠায়—জানে মারে। হাকিমও ওদের কথায় সায় দেন। কে আর সত্যাসত্যের বিচার করছেন! আল্লাহ্ থাকলে তিনিই বা এসব সইবেন কেন! না, ওরকম কেউ কোথাও নেই। বুদ্ধিমান মানুষই বোকা মানুষকে ঠকাবার জন্য আল্লাহ্ ঈশ্বরের দোহাই পাড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুদ্ধিই সব। ঈশ্বর থাকলে তিনিও ওদের কাছে পরাজিত।...করিম চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। এতকাল যে হাতে একতারা বাজিয়ে প্রাণ খুলে গান করেছে ইচ্ছে করে, একতারা ছুঁড়ে ফেলে সে হাতে শয়তানগুলোর গলা টিপে ধরে। কিন্তু উপায় নেই। বুদ্ধিমানরা তার আগেই শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে ওকে। এখন তো ওদের হাতের ক্রীড়নক ও। ইচ্ছেমতো ঘাঁনি ঘুরাবে, ঘাস কাটাবে। ক্ষীপ্ত করিম অসহায় অবস্থায় মনে মনেই দাপাতে থাকে। ছেলে, বউ, শিষ্য, সামন্ত আদালতে অনেকেই উপস্থিত আছে। কিন্তু কারো চোখেই চোখ রাখতে পারে না ও। জীবনে কারো কোনদিন এতটুকু অমঙ্গল চিন্তা করেনি। ভক্তিভরে দয়াল চানরে ডেকেছে, তারই পুরস্কার কি এই তস্কর-লভ্য লাঞ্ছনা! দম বন্ধ হয়ে আসে করিমের। মাথা নীচু করেই গিয়ে কয়েদী গাড়িতে ওঠে।

রমেন্দ্রনারায়ণ ওদের জেলে পাঠিয়েই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দীনু চিরজনমের মতোই ওকে নিশ্চিন্ত করে যায়। আর কোনদিন ওকে

লাঠিয়াল দীনু বৈরাগীর কথা ভাবতে হবে না। চর নিয়েও আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কচকচে বালির ঢিপি এখন উর্বরা শক্তিতে প্রাণময়ী। সেলামী, নজরানা, খাজনা নির্বিঘ্নে আদায় হবে।.. এক একজনের নাকাদড়ি ধরে টান দেবে আর সুড়সুড় করে সব দখলে এসে যাবে। তারপর আবার বিলি-ব্যবস্থা আবার সেলামী, নজরানা। ঘূর্ণিচক্র। দেবে নেবে আবার দেবে।···

হাসপাতালে পৌঁছেই জ্ঞান ফিরে পায় দীনু। সমস্ত শরীর অবশ। মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকে। ডাক্তারের নির্দেশে নার্স এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আসে। কিন্তু দীনু এ পাপপুরীতে কিছু মুখে দেবে না। কি দরকার ওর চাঙ্গা হয়ে! জীবনের আর মূল্য কি! সাত পুরুষের নজীরে যা নেই ওর বরাতে শেষে তাই হলো! জেল—ফাটক—কারাবাস! লোকে কথার কথায় খোঁটা দেবে, খুনে, ডাকাত, দাগী! না না, তা ও সইতে পারবে না। কখনো না···হাউহাউ করে কাঁদতে থাকে দীনু। দেয়ালের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে ফেলে। উঁচু মাথা নীচু হয়েছে—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সম্ভ্রমই যদি গেলো তবে আর রইলো কি! না না, ও কিছু খাবে না। একজনের ছাড়া পৃথিবীতে আর ও কারো কোন অনুকম্পা চায় না। সে হচ্ছে চিরশান্তির অগ্রদূত মৃত্যু-দেবতার। একমাত্র মৃত্যুই ওকে সমস্ত জ্বালা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পেয়ালা হাতে সেধে সেধে নার্সের হাত ধরে যায়। ধমক দিতেও কসুর করে না সে। কিন্তু দীনুর মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা যায় না। দুধ খাবে ও কেমন করে? পেলে বরং বিষ খায়। কিন্তু কারাগারে কে দেবে ওকে সে মহামৃত! প্রাণের আবেগে নার্সের দু'হাত চেপে ধরে, দুদ আমি খামু না দিদি। দয়া কইরা আমারে একটু বিষ দ্যান। মইরা বাঁচি।···

নার্স আর ধমক দিতে পারে না। ওর বাপের বয়সী দীনু। চোখে মুখে সরলতার ছোপ। বেচারা নিশ্চয়ই মিথ্যে জালে জড়িয়ে পড়েছে। ব্যর্থ হয়ে দুধের কাপ টেবিলের ওপর রেখে ওয়ার্ড ইন্‌চার্জকে খবর দিতে যায়। একে একে অনেকেই আসেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক কোনরকম ভয় দেখিয়েও দীনুকে বসে আনা যায় না। দু'দিনে জলবিন্দু পর্যন্ত মুখে দেয়নি ও। শরীর ভেঙে পড়েছে। তিন দিনের দিন স্থির হয়, জোর করে ওকে ওঁরা খাওয়াবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর ওঁদের ও দিলে না। তিন দিনের দিন নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই জন্মের মতো ও ফাঁকি দিলে।

সকাল ন'টা। বাবার অবস্থা আশংকাজনক সংবাদ পেয়ে অশ্বিনী মাকে সঙ্গে করে জেলেই দীনুকে দেখতে আসে। বরাত ভাল যে গোলমালের সময় ও চরে ছিল না। পার্বতীকে সঙ্গে করে দিন কয়েকের জন্য শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। নয়তো ওকেও হাঙ্গামায় জড়িয়ে ফেলতো। এখন তো সব দিক থেকেই ওর ওপর দায়িত্ব এসে পড়ছে। বাড়ি-ঘর, ক্ষেতখামার সবই এর ভেতরে রমেন্দ্রনারায়ণ দখল করে নিয়েছে। মোড়লদের জেলে পাঠিয়ে বিন্দুমাত্র সময়ক্ষেপ করেনি শয়তান। সদম্ভে হিটলারি অভিযান চালিয়েছে। একদিকে কয়েদী গাড়ি জেলের দিকে ছুটেছে আর দিকে আদালতের পাইক পেয়দা চরের দিকে। বিনা বাধায় ডিক্রি জারি।

চর ছেড়ে চলেই যেতে হতো অশ্বিনীদের। দীনুর নামে যা কিছু ছিল একে একে সবই নিলামে তোলেন রমেন্দ্রনারায়ণ। শুধু পারে না সামান্য একফালি জমি গ্রাস করতে। ও-টুকুন কুসুমের নামে আছে। আইনের বেড়াজালে সুরক্ষিত। বছর দুই আগে হরিহর তার ভিটেটুকু কুসুমকে লিখে দিয়ে গেছে। বংশীর মুখে মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি—খান দুই খড়ের ঘর। শেষ জীবন বড় কষ্টে গেছে হরিহরের। উপযুক্ত ছেলে, ওলাওঠায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ। সংসারে দ্বিতীয় কোন অবলম্বন নেই। নিজেও বাতের রুগী। শোক-তাপ, রোগে পেট নিয়ে হিমশিম। দু'পাঁচ টাকা করে করে প্রায় শ'খানেক টাকা কর্জ করে ফেলে কুসুমের কাছ থেকে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় কুসুমের সংসার তখন জমজমাট। প্রতিবেশী হরিহরকে ও টাকা ও দান হিসেবেই দেয়। দুঃখী মানুষ—ঘরের কোণে না খেয়ে থাকবে! না না, তা হতে পারে না। কি সুন্দর নামগান গায় হরিহর কীর্তনিয়া। এমন মানুষকে এক হাতে দিলে দশ হাতে ফিরে আসবে। মা লক্ষ্মীরই নির্দেশ এ। কুসুম কোন রকম দাবী-দাওয়া না রেখেই যখন যা পেরেছে দিয়েছে। কিন্তু হরিহর ঋণ মাথায় করে পারে যাবে না। অন্তিম মুহূর্তের আগেই ও ভিটেটুকু কুসুমের নামে লিখে দেয়। এ শুধু ঋণ শোধ নয়। কুসুম যদি ওর ভিটেয় দীপ জ্বালে তা হলে পরলোকে থেকেও ও সুখ পাবে। কে আর আছে ওর সংসারে। কুসুম তো ওর মেয়েও হতে পারতো।

আপত্তি জানাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত স্নেহের ডোরে বাঁধা পড়ে কুসুম। হরিহর স্বর্গে গেছে—পাঁচ বছর। কিন্তু ভিটেয় দীপ জ্বালা একটি দিনের জন্যও বাদ পড়েনি। পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিয়েছে কুসুম। দীনুর গরু-বাছুর

হরিহরের বাড়িতেই থাকে। একজন রাখালও থাকে সেই সুবাদে। তাই শুধু দীপই জ্বলে না, হরিধ্বনিও পড়ে। কুসুম মাঝে মাঝে গিয়ে হরিহরের তুলসীমঞ্চ লেপেপুঁছে দিয়ে আসে। পালপার্বনে নিজে গিয়েই দীপ জ্বেলে সন্ধ্যা দেয়—কীর্তনিয়ার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

বড় বিচিত্র এ সংসার। বিধাতা যেন সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখেন। রমেন্দ্রনারায়ণ ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেন—হরিহর দেয় আশ্রয়। হ্যাঁ, একে আশ্রয়ই বলতে হবে। হরিহরের হাত দিয়ে বিধাতাই ওদের এ আশ্রয় লিখে দিয়েছিলেন। এ যেন রাম জন্মাবার আগেই রামায়ণ লেখা। তাড়া খেয়ে তাই আর বেশী ভাবতে হয় না। হোক সাজানো সংসার ছেড়ে কুটিরে বাস। তবু তো মাথা গুঁজবার ঠাঁই মিললো! এক হাতে চোখের জল পুঁছে আর-এক হাতে নতুন সংসার গুছোতে থাকে কুসুম। বজ্জাতরা লাথি মেরে অনেক জিনিষ তছনছ করে দিয়েছে। তা দিক, দয়াল হরির দয়া থাকলে আবার সব হবে। অশ্বিনী নিশি এখন বেশ বড় হয়েছে। ওরা দু'ভাইয়ে খাটলে ক'দিন আর লাগবে সব গোছগাছ করতে! সেবার তো ওদের বাপ একাই সব ঝুঁকি সামলালেন। কিন্তু উনি অতো ভেঙে পড়লেন কেন! এ ধরনের বিবাদ তো জীবনে কতবারই গিয়েছে। এই ভাগ্য নিয়েই তো জন্মেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তো লড়াই করেই বেঁচে থাকতে হবে। এ ওদের সকলের ভাগ্যের লিখন। এতে আবার মান-অপমানের কি আছে! চুরি-ডাকাতি তো আর করেননি। ঋণ করেছেন তা শোধ দিতে পারেননি। তাতে হয়েছে কি! না না, নিশির বাপের এ রকম জেদ অহেতুক। তাছাড়া জেল তো আর তাঁর একার হয়নি। চরের কোন ঘর আর বাদ গেছে? সকলে তো বেশ বুক ফুলিয়েই গর্ব করছে। শয়তানের সঙ্গে সমানে যুঝে চরের ইজ্জৎ বাঁচিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কেউ কোনদিন ওদের অপমান করতে সাহস পাবে না। আইনের বিচারে জেল হয়েছে—দু'দিন খেটে আসবে। কিন্তু ওরা তো জানে, কোন অন্যায়ই ওরা করেনি।···ঠিকই তো। এতো গর্ব করবার মতোই ব্যাপার। তবে উনি এত ভেঙে পড়লেন কেন? স্বামীর অনাহারের খবর পেয়ে কুসুম মনে মনে বিরক্তই হয়। এ আবার একটা জেল নাকি। এতো গৌরবের জয়টিকা!···

কুসুম নিশ্চিন্ত হয়ে এসেছিল, স্বামীকে দু'কথাতেই চাঙ্গা করে তুলতে পারবে। কিন্তু জেলের দরজায় পা দিয়েই দমে যায়। শক্ত-সমর্থ মানুষটা

তিন-চারদিনে একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দৈহিক জ্বালা যন্ত্রণার চেয়ে মানসিক উত্তেজনাটাই এর মূল কারণ। চিকিৎসকরা তাই বললেন। কিন্তু এদিকে যে মাত্র আধ ঘণ্টা সময়। এই সামান্য সময়ে পারবে কি ও মোড়লকে চাঙ্গা করে তুলতে? যদি একটা দিনও ওকে এখানে থাকবার অনুমতি দিতেন কর্তৃপক্ষ। না, তা আর কোনরকমেই হবার নয়। অন্ততঃ এ যাত্রা তো নয়ই। আবার দরখাস্ত করলে যদি ওপরওয়ালা মঞ্জুর করেন। এরা তো সকলেই তাঁর হুকুমের চাকর। ঘড়ি ধরে কাজ করবে।....ইতস্ততঃ করতে করতেই দীনুর বিছানার কাছে এগিয়ে যায় কুসুম। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কোন-দিনই বড় একটা ঘরের বার হয়নি, চারদিকের পরিবেশ দেখে শুনে সঙ্কোচ হতে থাকে। মাথার ঘোমটাটা আরো খানিকটা টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানার ওপর গিয়ে বসে। অশ্বিনী চুপচাপই শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদের দু'জনকে দেখে দীনু হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে।

কুসুম আঁচল দিয়ে চোখ পুঁছিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি কান্দ ক্যান? না খাইলে কি বাঁচবা?

কান্না থামিয়ে ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠে দীনু, না না, ই পাপ-পুরীতে আমি কিচু খামু না। তোমরা আমারে একটু বিষ আইনা দ্যাও···

পোলাপানের সামনে কি যা তা কও? অবুজ অইলা নাকি?—দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দেয় কুসুম।

হ হ, আমি অবুজই অইচি। ই পরান আর রাকুম না···বলতে বলতে বুকের ওপর জোরে জোরে কিল মারতে থাকে দীনু।

কুসুম হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে সান্ত্বনা দেয়, অমুন কইর না। পোলার মুখের দিগে চাইবা না? তুমি মরলে অগ দেখব ক্যারা? দেখতে দেখতে না পাঁচটা বছর কাইটা যাইব।

কাইটা গেলেই কি! ই মুক আমি চরের মাইনষেরে দ্যাহামু কেমুন কইরা? হগলে আমার মুকে থুথু দিব না?

ক্যারা তোমার মুকে থুথু দিব! হগলে না তোমার সুখ্যাতিই করবার নৈচে। তুমিই না হগলের মান বাঁচাইচ।....

হ, চোর ডাকাইতের আবার সুখ্যাতি করবে নে মাইনষে! তোমরা আমারে পাগল পাইচ! ভোগা কথা বইলা বোকা বনাইবার চাও!···

অশ্বিনী এতক্ষণ নিরুত্তর ছিল। এবার মুখ খোলে, ভোগা কতা আমরা

কমু ক্যান, আদালতে গ্যাহ নাই চরের মানুষ দল বাইন্দা তোমারে দেখবার আইচিল ? তারা না হগলেই হায় হায় করবার নৈচে।

তারা তামসা দেখবার আইচিল রে বাপ, তুই তাগ চিনচ নাই।

তামসা দেখবার আইচিল! তুমি কও কি! না খাইয়া খাইয়া তোমার মাথার ঠিক নাই! তারা না অনেকেই তোমার লগে লগে জেলে আইচে!

দীনু এবার আর কোন উত্তর করতে পারে না। খানিক চুপ করে থাকে।

নার্স এক পেয়ালা নেবুর রস নিয়ে আসে।

অশ্বিনী পেয়ালাটা হাতে নিয়ে অনুরোধ করে, আর মন খারাপ কইর না। মাথার উপুরে ভগবান আচে, ইয়ার বিচার করবই। খাইয়া লও। না খাইলে বাঁচবা কেমনে ?

দম ধরে ছিল দীনু, আবার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে, না রে বাপ না, আমি আর বাঁচবার চাই না। আমারে আর খায়নের কতা কইচ না। বংশের কলঙ্ক আমি।

তুমি না বাঁচলে আমরা দাড়ামু কুথায় ?

ঘরে যা বাপ—ঘরে যা। চেষ্টা কইরা গ্যাখ, ভিটা খামার রাখবার পারচ কিনা।

অশ্বিনী জবাব দেবার আগে কুসুম ফেটে পড়ে, ঘরে যাইবার কও ঘর কি আর আচে। হ্যাও না তারা কাইড়া নিচে।

কি কইলা! আমারে ফাটকে পাঠাইয়াও তাগ শান্তি অইল না! দুইডা দিনও তোমাগ সময় দিল না! বুচ্চি, ই সবই ঐ বজ্জাত ঠাকুরের কাম। খাল কাইটা আমিই কুমইর (কুমীর) আনচিলাম চরে। হগলেরেই মারব শয়তান। একবার যদি ছাড়া পাইতাম—চরে যদি একবার যাইবার পারতাম— চোখ মুখ রক্তবর্ণ করে গজরাতে থাকে দীনু।

চেঁচামেচি শুনে ওয়ার্ড ইনচার্জ দৌড়ে আসেন। ধমক দেবার আগেই দেখেন, মুখ বন্দ হয়ে গেছে রুগীর। কুসুম অশ্বিনী ডুকরে ওঠে। ওয়ার্ড ইন্‌চার্জ নাড়ী পরীক্ষা করে বোঝেন, দীনু আবার মূর্ছা গেছে। তাড়াতাড়ি ওষুধের ব্যবস্থায় ছুটে যান। সংবাদ পেয়ে সুপারিনটেনডেণ্ট সাহেবও হাজির হন। কিন্তু জ্ঞান ফিরে আসার আগেই কুসুম অশ্বিনীকে চলে আসতে হয়। কুসুম কান্নাকাটি করেও টিকতে পারে না। চোখের জল মুছতে মুছতেই বেরিয়ে আসে।

পরদিন সকালে অশ্বিনী খোঁজ নিতে গিয়ে জানে, শেষ রাত্রে মারা গেছে

দীনু। সমস্ত দিনই অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে। জ্ঞান যতক্ষণ থেকেছে, খুন করুম—খুন করুম, চীৎকারে গগন ফাটিয়েছে। জোর করে পথ্য দেবার কথা ছিল। কিন্তু অবস্থার ফেরে তা সম্ভবপর হয়নি। নিজের জেদ বজায় রেখেই চোখ বুজেছে মোড়ল।

এত শীগ্‌গীর বাবা ওদের ছেড়ে যাবে এ কথা ভাবতেও পারে নি অশ্বিনী। সহসা মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। কুসুমের কথা ভেবেই চোখে মুখে অন্ধকার দেখে ও। বাবাকে তো হারালোই, মাকেও আর বাঁচাতে পারবে না। সঙ্গে আসার জন্য ছটফট করছিলেন। এখন গিয়ে কি সান্ত্বনা দেবো! কিন্তু এ তো আর চাপবার কথা নয়। নির্মম কর্তব্য রয়েছে সম্মুখে। পিতার শেষ কাজ করতেই হবে।···অশ্বিনী দাঁতে দাঁত চেপেই যথাকর্তব্য করে যায়। কুসুমকে নিয়ে ওর যা আশংকা ছিল, ঠিক তা হয় না। কেমন যেন থ মেরে যায় বেচারা। কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারে না। অশ্বিনী একবার ভাবে, মার হলো কি! আবার ভেবে নিশ্চিন্ত হয়, না না, কর্তব্য-কর্ম করতেই মা এখন ব্যস্ত। কান্নাকাটি করার তো যথেষ্টই সময় পাবে।···

সদর হাসপাতাল থেকে নৌকোয় করে চরে নিয়ে আসে ওরা মোড়লকে। চরের এত বড় সুহৃদকে অন্য কোনখানে দাহ করা চলে না। সাবেকী বাড়ি ঘর দোর না থাকলেও চরে সামান্য একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই ওদের আছে। তা ছাড়া ধরতে গেলে গোটা চরই তো মোড়লের কর্মভূমি। ভিনদেশের পাকা শ্মশানের চেয়ে দেশের পলিমাটি ঢের ভাল। বড় দাগা পেয়েছে মোড়ল। স্নিগ্ধ-শীতল তটভূমিতে মর্মজ্বালা জুড়োবে।···

পরের দিন ভোরে শব বোঝাই নৌকো চরে এসে লাগে। কুসুম এবার কান্নায় ফেটে পড়ে। অশ্বিনীও ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকে। নিশি, পার্বতী, ময়না একে একে সকলেই এসে জড়ো হয়। বলতে গেলে চরের সকলেই মোড়লের আপনার জন। কান্নায় কান্নায় সমস্ত চর মুষড়ে পড়ে। চরের প্রকৃত জনককেই আজ হারালো ওরা। এবার তো দিনে দুপুরেই শেয়াল শকুনীর উৎপাত শুরু হবে। বৈরাগী খালের মুখেই চিতা সাজানো হয়। আষাঢ়ের বংশী কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। খালও নতুন জলে টৈ-টুম্বুর। আকাশ থমথমে। অশ্বিনী নিশির হাতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় মোড়ল।

চরের সবল সুস্থ হেন জন নেই যে মোড়লের চিতার পাশে এসে দাঁড়ায়নি—

কিংবা অশ্রু বিসর্জন করেনি। সবল সুস্থ তো দূরের কথা অনেক রুগ্ন জনও কাতরাতে কাতরাতে এসে মোড়লের উদ্দেশ্যে দু' ফোঁটা অশ্রু-অর্ঘ্য দিয়ে গেছে। আসেনি শুধু একজন। সে রামাকান্ত। কেউ ওর কথা মুখেও আনে না। শয়তানকে সকলেই চিনেছে। বুড়ো-বুড়ীর মধ্যে জনকয়েক থুথুই ফেলে নচ্ছারের উদ্দেশ্যে। এমন বেইমানও মানুষ হতে পারে! বাপের বয়সী মোড়ল, বাপের মতো স্নেহ মমতা দিয়ে বিপদে আলুগে রেখেছিল। শুধু স্নেহ-মমতাই নয়, হাজার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গুরুজ্ঞানেই ওকে ভক্তি করেছে—সম্মান দিয়েছে। কিন্তু নিমকহারাম এত বড় কৃতঘ্ন যে, এমন মানুষের শেষ সময়েও একবার পাশে এসে দাঁড়ালো না। ছি ছি ছি, ওই আস্ত পশুটাকেই ওরা এতকাল ভক্তি করেছে, ভাগবতের আসরে বসিয়েছে! যাক্, ভালই হয়েছে। মোড়লের শেষ কৃত্যের সময় যে পাষণ্ডটা ধারে কাছে আসেনি এটা মঙ্গলেরই চিহ্ন। অন্তিম সময়ে মোড়ল ওর কুৎসিত রূপটা ঠিকই ধরে ফেলেছিলেন। শুনেছি, খুন করবার জন্যে ক্ষেপেও উঠেছিলেন। সে উত্তেজনাতেই নাকি মোড়লের প্রাণ নাশ হয়েছে। পাষণ্ডের মুখদর্শনে পাপই হয়। ও না এসেছে ভালই হয়েছে।···

অন্যপর সকলে ছি ছি করে শান্ত হলেও অশ্বিনী অতো সহজে হাল্কা হতে পারে না। এর প্রতিশোধ ওর চাই। এ মৃত্যু নয়—রীতিমতো হত্যা। ষড়যন্ত্র করে রমেন্দ্রনারায়ণ আর রামকান্তই মোড়লকে মেরে ফেলেছে। ওরা দু'জনেই ঘাতক। ঘাতকের শাস্তি—প্রাণদণ্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোড়লের প্রাণের বিনিময়ে ওদের দু'জনকেও প্রাণ বলি দিতে হবে। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে—তা যেখানেই থাক পাষণ্ডদের নিস্তার নেই। নিতাই সা-ও নিস্তার পায়নি, ওরাও পাবে না। এখন ঠিক বুঝতে পারছি, কেন ওসমানরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। নিতাইকে খুন না করে কেন ওরা শান্ত হতে পারছিল না? সে কি করে সম্ভব! পিতার প্রতি পুত্রের যে এ এক বিরাট কর্তব্য। এ কর্তব্য না করলে পিতৃতর্পণ কখনো সার্থক হবে না। স্বর্গেও তাঁর শান্তি হবে না।···ভাবতে ভাবতে দু'চোখ রাঙা হয়ে ওঠে অশ্বিনীর। পারে তো এক্ষুণি হত্যাকারীর মুণ্ডু দু'টো কেটে এনে মোড়লের চিতায় আহুতি দেয়। কিন্তু না, এখন উত্তেজিত হলে চলবে না। গুরু দশার সময় শরীরে হিংসা দ্বেষ রাখতে নেই। শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে কত শক্তি ধরে নায়েব আর তার খোদ মনিব।···অশ্বিনী অনেক কষ্টে নিজকে সংযত রাখে।

দীনু মরে বাঁচে। কিন্তু করিমের সে-দিক থেকেও নিস্তার নেই। দীনুর মতো ও-ও কোন খাদ্যবস্তু মুখে দিতে পারছে না। লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে দু'চোখ বেয়ে অবিরত জল ঝরছে। এমন বজ্জাতও মানুষে হয়! একবার যদি ছাড়া পাই, শয়তান দু'টোর গলা টিপে মেরে ফেলবো না।···কোন হানে পলাইবা মশয়রা? যম তোমাগ লগেই আছে। এইত, এই—এই ধইরা ফালাইছি। ক্যা, এহন চেঁচাও ক্যা শালারা? বজ্জাতি করবার সময়ে মোনে আছিল না? মর—মর শালারা···ক্ষিপ্ত করিম নিজের গলা নিজেই টিপে ধরে। চোখ মুখ কেমন যেন বীভৎস হয়ে উঠে। দু' চোয়াল বেয়ে অবিরত গেঁজলা বেরুতে থাকে। জেল-প্রহরী থ বনে যায়। অরে, মিঞায় কি ক্ষেইপা গেলো নাকি! অমুন করচে ক্যান!···তাড়াতাড়ি চাবি দিয়ে দরজা খুলে গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে দিতে যায়। করিম ঝোঁকের মাথায় নিজের গলা ছেড়ে দু'হাত দিয়ে সজোরে প্রহরীর গলা টিপে ধরে। হাঁ করে কামড়াতে যায় ওর নাকে মুখে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর বেচারা কোনরকমে ছাড়া পেয়ে ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। তিল মাত্র দেরি না করে ঘন ঘন হুইসল্ বাজাতে থাকে। সঙ্কেত শুনে আশপাশ থেকে আরো জনকয়েক প্রহরী এসে জড় হয়। সংবাদ পেয়ে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট সাহেবও আসেন। করিম ভূতলামি করছে বলেই সর্বপ্রথম মন্তব্য করেন উনি। জেলখানার নিয়মমাফিক দিনকয়েক কঠোরতা অবলম্বন করতেও কার্পণ্য করেন না। কিন্তু না, কিছুতেই কিছু হয় না। করিম এখন ঘোর উন্মাদ। অনাহারে অত্যাচারে দিন দিন কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠছে ও। কেউ কাছে গেলেই তেড়ে আসে। খেতে দিলে সব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জেল ডাক্তার সর্বশেষ ওকে পাগলা গারদে পাঠাতেই মনস্থির করেন। আশ্চর্য, পাগলের ওঝা নিজেই আজ পাগল। আর দয়াল চানের আসর বসবে না। তেল পড়া, জল পড়া নিতেও চরে আর কেউ কোনদিন আসবে না। চরের গুণীরা একে একে সকলেই ডুবছে।

॥ ৩২ ॥

আনন্দকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। রোজ বিকেলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। গঞ্জের সরকারী ডাক্তারখানা থেকে দিনকয়েক ওষুধ এনে খেয়েছিল, কিন্তু ফল কিছু হয়নি। লোকে বলে, কুইনাইনের বদলে অন্য তেতো থাকে মিকচারে। শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে আনন্দর। নিয়ম করে দিন

কতক খাওয়া-দাওয়া করেও ফল কিছু হচ্ছে না দেখে এখন আর কোন বাছবিচার করে না। আর খাবেই বা কি? নিয়মিত দুটি নুন ভাতই তো জুটছে না। রুগীর খাদ্য কোথা থেকে আসবে! না না, আনন্দর আর ভাল লাগে না। মরে মরবে, এ নিয়ে আর কিছু ভাববে না ও। চর তো বীরশূন্যই হয়ে পড়েছে। ওরই বা বেঁচে থেকে লাভ কি? ভগবানের ইচ্ছে নয় চরের মানুষ খেয়ে-পরে সুখী হয়। এত পরিশ্রম করেও যখন দু'বেলা খাওয়া জুটছে না, তখন খেটে কোন লাভ নেই। রোগে ভাবনায় আনন্দ কাবু হয়ে পড়ে। ভাবনায় ভাবনায় দুর্গাও বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। মোড়লের ঘরে মেয়ে দিয়ে ভেবেছিল, না জানি কত সুখ হবে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে সুখ তো দূরের কথা এখন দিন চলাই ভার। বরাত যত মন্দই হোক, কুসুম বেয়ান ভাগ্যবতী। কোন যন্ত্রণাই ভোগ করলেন না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গে গেলেন সতীলক্ষ্মী। আমি হতভাগী—মহাপাপী। যমও আমাকে চোখে দেখছে না। জানি না, বিধাতার মনে আরো কি আছে। রামকান্ত তো দম ধরে আছে। শয়তান, চরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। কি কুক্ষণেই না হতচ্ছাড়ার কাছে হাত পেতেছি। এখন তো আর ওর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করার কোন তাৎপর্যই নেই। চরসুদ্ধ মানুষ ওর বজ্জাতি ধরে ফেলেছে। আমাকে নিয়ে হয়তো ভীষণতরই একটা মতলব আঁটছে। কিন্তু উপায় কি? মেয়েটাকে একা ফেলে যাই-ই বা কোথায়?···

ঠাকুর শয়ান দিয়ে দাওয়ার ওপর বসে একাকী ভাবছিল দুর্গা। দিগন্ত জুড়ে খাঁ খাঁ করছে ঘন অন্ধকার। জন-মনুষ্যের সাড়াশব্দ নেই। দিন দুপুরেও এখন আর চরে কোনরকম হইচই শোনা যায় না। প্রাণচঞ্চল মানুষগুলো যেন প্রাণ হারিয়ে মরে আছে। কার্তিক মাস, পাল-পার্বন নাম-গানে যে চর সদা-সর্বদা মুখরিত থাকতো সে চর আজ নিষ্প্রাণ, নিষ্প্রভ। ফকির সাহেবের মতো গুণী মানুষ কিনা শেষটায় পাগল হয়ে গেলেন! আর তা না হয়েই বা উপায় কি! শয়তানরা তো মিছিমিছিই জ্বালাতন শুরু করলে। মানুষ কত আর সহ্য করতে পারে। তা বেশ আছেন ফকির সাহেব। সব ভুলে আছেন। আমাকে যদি পাগলও করতেন ভগবান!······না না, পাগল হলে আমার চলবে না। শয়তানরা আমার ময়না নিশির পেছু নেবে। ওদেরও হয়তো গলা টিপে মারবে। পাগল হবার আগে ওদের দুটিকে নিশ্চিন্ত করতে হবে। আনন্দ তো বলছে, খুন করবে রামকান্তকে। সেই ভাল, খুনই করুক শয়তানকে।

ঘরের শত্রু বিভীষণ। ও-ই সব কিছু জ্বালাবে। ওকে শেষ করতে পারলেই চর নিশ্চিন্ত। আমার ময়না নিশিও সুখে ঘর করতে পারবে।......উত্তেজনায় দুর্গার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ একা আছে। যদি এসেই পড়ে শয়তানদের কেউ ? রামকান্তকে তো আর চিনতে বাকী নেই। বল্লমটা হাতের কাছে থাকাই ভাল। মরতে হলে, মেরেই মরবো।....গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ঘরের ভেতর যাচ্ছিল দুর্গা, সদরে ক্ষ্যান্তর গলা শোনা যায়, বউ আচচ্ নাকিল, অ বউ......

ক্ষ্যান্তর গলা শুনে কতকটা নিশ্চিন্ত হয় দুর্গা। যাক, দু'দণ্ড বসে কথাবার্তা বলা যাবে। চর তো এখন শ্মশান। ক্ষ্যান্তটা আর যাই হোক মিশুকে আছে। আচার-ব্যবহারও আজকাল মন্দ করছে না। আগেকার আচরণের জন্য নিজেই গায়ে পড়ে খেদ করেছে। আর যাই হোক ওকে দেখে বুকে বল পাওয়া যায়। ডাক-হাঁক করে বাড়ি মাতিয়ে রাখে। কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। রামকান্তর আদিখ্যেতা তো ও-ই বেশী করে করছে।...দুর্গা খোলা মনেই উত্তর করে, আচি দিদি, আহ। একা একা বালো লাগচিল না। ঘরে যাইবার নৈচিলাম।

অভ্যর্থনা পেয়ে ক্ষ্যান্তও গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, আর কচ্ ক্যান বইন। চরে এহন দিনে দুপইরে চলতে বয় (ভয়) করে।

হ দিদি, যা কইচ, গাটে (ঘাটে) পথে বাইরইতেও বুক কাঁপে এহন।

কইলাম ত তরে চম্পার ওহানে একবার ন (চল)। তুই ত আমার কতা কানেই দ্যাচ্ না। ই মুল্লুকে হার মত গুণী কেউ নাই। এই যে এই গাচের শিকর টুকুন পইড়া দিচে, ইয়ার জোরেই না রাইত বিরাইত চইলা খাই। নইলে কি আর রক্ষা আচিল! কবে না ঘাড় মটকাইত! চম্প কয়, বড় জব্বর একজন আচে ই চরে, বলতে বলতে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা বাঁ হাতের মাদুলিটা দুর্গাকে দেখায় ক্ষ্যান্ত।

ক্ষ্যান্তর যুক্তিতে দুর্গা আগে কোনদিন সাড়া দিতে না পারলেও আজ আর কেন যেন প্রতিবাদ করতে পারে না।

ওকে নিরুত্তর দেখে ক্ষ্যান্ত পুনরায় আরম্ভ করে, তরা ত এতকাল করিম ফকিররে লইয়াই নাচানাচি করলি, কিন্তু কি অইল এহন? হার ঘাড়ও ত মটকাইল। বলি, দেও দস্যির দিষ্টি, ও সব গান-বাজনায় কুলাইব না। বৈরাগী মোড়লও হার পাচায় পাচায় থাইকাই মরল। একবার যদি

চম্পারে দিয়া একটা কিরা করাইত তবে কি আর ই দশা অইত? কোতায় পলাইত কুমার বাহাদুর আর কোতায় পলাইত নিতাই সা। কপাল—কপাল, সবই কপালে করায়, কথা শেষ করে ক্ষ্যান্ত নিজের কপালে করাঘাত করে।

দুর্গা এবার আর চুপ করে থাকতে পারে না। খোলাখুলিই উত্তর করে, হ দিদি, তোমার কতাই ঠিক। কপাল না অইলে কি আর পলান ব্যাপারীর মতন মাইনষের ওরকম অয়! পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান পোলা, একটাও চরে রইল না।

তবেই বোজ, তামসাডা কি! তরে কই বউ, এহনও সময় আচে, ম্যায়া জামাইয়ের মোঙ্গল যদি চাচ্ তয় চম্পর কাচে একবার ন। আনন্দর হালডাও ত দেখবার নৈচচ্, অসুক কল্লে কি আর অষৈদে কাম অইত না! অর উপুরেও তেনার নজর পড়চে। মোঙ্গল চাচ্ ত……

ক্ষ্যান্ত মুখের কথা শেষ করতে পারে না। দুর্গা কথা কেড়ে নিয়ে সায় দেয়, হ দিদি, তাই যামু। এহন কবে যাইবা তাই কও।

আর দেরি কইরা কাম কি? সামনের অমাবস্যাতেই ন না? ঐ দিনেই চম্পর লগে তেনার মোকাবিলা অয়।

তবে তাই নও। কিন্তু আনন্দ জানবার পারলে ত যাইবার দিবার চাইব না। ও ওসব ভূত-পেতনী বিশ্বাস করে না।

অরে তর কইয়া কাম কি? চম্প দুপুর রাইতে পূজায় বহে। আমরা হ্যার কিচুডা আগে বাইরমু।

অত রাইতে একা একা যামু!

একা যামু ক্যান! মোল্লার চরের জলধর মাজিও হ্যার ম্যায়া বউ লইয়া যাইব। হ্যারে কমুনে, আমাগ য্যান লইয়া যায়।

তয় ত (তা'হলে) কোন কতাই নাই। খালের মুকে (মুখে) নাও (নৌকো) রাখলেই ইটুকুন পথ আমরা হাঁইটা যাইবার পারুম। আনন্দ ত বিচানায় পড়ে কি মরে।

তয় ত আর বাবনার (ভাবনার) কিচু নাই। এই কতাই রইল, আমি এহন উঠি। এক একা আর বাইরে থাকিচ না। পাড়া ত ইয়ার মদ্দেই নিজঝুম আইয়া পড়ল।

হেই কতাডাই আমারে কও। ঐ শত্তুররে লইয়াই অইচে আমার

জ্বালা। অর পরানে বয় (ভয়) ডর বইলা কিচু নাই।—আনন্দর উদ্দেশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করে দুর্গা।

ক্ষ্যান্ত সান্ত্বনা দেয়, কি আর করবি, তেনার নজর পড়চে বইলাই অরে অমুন ব্যাড়াবাড়িতে ধরচে। পূজা দিলেই মতিগতি বালো অইব। ওঠ এহন, আর বাইরে থাকিচ না, কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ায় ক্ষ্যান্ত।

দুর্গার গাটা সত্যি আজ কেমন যেন ছমছম করতে থাকে। চরে আছে অনেক দিন। কিন্তু এরকম ভয় ওর কোনদিন করেনি। ক্ষ্যান্ত উঠোনের ওপর থাকতে থাকতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

॥ ৩৩ ॥

কার্তিক মাস। জলে টান ধরেছে। বাতাসে শেওলা পচা দুর্গন্ধ। হাঁটা পথে খালের মুখে যেতে হলে কাদা জল ভেঙেই তা যেতে হবে। ক্ষ্যান্ত দুর্গা তাই যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষ্যান্ত খড়ের গাদার পেছনে এসে অপেক্ষা করবে। আনন্দ ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি উঠে যাবে দুর্গা। তারপর দু'জনে মিলে একসঙ্গে যাবে খালের মুখে। সেখান থেকে চম্পর ওখানে। সমস্ত ব্যবস্থাই পাকাপাকি আছে।

সারাদিন উপোস দিয়ে আছে দুর্গা! এতে ওর কোন ক্লান্তি নেই। একদিন কেন, সংসারের আপদ তাড়াতে যদি আমরণও ওকে উপোস দিতে হয় তাহলেও ও তা নিয়ে ভাববে না। ওর ভাবনা শুধু, ময়না নিশির কল্যাণ হবে কিনা— আনন্দর জ্বর ছাড়বে কিনা। চম্পর দয়ায় পোড়া সংসারের শ্রী ফিরে আসবে কিনা···

অধিকাংশ দিনই আনন্দ সন্ধ্যা রাত্রে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। জ্বর গায়ে কোথাও বেরোয় না। কিন্তু যেদিন জ্বর না আসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মাছ ধরতে আর নয়তো তাস-পাশার আড্ডা দিতে যাবেই। একবার বেরুলে, ফিরবে আবার সেই দুপুর রাত্রে। দুর্গা এ নিয়ে অনেক বকেঝকে দেখেছে, কিন্তু ফল কিছু হয় নি। দিন দিন কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছে আনন্দ। তাছাড়া পুরুষ মানুষ, দিনরাত ঘরেই বা আবদ্ধ থাকে কি করে! ইদানীং অনেকটা ঢিলই দিয়েছে দুর্গা। কিন্তু আজকের ভাবনা যে বড় ভাবনা। আজ আনন্দ ঘরে না গেলে ও বেরুবে কেমন করে? যাক, ভগবান ওর মুখ রেখেছেন। আনন্দ খেয়ে-দেয়ে অন্যদিন অপেক্ষা একটু সকাল সকালই ঘরে

গিয়েছে আজ। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে অসাড়ে। দুর্গা অন্তরে বল পায়। লক্ষণ তো সব দিক দিয়ে শুভই মনে হচ্ছে। এখন জানেন মা কালী।

রাত আনুমানিক এগারোটা। গগন জুড়ে বিষাদ-ঘন অমাবস্যায় গাঢ় অন্ধকার। চর নিস্তব্ধ। হিমেল হাওয়া দিচ্ছে। কোন জন-মানুষের সাড়া শব্দ নেই। ব্যাঙ-পোকা-মাকড়ের একটানা কলকণ্ঠে প্রহরে প্রহরে ভয়াল হয়ে উঠছে অমাবস্যার রজনী। দুর্গা অন্ধকার ঘরে একা জেগে বসে আছে। সারাদিন এলোমেলো ভাবনার মধ্যে কেটেছে। সত্যিই কি, চম্পর ঝাড়ফুঁকে সমস্ত বিপদ কাটবে? ভাগ্যের লিখন মানুষ খণ্ডাবে কি দিয়ে? বিধাতা তো জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কপালে ভাগ্যফল লিখে দেন। জীবনব্যাপী মানুষ তো সেই পাশার ছকেই ঘোরে। তবে?....না না না, আর সংশয় নয়। ক্ষ্যান্ত বলেছে, চম্পর দয়ায় অনেকে অনেকে ফল পেয়েছ। ভাগ্যই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। আর ভাবনার কিছু নেই। চম্পর কাছেই যাবে ও। দশজনের যদি শান্তি হয়ে থাকে তবে ওর-ও হবে। কিন্তু ক্ষ্যান্ত এখনো আসছে না কেন? রাত তো গভীরই হলো। এই বেলা বেরিয়ে পড়লে নিশ্চিন্তে ফেরা যেতো। আনন্দর ঘুম ভাঙবে আজ সেই ভোর রাত্রে। ভাবনায় বড় অস্বস্তি বোধ করে দুর্গা।

ক্ষ্যান্ত নির্দিষ্ট সময়েই খড়ের গাদার পাশে এসে হাজির হয়েছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষাও করেছে। কিন্তু দুর্গার কোন সাড়া শব্দ পায় নি। আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তাই পূব দিকের জানালায় এসে দাঁড়ায়। চাপা গলায় ডাকে, বউ, ওঠ, সময় অইচে। অ বউ...

হঠাৎ জানালায় শব্দ হতে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে দুর্গার। সহসা চোখ মেলে তাকাতে পারে না।

ক্ষ্যান্ত পুনরায় তাড়া দেয়, কইল, উইঠ্যা আয়! নাও যে অনেকক্ষণ ধইরা ভিড়া রইচে।

এবার আর দুর্গার কোনরকম সংশয় থাকে না। চোখ মেলে তাকিয়ে ফিসফিস করে বাধা দেয়, চুপ, আস্তে কতা কও, আনন্দ জাইগা যাইব!

আইচ্ছা, তুই তড়াতড়ি আয়। আর দেরি করিচ না।

দুর্গা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ঘরে তালাচাবি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

আনন্দ এতক্ষণ সত্যি সত্যি ঘুমিয়েই ছিল, কিন্তু খানিক আগে জেগেছে। বড় অস্বস্তি বোধ করছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তে শুরু হয়েছে। গায়ে

মাথায় অসম্ভব জ্বালা। কিছুতেই বিছানায় থাকা যাচ্ছে না। গা থেকে কাঁথা কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। হিমেল হাওয়ায় বেশ লাগে। বেশ সুস্থই বোধ করছে এখন ও। কিন্তু দু'চোখে বিন্দুমাত্র ঘুম নেই। পর পর তিন ছিলুম তামাক টেনে চুপচাপ খানিক বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু না, ঘুম আর আসছেই না। বায়ু চড়ে গিয়েছে। গরমই বোধ হয়। উঠে গিয়ে আবার জানালায় দাঁড়ায়। ওকি, ঘরে তালা-চাবি দিয়ে এত রাত্রে দিদি যাচ্ছে কোথায়! হ্যাঁ! হ্যাঁ, দিদিই তো! তবে না একা একা বাড়ির ভেতরে থাকতেও রাত্রে ওর ভয় করে। আর এখন? এখন যে দিব্যি একা একা বাড়ির বার হয়ে চলেছেন! তবে কি···না না, এ কি ভাবছি আমি! দিদিকে অবিশ্বাস! জীবনে যাকে এতটুকু নিষ্ঠা হারাতে দেখিনি তার সম্বন্ধে পাপ চিন্তা করছি! ওকি, সঙ্গে ওটা আবার কে জুটল। ক্ষেন্তি ছিনালটা না! হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো ক্ষেন্তিই। ঐ তো সেই বাঁকা বাঁকা করে পা ফেলে চলেছে। তবে কি দিদি পাঁকেই ডুবছে!···আনন্দ আর স্থির থাকতে পারে না। মাথার রক্ত ঝংকার দিয়ে ওঠে। চুপি চুপি নিজেও খিল খুলে বেরিয়ে পড়ে। বিপদের সঙ্গী লাঠিগাছা হাতে নিতে ভুল করে না। ভাবে, দিদি যদি সত্যি সত্যি পাপের পথেই পা বাড়িয়ে থাকে, তাহলে সকলের আগে ওর মাথাটাই চৌচির করে দেবে। বংশের কলঙ্ককে আর জীবিত রাখবে না। দূরত্ব বজায় রেখে পেছু পেছুই চলতে থাকে আনন্দ।

এক হাঁটু কাদা জল ভেঙে প্রায় খালের মুখে এসে পড়ে দুর্গা ক্ষ্যান্ত। বাঁক ঘুরেই নৌকোয় গিয়ে উঠবে। না, ভাগ্য আজ সবদিক দিয়েই সুপ্রসন্ন। এতটা পথ এল কোন চেনাশুনো লোকের মুখোমুখি হতে হয়নি। মা হয়তো সত্যি আজ মুখ তুলে চাইছেন। এখন ভালয় ভালয় পূজো দিয়ে ফিরতে পারলেই নিশ্চিন্ত।···দুর্গা বুকের বল নিয়েই পায়ের পর পা ফেলে এগুতে থাকে। ক্ষ্যান্তও এগোয়। তবে পাশাপাশি নয়—পেছু পেছু। বুড়ো মানুষ হয়তো তাল রাখতে পারছে না।····দুর্গার মনে কোন সংশয় নেই। আর কতটুকুই বা পথ। ঐ তো নৌকোর মাস্তল দেখা যাচ্ছে। যাক, সব ব্যবস্থাই তাহলে করে রেখেছে ক্ষ্যান্তদি। পড়শীর ওপর সত্যি সত্যি তাহলে দরদ আছে বেচারার।···তরতর করে খালের মুখে এসে বাঁক ঘোরে দুর্গা। কিন্তু একি! ঘাসী নৌকো কোথায়! এযে দেখছি গ্রীনবোট। তবে কি সবই বজ্জাতি! ছিনালটা গেলো কোথায়?···পেছন ফিরে চাইতেই শিউরে ওঠে

দুর্গা। ওকি, কাদের সঙ্গে কথা বলছে ও! ওরা তো সকলেই পুরুষ মানুষ! হাতে লাঠি, বল্লম, গ্যাট্টা-গোঁট্টা চেহারা! কুমার বাহাদুরেরই চাঁই হবে··· সারাদিন উপোস গিয়েছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে চায় দুর্গা। মানুষ এমনও হতে পারে! ঠাকুর দেবতার নামেও বজ্জাতি!···নিশ্চিত বিপদ বুঝে দুর্বল শরীরেও প্রাণপণে ছুটতে যায়। ভরসা, কোনরকমে যদি চরার খাদে পড়ে চেঁচাতে পারে। চরের মানুষ যদি জড় হয়ে রক্ষা করে।···দ্রুতই ছুটতে যায় দুর্গা। কিন্তু বেশীদুর এগুতে পারে না। পেছনের খাদে জনকয়েক দুর্বৃত্ত লুকিয়েছিল, তেড়ে এসে দু'দিক থেকে দু'জন হাত চেপে ধরে। আ-ন-ন্দ—শুধু একবারটি চেঁচাবার অবকাশ পায় ও। দুর্বৃত্তরা জোর করে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। অগত্যা শুধু হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়িই সার হয়।···

আনন্দ দূরে ছিল, চীৎকার শুনে লাফাতে লাফাতে এসে হুঙ্কার ছাড়ে। ক্ষ্যান্ত বেগতিক দেখে পালাতেই যাচ্ছিল, কিন্তু পারে না। আনন্দর শক্ত হাতের লাঠি সর্বপ্রথম ওর মাথার ওপরেই পড়ে। ফাঁপা পেঁপের ডালের মতো এক লহমায় মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ক্ষ্যান্ত। মাথা ফেটে চৌচির। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। বাকশক্তি রহিত। কাটা পাঁঠার মতো শুধুই দাপাতে থাকে। ক্ষ্যান্তকে ছেড়ে দ্বিতীয় লাঠি উঁচিয়ে ধরে আনন্দ আর একজন দুর্বৃত্তকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। তীরবেগে একটা বল্লম এসে ওর তলপেট ভেদ করে। একবারে এপিঠ ওপিঠ। অন্য কেউ হলে হয়তো এতেই কাবু হয়ে পড়তো, কিন্তু আনন্দ দমে না। ওর আপন দিদির ইজ্জৎ নষ্ট করছে শয়তানরা। জীবিত থাকতে কখনো ও এ অপমান সহ্য করবে না। বাঁ-হাত দিয়ে তল পেট চেপে ধরে ডান হাতে আবার লাঠি চালাতে উদ্যত হয়। আর্তস্বরে চেঁচাতে থাকে, বয় নাই দিদি, বয় নাই, আমি আইলাম, বয় নাই···

নিষ্ফল চেষ্টা, আবার আর একটা বল্লম এসে পাঁজরা ভেদ করে আনন্দর। চরস্ফুটনগরের সেরা লাঠিয়াল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। কাতরাতে কাতরাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ। দুর্গা পেছন ফিরে দেখবারও সুযোগ পায় না।

কালরাত্রির শেষ প্রহর। দুর্গা ছাড়া পেয়েছে। দেহ ওর ক্ষতবিক্ষত। দেবার্চনার পুষ্পে কুকুরে মুখ দিয়েছে। এ পুষ্প দিয়ে আর দেব-পূজো হবে না। সারা গা ঘিনঘিন করতে থাকে। শয়তানগুলো যদি গলা টিপে মেরেও ফেলতো ওকে। আরো কি চায় ওরা?···গ্রীনবোট থেকে কখন যে নেমে

এসেছে জানতেও পারেনি। জ্ঞান ফিরলে দেখে, বংশীর চরে একা পড়ে আছে। চারদিকে খাঁ খাঁ করছে অমাবস্যার ভয়াবহ অন্ধকার। তমিস্রা রাক্ষুসী যেন গিলে খেতে আসছে ওকে। বেশ তাই খাক। বেঁচে থেকে আর লাভ কি? দেহ ওর অপবিত্র হয়ে গেছে। আর কারো কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। ময়না নিশির কাছে তো নয়ই। একমাত্র মৃত্যুই ওকে শান্তি দিতে পারে। কিন্তু কেমন করে পাবে ও সে শান্তির কোল?····টলতে টলতে খালের মুখে এসে দাঁড়ায় দুর্গা। ওকি, মাঝ গাঙে ও বিশ্বাস-বউ নয়! হ্যাঁ হ্যাঁ, ও তো বিশ্বাস বউই। দাঁড়াও—দাঁড়াও বিশ্বাস-বউ, যেয়ো না তুমি, আমি আসছি। লোকে তোমাকে কলঙ্কিনী বলে বলুক, আমি জানি, কেন তুমি ডুব দিয়েছিলে। তুমি দাঁড়াও—দাঁড়াও···টলতে টলতে সহসা পথ খুঁজে পায় দুর্গা। খালের মুখে দিন দুই আগে নন্দ মণ্ডলকে পোড়ানো হয়েছে। নন্দর শিয়রের মাটির কলসীটা আজো অখণ্ড আছে। দুর্গা ছুটে গিয়ে কলসীটা হাতে নেয়। জল ফেলে দিয়ে নিজের আঁচল ছিঁড়ে গলার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে নামে খালের মাঝে। বিশ্বাস-বউ ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

॥ ৩৪ ॥

চরফুটনগর দিন দিন শ্মশান হয়ে উঠছে। একদিন চরের সমৃদ্ধি দেখে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছিল চরে ঘর বাঁধতে। আজ আবার ভয়ে অনেকেই পালাতে শুরু করেছে। মানইজ্জৎ রেখে চরে বাস করা এখন আর সম্ভবপর নয়। মোড়লরা একে একে সকলেই তলিয়ে গেলো। এবার চুনো-পুঁটিদের পালা। চরের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি জমি-জায়গাই রমেন্দ্রনারায়ণ আর নিতাইয়ের দল কেড়ে নিয়েছে। মধুর ভিটে মাটিতেও ঘুঘু চরছে। ধনেপ্রাণে মারলে শয়তানরা। এখন আবার নতুন বিলি ব্যবস্থার তোড়জোড় চলেছে। ভিন গাঁয়ের লোকই আনাগোনা করছে এখন। চরের মানুষ ভয়ে ভাবনায় শুকিয়ে কাঠ। অশ্বিনী নিশি কোনরকমে নতুন ভিটিটুকু আগলে আছে। চাষ আবাদ নেই, করবে কি? খাবে, পরবেই বা কি? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোন কিছুতেই আর থৈ পাওয়া যায় না। নিশি তো ঠায় বসে আছে। পেটে ভাতে সামান্য একটা রাখালের কাজও জুটছে না চরে। আর রাখবেই বা কে? সকলের অবস্থাই তো সমান। হালে কেউ পানি পাচ্ছে না। অশ্বিনী গঞ্জের

মহাজন হরিনাথ সাহার ইটের ভাঁটায় কাজ নিয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙা খাটুনীর বিনিময়ে দৈনিক আট আনা মজুরী। নিশিও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হরিনাথ রাজী হয়নি। এত কম বয়সী ছোকরা খাটতে পারবে না।

মাত্র আট আনা পয়সা রোজগার। এ দিয়ে আর ছ'টা প্রাণীর পেট চলে কি করে? দৈনিক তিন চার সের চাল কিনতেই তো চার পাঁচ আনা ফুরিয়ে যায়। নিজেদের জন্য কোনরকমে দুটি চাল ফুটিয়ে নিলেও কচি বাচ্চা দুটোর জন্যে ছিটে ফোঁটা দুধ না হলে নয়। একটা দুধেল গরুও যদি এ সময়ে সংসারে থাকতো। দ্বিতীয় ছেলে হবার পর পার্বতীর স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ···চিন্তায় চিন্তায় দু'চোখে সর্ষে ফুল দেখে অশ্বিনী। একবার ভাবে, সব বেচে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যায়। এখানে এখন মানুষকে মুখ দেখাতেও লজ্জা করে। আবার ভাবে, যাবেই বা কোথায়? পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কোথাও ঠাঁই নেই। তাছাড়া, মা বাবার স্মৃতি বিজড়িত এই চর। এখনও খালটা বাবার স্মৃতি বহন করছে। অন্যপর যে পালায় পালাক, বৈরাগী আর ফকির বংশের কেউ এ চর ছেড়ে যেতে পারে না। পারা উচিত নয়। যাদের উত্তর পুরুষ খালি হাতে সংগ্রাম করে চর গড়ে তুলেছে, তাদের বংশধররা ভয় পেয়ে চর ছেড়ে যাবে! লোকে তা হলে ভাববে কি? গায়ে মুখে থুথু দেবে না! বাবা ছিলেন একা। তবু তো আমার পেছনে নিশি রয়েছে। তবে কেন পালাবো? কেন শয়তানদের ভয় করবো?···উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে অশ্বিনী। পিতৃ-তর্পণ এখনো বাকী। রামকান্ত হয়তো ভয় পেয়েই চর আর গঞ্জ ছেড়ে পালিয়েছে। শেষ পর্যন্ত রমেন্দ্রনারায়ণের ওপরও বিশ্বাস রাখতে পারেনি লম্পট। কোথায় গিয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু রমেন্দ্রনারায়ণ? সে শয়তান তো বহাল তবিয়তেই চর আর কাছারি করছে। চরের বউ-ঝিরা হয়েছে এখন ওর লালসার টোপ। একবার যদি গুছিয়ে উঠতে পারি—নিশিটা যদি একটু কাজেকর্মে লাগতে পারে তাহলে একবার দেখে নেবো কত বড় বীর শয়তান। ···অনাহার অনিদ্রায়ও অশ্বিনীর বুকের রক্ত টগবগিয়ে ওঠে। ইদানীং প্রায় প্রতিরাত্রেই বাবাকে স্বপ্ন দেখছে। চরের জন্য দিনরাত ভাবছে মোড়ল, স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাচ্ছে না। না না, চর ছেড়ে কোথাও যাবে না ওরা। না—না—না।

অশ্বিনী দীনুর মতোই সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। যা পাচ্ছে, দাঁতে দাঁত চেপে তা দিয়েই কোনরকমে কাটিয়ে দিচ্ছে। ধার দেনার ধারে কাছেও আর যাচ্ছে না। অবশ্য বেশী কিছু পাবার মতো ভরসাও নেই। সুদখোররা ওর মুখের

দিকে চেয়ে একটা কানাকড়িও হাতছাড়া করবে না। সম্বল তো শুধু মাত্র ভিটেটুকু। এর বিনিময়ে কতই বা আর পাবে? না না, ও পাপ চিন্তা মনের কোণে ঠাঁই দেবে না ও। হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও বাবা একমাত্র এই ভুল করেই নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছেন। রাতারাতি বড় লোক হয়ে কাজ নেই ওর। নুন ভাত যা জোটে তাই খাবে। না জোটে না খেয়ে মরবে, তবু আর সুদখোরের দোর গোড়ায় যাবে না।...

চিত্তের যত দৃঢ়তাই থাক—ঋণ করা বোধ হয় ওদের ভাগ্যের লিখন। এতদিন যাহোক করে চলেছিল কিন্তু কাল হলো রোগ বালাই। পার্বতী সুতিকায় কাবু হয়ে পড়েছে। নগদ পয়সা ভিন্ন ভোম্বা কবরেজের ধারে কাছেও যাবার উপায় নেই। মাসখানেক হলো ভাঁটার কাজও বন্ধ হয়ে আছে। জল কাদা না শুকোলে নতুন ইট আর পোড়াবে না হরিনাথ। হাতে একটা পয়সা পর্যন্ত নেই। অশ্বিনী বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে। সারা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। ভোরে উঠে কাউকে কিছু না বলে গঞ্জের রসিক ঘোষের কাছে গিয়েই হাজির হয়। বড় ভয় ছিল প্রাণে, কে জানে, সময় বুঝে রসিকও বেঁকে বসবে কিনা? কিন্তু না, বেশী গরজ না দেখালেও একরকম বিনা তোষামোদেই রসিক রাজী হয়ে যায়। লোক ইদানীং আর কর্জ করতে আসছে না। সুদের হারটা তাই একটু কম। টাকা প্রতি মাসিক মাত্র এক আনা। দুঃখের মধ্যেও অশ্বিনী মনে মনে কিছুটা সান্ত্বনাই পায়। কোনরকম জামিনদার কিংবা বাড়ি ঘর-দোর রেহানের কথাও মুখে আনে না রসিক। শুধুমাত্র তমসুক কাগজে সই করিয়ে নিয়েই নগদ পঁচিশটে টাকা দিয়ে দেয়। টাকা হাতে নিয়ে সকাল সকালই বাড়ি ফিরে আসে অশ্বিনী। নিশিকে বলা তো দূরের কথা—পার্বতীকে পর্যন্ত কোন কিছু বলে না। থাক না থাক ঋণকে ওরা সকলেই বড় ভয় করে। অশ্বিনীর নিজেরও বুকের ভেতর কাঁপতে থাকে। কিন্তু উপায় কি?....

অত্যন্ত হিসেব করেই টাকা খরচ করে অশ্বিনী। যেটুকু না হলে নয় কেবলমাত্র সেটুকুই কেনা-কাটা করে। কিন্তু তাতেই বা পার-কূল কোথায়? মোটে তো পঁচিশটে টাকা। ওষুধ পথ্যে ক'দিনেই ফতুর হয়ে যায়। ভাঁটার কাজ কবে শুরু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তাছাড়া সামান্য ঐ আয়ে খাবে পরবে, না ঋণ শোধ করবে?...কোন দিকেই পথ নেই। এক হতে পারে যদি মামার কথায় রাজী হয়। নিশিকে অনেক দিন থেকেই তার

কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য তাগিদ দিচ্ছে হরিহর মামা। সোনাকান্দা চরের সেও ছিল একদিন শক্তিশালী লাঠিয়াল। আনন্দর চেয়ে নাম-ডাক কম ছিল না। চাষ-আবাদও ছিল কিছু। কিন্তু কি হলো? অর্ধেক গিললো রাক্ষুসী পদ্মা বাকী অর্ধেক সুদখোররা। তারপরের দিন কতক তো উঞ্ছবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। আজো সে কথা মনে পড়লে গা ঘিনঘিন করে হরিহরের। হারু চৌধুরীর বেটা চন্দ্র চৌধুরী কাজে নিয়েছিল ওকে। আপ খোরাকী ত্রিশ টাকা মাইনেতে সর্দারীর কাজ। দিনকতক যেতে না যেতেই বেটা বলে কি রোজ রাত্রে একজন করে পরের ঝি-বউ ধরে এনে দিতে হবে ওকে! শালায় বলে প্রজাপালক—জমিদার! লাথি মারো শালার মুখে! সর্দারী করি বলে কি রে সামান্য ক'টা টাকার জন্য ইহকাল পরকাল খোয়াবো! পরস্ত্রী মায়ের জাত নয়রে শালা? মরবি শালা চৌত্রিশ কোটি নরকে পচে···রাগের মাথায় ঝাঁ করে একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে বসে হরিহর। খাবে কি, পরবে কি কিছুই ভাবে না। দিন গেলে অন্ততঃ পাঁচ সের চাল চাই সংসারে। কম করেও সব মিলিয়ে দশ বারো গণ্ডা পয়সার দরকার। হরিহর ফ্যাসাদেই পড়ে।

না ভেবে-চিন্তে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল হরিহর—না ভেবে-চিন্তেই আবার চাকরি পায়। সেন বাড়ির বড়বাবু রাখাল সেন ফি বছর পূজোয় বাড়ি আসেন। সারা বছর একরকম বন্ধই থাকে সেন বাড়ি। একমাত্র পূজোর সময়েই যা সরগরম হয়ে ওঠে। মস্ত বড় পরিবার। ভাইদের মধ্যে অনেকেই বড় বড় সরকারী চাকরে। জজ, ব্যারিষ্টার, ডাক্তারও কেউ কেউ। তবে সকলের চেয়ে রাখাল সেনের অবস্থাই ভাল। কোন চাকরি করে না রাখাল। গোটা দুই কোলিয়ারী আর চা-বাগানের মালিক। মস্ত বড় আপিস কোলকাতায়। গ্রামের অনেকেই তার আপিসে কাজ করে। খুব নাম-ডাক। ফি বছর এই একটি মাত্র উপলক্ষেই সেন বাড়ির সকলের সঙ্গে সকলের দেখা সাক্ষাৎ হয়। যে যেখানেই থাক, পূজোর সময় সকলেই বাড়ি আসবে। খুব ঘটা করে পূজো হয়, নিজেদের পরিবারের মধ্যে থিয়েটার গান বাজনা চলে।

গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিহরের কথা কানে যায় রাখালের। শুনে বড় কষ্ট পায় অন্তরে। জোয়ান মানুষ—আপদে বিপদে গ্রামের রক্ষক—দুটি ভাত পাচ্ছে না! পরদিন সকালেই হরিহরকে ডেকে পাঠাবে ভাবে, কিন্তু তার আর দরকার হয় না। হরিহর রাত্রেই ছুটে আসে বড়বাবুর চরণধুলি নিতে। এসেই আটকে পড়ে। পূজোর খাটাখাটুনী দেখাশুনো সবই ওকে করতে হবে।····

পূজো মিটে যায় কিন্তু হরিহর আজো ছাড়া পায়নি। কোলকাতার সদর আপিসের দরোয়ান সে। মাস মাইনে ষাট টাকা। বিনা ভাড়ায় থাকারও সুবন্দোবস্ত আছে। ইচ্ছে করলে স্ত্রীপুত্র নিয়েও থাকতে পারে। কিন্তু হরিহর তা থাকে না। একাই থাকে। ইচ্ছে হলে তিন চার বছর পর স্ত্রী সারদা এক-আধ মাসের জন্য বেড়িয়ে যায়। জীবনযুদ্ধে ধুঁকছিল হরিহর আবার প্রাণপ্রাচুর্য ফিরে পায়।

হরিহরের আপন মায়ের পেটের বোন কুসুম। সৌভাগ্য নিয়েই বৈরাগী বাড়ির বউ হয়ে সংসারে ঢুকেছিল। কিন্তু বরাত মন্দ তাই কপালে বেশীদিন সুখ সইলো না। যা হোক, একদিক দিয়ে ভাগ্যবতীই বলতে হবে কুসুমকে। বেশীদিন আর বৈধব্য ভোগ করলে না। কিন্তু পেটের দুটোর আজ একি হাল! করে-কম্মে দুটি ভাতও যে আজ খেতে পাচ্ছে না! নিশি, অশ্বিনীর কথা জানতে পেরে মনে বড় দাগা পায় হরিহর। বড় ভাগ্নে অশ্বিনীকে অনেকদিন থেকেই তাড়া দিচ্ছে নিশিকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু অশ্বিনী মামার কথায় এতদিন কোন গা করেনি। ঐ তো একরত্তি নিশা, কখনো বাড়ির বাইরে যায়নি, ওকি কখনো একা একা বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকতে পারবে? এতদিন তো নেহাত-ই ছেলে ছোকরা ছিল, দৌড়ঝাঁপ করেই কেটেছে। এই তো সবে মাত্র বয়সে পা দিয়েছে। মনের সুখে ঘর-সংসার করবার কথা। তা যদি এই বয়সেই বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকতে হয় তাহলে আর সুখ পাবে কবে? লোকেই বা বলবে কি? মা-বাবা নেই, ছোট ভাইটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বৈরাগীর বড় বেটা! না না, যা জোটে তাই খাবে, তবু ওকে বিদেশে পাঠানো চলবে না। মনের পোড়ানীতে ও তো মরবেই ময়নাও প্রাণে বাঁচবে না। কাজ নেই ওসব ঝামেলায় গিয়ে, অশ্বিনী সাত-পাঁচ ভেবে এ যাবৎ উড়িয়ে দিয়েই এসেছে মামার প্রস্তাব। কিন্তু আজ? আজ তো আর শুধু ভাবরাজ্যে বিরাজ করলে চলছে না! কর্জের টাকা একটি একটি করে সবই উজাড় হয়ে গেলো। ভাঁটার কাজ কবে চালু হবে তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এখানে থাকলে যে উপোস দিয়েই মরবে ও! বিদেশে গিয়ে তবু যদি প্রাণে বাঁচতে পারে। ময়নাকে নিয়ে গিয়ে যদি একটু সুখের মুখ দেখতে পারে···মনের সঙ্গে অনেক টানা-পোড়নের পর মামাকে চিঠি দিতেই মনস্থির করে অশ্বিনী।

শীতের সকাল। দাওয়ার ওপর বসে রোদে পিঠ দিয়ে হুঁকো টানছিল অশ্বিনী। নিশিও পাশে বসেই রোদ পোয়াচ্ছে। সহসা নাম ধরে ডাকতে

ডাকতে এসে অশ্বিনীর হাতে একটা চিঠি দিয়ে যায় ডাকপিয়ন। সপ্তাহে মাত্র দুদিন ডাক বিলি হয় চরে। নয়তো আরো দিন দুই আগেই চিঠিখানা পেতো অশ্বিনী। আনুসঙ্গিক সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে হরিহরই উত্তর দিয়েছে। তার আপিসেই বেয়ারার কাজ করবে নিশি। মাস মাইনে ত্রিশ টাকা। বিনা খরচায় থাকার জায়গাও পাবে। খেতে পরতে আর ক'টাকা লাগবে, বড় জোর আট-দশ টাকা। নিঃসন্দেহে প্রতি মাসে বিশ বাইশ টাকা বাড়ি পাঠাতে পারবে।···থিতিয়ে থিতিয়ে চিঠিখানা পড়ে অশ্বিনী ভাবতে পারে না, হাসবে কি কাঁদবে। পরের গোলামী করতে যাবে নিশা! তাও আবার বিদেশ বিভুঁইয়ে! বড় ভাই হয়ে একটা ছোট ভাই আর তার একরত্তি একটা বউকে দু'দিনও বসিয়ে খাওয়াতে পারলো না ও!····বেশ স্বাভাবিকভাবে বসেই হুঁকো টানছিল অশ্বিনী, সহসা দু'চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। বুকের ভেতরে বসে কে যেন পাথর ভাঙতে থাকে।···

দাদার ভাবান্তর নিশিও লক্ষ্য করে। উতলা হয়েই শুধোয়, কার চিঠি আইল দাদা? মামায় দিচে না?

অশ্বিনী মুখে কোন জবাব দিতে পারে না। ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানায়।

নিশি হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা টেনে নিতে নিতে পুনরায় জিজ্ঞেস করে, কি লেকচে হ্যায়?

অশ্বিনী এবারও কোন জবাব দিতে পারে না। চিঠিখানা নিশির হাতে দিয়ে হুঁকোটা মাটিতে নামিয়ে রাখে।

চিঠি পড়তে পড়তে নিশির বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তবে কি সত্যি সত্যিই ওকে বিদেশে যেতে হবে! মইনী বাঁচবে কি করে তাহলে!···হাসি হাসি মুখ এক নিমেষে ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

অশ্বিনী আর সহ্য করতে পারে না। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে যায়।

নিশি পরমুহূর্তেই নিজকে সামলে নেয়। ক'দিন ধরে ও দেখে আসছে, দাদা বারমুখো হতে পারছে না। রসিক না করলেও গঞ্জের দোকানীরা তাগাদার পর তাগাদা শুরু করেছে। হয়তো সামান্যই পাবে ওরা কিন্তু ঐ সামান্যই বা আসবে কোত্থেকে? রুজি-রোজগার যে কিছুই নেই। যত ছেলেমানুষই হোক—এটুকু বুঝে ওঠবার বয়স এখন ওর হয়েছে। অশ্বিনী উঠে দাঁড়াতেই নিশি গম্ভীরভাবে বলে, আমি কাইলই কলকাত্তায় যামু দাদা।

পালাতে গিয়েও পালাতে পারে না অশ্বিনী। শান্তভাবেই উত্তর দেয়, কাইল যাবি কি রে! দিন খ্যান স্থাহন লাগব না?

দিন খ্যানের আবার কি আচে, জাহাজ ত গঞ্জের থনে রোজই ছাড়ে। আমি কাইলই যামু।

অত উতালা অইচ না। আমি ত গঞ্জেই যাইবার নৈচি, একবার যামুনে কুঞ্জ গণকের কাচে। নতুন কামে যাবি, দিন খ্যান না দেখ্‌লে অয়!

তবে আইজই যাইয়, মামায় ত লেকচে, দেরি করন যাইব না। হ্যাষে (শেষে) না আবার কাম খান চইলা যায়।

যাইব না রে যাইব না। তুই এহন খা গা, আমি আইজই যামুনে কুঞ্জর কাচে, ধরা গলায় জবাব দিতে দিতে অশ্বিনী বেরিয়ে যায়। নিশি পাথরের মতোই চুপচাপ বসে থাকে।

॥ ৩৫ ॥

"মঙ্গলের ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।"

খনার বচনকেই সার করে কুঞ্জ গণক। কেন না, খুঁটিয়ে দিন দেখতে গেলে আট-দশ দিনের আগে কোন ভাল দিন নেই। কিন্তু অতো দেরি সইবে না অশ্বিনীর। একে মামার তাড়া রয়েছে দ্বিতীয়তঃ ভাল সঙ্গী না পেলে কার সঙ্গে পাঠাবে নিশিকে। একা একা ও কোলকাতা যেতে পারবে না। আসছে বুধবারেই গঞ্জের পচু পোদ্দার মাল গস্ত করতে কোলকাতা যাচ্ছে। এই সবচেয়ে ভাল সঙ্গী। সবদিক ভেবে-চিন্তে বুধবার ভোরেই যাত্রার দিন ধার্য হয়।

নিশি ওকে ছেড়ে কোলকাতা যাচ্ছে শুনে ময়না আর ময়নার মধ্যে নেই। তিনদিন ভাল করে খায়নি, ঘুমোয়নি। রাত্রে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলেনি নিশির সঙ্গে। বলে কি এরা! দুটো ভাতের জন্য মানুষ বিদেশ বিভুঁইয়ে যাবে! সেখানে যদি কোন অসুখ-বিসুখ করে! কে দেখবে তখন!...

এ ক'দিন দম ধরেই ছিল ময়না। আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথম করছিল কচি মুখখানা। প্রকাশ্যে তো দূরের কথা নিভৃত ঘরেও কান্নাকাটি করেনি। নিশি কিছু বলতে গেলে মুখ ঝামটা দিয়ে দূরে সরে গিয়েছে। অভিমানে ফুলে উঠেছে পাপড়ি পাপড়ি ঠোঁট দুটি। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

অবিশ্রান্ত ধারায় জল ঝরতে থাকে ময়নার দু'চোখ দিয়ে। সারা রাতই প্রায় ফোঁপাতে থাকে। নিশির নিজের বুকখানাও বেদনায় টনটন করে ওঠে। সান্ত্বনা দেবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পায় না। ওরই কি ভাল লাগছে বিদেশে যেতে? বলতে গেলে তো এ নির্বাসনই। মেঘদূতের যক্ষের মতোই গোটা বছর বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কিন্তু উপায় কি? যেতে যে ওকে হবেই। ময়নাকে দাদা বৌদিকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই যেতে হবে।···রাত ভোর হয়ে আসে, ধরা গলায় প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে নিশি, পাগলি কোন হানকার, কান্দ ক্যান? আমি তো রোজগার করবার লেইগাই যাইবার নৈচি। দেখবা, তোমাগ লেইগা কত সোন্দর সোন্দর জামা কাপড় পাঠামু। কাইন্দ না, নিজের কোঁচার খুঁট দিয়ে ময়নার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যায় নিশি।

ময়না এতক্ষণ আপন মনেই ফোঁপাচ্ছিল। ইন্ধন পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, চাই না আমি তোমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড়। তুমি ইহান থনে যাও যদি আমি গাঙের মদ্দেই ডুইবা মরুম।

পাগলি কোন হানকার, ওকতা মুকে আনতে নাই! আত্মহত্যা মহাপাতক, জিভ কেটে ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে নিশি।

হউক মহাপাতক, তুমি একলা একলা গেলে আমি ডুইবাই মরুম।

তবে আর কি করুম, তুমি যহন বারণ কর তহন না-ই গেলাম। এইহানে থাইকাই হগলে মিলা না খাইয়া মরি, পাল্টা অভিমানের সঙ্গেই জবাব দেয় নিশি।

ময়না দমে না। সমতা রেখেই পুনরায় যুক্তি দেখায়, মরবা ক্যান? যেমুন খাইবার নৈচ তেমুনই খাও পর না। কি কাম আমাগ সোন্দর সোন্দর জামা-কাপড় পইরা?

গলার স্বর খাদে নামিয়ে নিশি বলে, যা খাই পরি, তা যদি জুটত তবে কি আর ইহান থনে তোমাগ ছাইড়া যাইবার চাইতাম? দাদার মুকের দিকে চাইয়া ত্যাহ না, দিন দিন মুকখান কেমুন শুকাইয়া যাইবার নৈচে! চেলা মাছের মতন রাইত দিনই ত পাওনাদাররা মানুষটারে ঠোকরাইবার নৈচে, বালো থাকব কেমুন কইরা?

নিশির কথার জবাব দেবার মতো কোন যুক্তি ময়না খুঁজে পায় না। আবার নিজের মনকেও প্রবোধ দিতে পারে না। ঝরঝর করে শুধু জলই গড়াতে থাকে দু'চোখ দিয়ে।

নিশির চোখেও শ্রাবণের ধারা নামে। খানিকক্ষণ চুপ করেই অপেক্ষা করে। অবশেষে ধরা গলায় নৈর্ব্যক্তিকভাবেই আরম্ভ করে নিশি, একটা বছর দেকতে দেকতে কাইটা যাইব। হ্যার পরেই ত একমাস ছুটি পামু, তুমি অমুন কইর না। হ্যাহ নাই বছর শ্যাষে মামায় কত জিনিষপত্তর লইয়া বাড়ি আহে ?

আপন মনেই কাঁদছিল ময়না, নিশির কথায় ঝাঁজিয়ে ওঠে, তুমি বারে বারে আমারে জিনিষপত্তরের নোব (লোভ) হ্যাহাইও না। আমি চাই না তোমার জিনিষ।

আইচ্ছা আইচ্ছা, কোন জিনিষপত্তর না নিলা, পূজার পর মামার লগে কলকাত্তায় যাইয়, অনেক তামসা দেইখা আইবার পারবা। তোমার মোনে নাই, হ্যাবার মামা ঘুইরা আইহা কত গল্প কল্ল ? আজব শহর কলকাত্তা। বুতাম টিপলে বাতি জ্বলে, মাথার উপুর বন্‌বন্ কইরা পাখা ঘোরে, টেলিফুনে দুরের মানুষ কানে কানে কতা কয়—তাজ্জব ব্যাপার, একটু হাল্কাভাবেই শেষ করে নিশি।

কাঁদছিল ময়না। নিশির হাল্কা কথায় অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়। ঝাঁ করে উত্তর করে, পূজার ত এহনো অনেক দেরি।

দুর বোকা কোন হানকার! তুমি একেবারেই কিচু বুঝবার পার না। আগে আমি গিয়া বাসা ঠিক কল্লে ত যাইবা।

ময়না বুঝেও যেন বোঝে না। কথায় কথায় ভোর হয়ে আসে। কান্নার বেগ বেড়েই যায় ওর।

নিশি কোঁচার খুঁট দিয়ে ওর দু'চোখ মুছিয়ে দিয়ে ঝাঁপের কাটি খুলে বেরুতে যায়।

ময়না তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে প্রণাম করে। একটু পরেই তো যাত্রা করবে নিশি। দশজনের সামনে আর সুযোগ পাবে না।

বেদনায় মোচড় দিয়ে ওঠে নিশির বুকের ভেতরটা। জলভরা চোখেই দু'হাত দিয়ে ময়নাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। আস্তে আস্তে মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

কাক ডাকার আগেই বাড়ি ছেড়ে ডিঙ্গিতে গিয়ে ওঠে নিশি।

প্রায় এক বছর রাখালের অধীনে কাজ করে চলেছে নিশি। ও ছাড়া

আরো কয়েকজন আরদালি, চাপরাশি আপিসে কাজ করে। কিন্তু বয়সে ও-ই সকলের ছোট। রাখাল খুবই স্নেহ করে ওকে! খাসা গোল গাল ছেলেটি, ভারি সুন্দর টানা টানা চোখ জোড়া।...রাখালের নির্দেশ, কোন শক্ত কাজে কিংবা বাইরের কোন ট্রাম-বাসের ঝামেলায় যেন ওকে কখনো পাঠানো না হয়। টেবিল পোঁছা, দোয়াতে কালি দেয়া, ফাই-ফরমাজ শোনাই শুধু নিশির কাজ। প্রথম দিনকতক বাড়ির জন্য মনটা ভীষণ পোড়াতো নিশির। কাজকর্ম তো দূরের কথা রহস্যময়ী কোলকাতার কোন কিছুই ভাল লাগতো না ওর। রোজ একখানা করে চিঠি দিয়েছে ময়নাকে। বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি। এক কথা লিখতে বসলে সহস্র কথা মনে আসে। সব কথা হয়তো গুছিয়ে লেখাই হয় না। তবু প্রতি পত্রের জবাব ময়নার নিকট থেকে না এলে বুকের ভেতরটা আছড়াতে থাকে ওর। অভিমানে জীবনে আর কখনো পত্র লিখবে না বলেও প্রতিজ্ঞা করে ফেলে! কিন্তু দম রাখতে পারে না। শহরে থেকে ওর পক্ষে রোজ পত্র লেখা সম্ভবপর হলেও ময়নার পক্ষে তা সম্ভবপর না-ও হতে পারে। পাড়াগাঁয়ে রোজ ডাকপিয়ন আসে না। তাছাড়া রোজ রোজ অতো পয়সাই বা কোথায় পাবে বেচারী?

...রাগ হয়েছিল নিশির আবার গলে জল হয়ে যায়। আবার একটার পর একটা পত্র লিখে যায়।

...ইদানীং অবশ্য নিশি জোড়া পোষ্টকার্ডই লিখতে শুরু করেছে। খামে লিখলেও ভেতরে আর একখানা খাম দিয়ে দেয়। একবার তো পাঁচ টাকার একখানা নোটই খামের ভিতরে দিয়ে দেয়। রোজ সকলের খবরাখবর না পেলে বিদেশ বিভূঁইয়ে ও একা একা থাকে কি করে?...

হালে আর অতোটা উতলা হচ্ছে না। ময়নার জন্য, দাদা বৌদিদির জন্য মনটা সময় সময় পোড়ালেও অনেকটা ধাতস্থ হয়ে এসেছে। এখন শুধু চেষ্টা করছে, কি করে দুটো পয়সা বেশী উপায় করতে পারে। খেটে খেটে দাদার যে হাড়-মাস কালি হয়ে যাচ্ছে। দুটো পয়সা বেশী পাঠাতে পারলেই বেচারা একটু দম নিতে পারবে।...বড়বাবুকে খুশী করতে দৌড়ের আগে কাজ করে নিশি। আশা, বছর ঘুরলে যদি ভাল বেতন বৃদ্ধি হয়।...

হরিহরের আড্ডায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই খোল বাজিয়ে কীর্তন হয়। আপিসের ছাদের ওপরেই খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। বেশ আরামেই আছে ওরা

মামা ভাগনেতে। কীর্তনে অন্যান্য আপিসের চাপরাশি, আরদালিরাও অনেকে এসে যোগ দেয়। বিদেশে মনের আনন্দ উছলে পড়ে রসিকদের। নিশিও সকলের সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেয়। ট্রাম, রিক্সা, দোতলা বাসে চড়েও দেখে পর পর। গেলো রোববার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখে এসেছে দেশবিদেশের সমুদ্রের জাহাজ। কত সব কলকব্জা। যেন ভাসমান দুর্গই এক একটা। ধর্মতলার এক সিনেমা হাউসে একদিন ছবি দেখিয়েও এনেছে হরিহর। তাজ্জব ব্যাপার। ছবির মধ্যে মানুষ কথা কয়—হাসে, নাচে, গান গায়···শহর দেখে দেখে গাঁয়ের ছোট্ট মানুষটি হতবাকই হয়। মায়াবিনীর মায়ায় দেশের কথা অনেকটা ভুলেও যায়। সময় সময় ময়নার জন্য মনটা পোড়ালেও এখন আর প্রতিদিন ওর চিঠি না পেলে তেমন ভাবে না। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই দু'খানা রঙীন শাড়ী পাঠিয়ে দেয়, একখানা ময়নার আর একখানা পার্বতীর। অশ্বিনীর জন্যও মোটা ধুতি একজোড়া দিয়েছে। প্রতিমাসে নিয়মিত মনি-অর্ডারও করে আসছে। কিন্তু সংসার তবু অচল। ইটের ভাটা উঠে গিয়েছে। অশ্বিনীর কাজ নেই। ওর এই সামান্য টাকা ক'টাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তাতে কি আর চার পাঁচটা লোকের পেট ভরে? ছোট বাচ্চা দুটোর জন্য কিছুটা দুধও চাই আবার। বৌদির শরীরটাও নাকি তেমন ভাল যাচ্ছে না। দাদা এই সব সাত পাঁচ চিন্তা করেই মামাকে নিজের চাকরির জন্য লিখেছেন। বেচারার আর সুখ হলো না। তা মন্দ হয় না, মামা যদি ওকেও একটা চাকরি নিয়ে দিতে পারেন তাহলে সকলে মিলে বেশ একসঙ্গে থাকা যাবে। বৌদির সঙ্গে ময়নাও নিশ্চয় আসতে পারবে। কি হবে ছাই মিছিমিছি ভিটে আঁকড়ে থেকে? জমি-জমা সবই তো গিয়েছে, এখন শুধু ভিটেটুকু। তা পাড়া-প্রতিবেশীদের বললে তারা একটু লেপে-পুঁছে রাখবেই। দিনকতক এখানে এসে বাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকলে শরীর সকলেরই ভাল হবে। মামাকে একবার বলেই দেখা যাক। বড়বাবুকে নিজেও বললে পারি। এতবড় আপিস, আর একটা লোকের জায়গা হবেই। তার আগে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যাক। শেষ পর্যন্ত দাদা দেশ ছাড়তে রাজী হবেন কিনা সেটাও ভাল করে জানা দরকার···

আর এক মাস কাজ করলেই পুরো এক বছর কাজ হবে নিশির। তারপর নিয়ম-মাফিক এক মাস ছুটি পাবে। ছ'মাস আগে থেকেই দিন গুণতে থাকে

নিশি। মাস মাস নিয়মিত কুড়ি টাকা করে বাড়িতে পাঠিয়েও বকশিশ ইত্যাদিতে মিলিয়ে হাতে পঞ্চাশ টাকা জমেছে। বাড়ি যাবার সময় সকলের জন্য জামা কাপড়, জিনিষপত্র নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে শহরের আজব খাবারও কিছু কিছু। মুগের পাঁপর, শন-পাপড়ি আর গ্র্যাণ্ড হোটেলের কেক-বিস্কুট তো নিতেই হবে। বড়বাবু সেদিন একখানা কেক দিয়েছিলেন, কি চমৎকার খাবার! ময়না ধরতেই পারবে না, কি দিয়ে তৈরী। সুন্দর খোশবু আর সুস্বাদু। ওর খানকয়েক নিতেই হবে। এক বছর শহরে কাজ হলো, খালি পায়েই বা যাবো কেন? আপিসের চাপরাশটা একদিন পরে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো না, কত বড়ো আপিসে কাজ করছি! আমাদের গাঁয়ের কে পরেছে এমন জমকালো পোষাক! জুতো এক জোড়া নতুনই কিনতে হবে। বড়বাবু তো বলেছিলেন দেবেন, হয়তো ভুলে গেছেন। তাক বুঝে মনে করিয়ে দিলেই হলো। না, জুতো আর গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনতে হবে না। মুফতই পাওয়া যাবে।··নতুন একটা পেটরা কিনে ছ'মাস আগে থেকেই এক এক করে সবকিছু গুছিয়ে চলে নিশি। ময়নার জন্য কাঁচের চুড়ি, সুবাসিনী তরল আলতা, সিঁদুর, হিমানী কিছুই বাদ যায়নি। পার্বতীর জন্যও এসবের আর এক প্রস্ত। শুধু হিমানী কিনেছে এক কৌটো। ওটা আর খোলাখুলি বার করা যাবে না। বৌদিদি তো মাখবেনই না, উল্টো লোক হাসাবেন। তার চেয়ে চুপি চুপি ময়নার গালে মাখিয়ে দেবো, সেই ভাল। হিমানী পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশী হবে ময়না। সাজ-গোজে তো ওর খুবই সখ।···

গত পরশু একবছর পূর্ণ হয়েছে। বড়বাবুর কাছে মৌখিক ছুটি নেওয়া হয়ে গেছে। ক্যাশিয়ারবাবুকে ডেকে ছুটির মাসের মাইনে আগাম দেবার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন উনি। জুতো এক জোড়াও না চাইতেই পাওয়া গেছে। নিশির আনন্দ ধরে না। পায়ে দিয়ে দু'দিন ছাদের ওপর হেঁটে দেখেছে। কাজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া চপ্পল দিয়েছিলেন বড়বাবু। কিন্তু সে তেমন পছন্দসই নয়। পায়ে দিতে ইচ্ছেই হতো না। কেমন যেন বুড়ুটে ধরনের। এবার বেশ রুচি-মাফিক জুতো পাওয়া গেছে। কি সুন্দর কাবুলি স্যাণ্ডাল জোড়া! রঙের জৌলুসই বা কি! ভাল করে তাকালে মুখ পর্যন্ত দেখা যায়।···অতি সাবধানে জুতো জোড়া পায়ে দেয় নিশি। একটু ধুলোবালি লাগলে মাথা থেকে তেল নিয়ে ঘষে ফেলে। কেউ না দেখলে সরাসরি মাথার

ওপরেই ঘষে নেয়। দোষের মধ্যে পায়ে একটু লাগে। ও কিছু নয়, ক'দিন পরলেই সেরে যাবে। দোকানী তো কিনবার সময়েই বলে দিয়েছে। এ রকম জুতো চরকুটনগরের কেউ কোনদিন চোখেও দেখেনি। টুকিটাকি জিনিষ অনেকই হয়েছে। কিন্তু জুতো জোড়াই নিশির সবচেয়ে পছন্দ। না, রাস্তাঘাটের জলকাদায় পায়ে দিয়ে নষ্ট করা চলবে না। যেমন জৌলুস আছে ঠিক তেমনটিই থাকা চাই। চাপরাশ আর জুতো একসঙ্গে পরে দেশের লোককে তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এখন যাবার দিন অনুপম ক্ষৌরশালা থেকে চুলটা কাটিয়ে নিলেই হলো। কাউকে আর দেখতে হবে না। অন্য পর দুরের কথা, ময়নাই দেখে দেখে অবাক হয়ে যাবে।···ছুটির দরখাস্তখানা দত্তবাবুকে দিয়ে লেখিয়ে টুলের ওপর বসে স্বপ্ন জাল বুনতে থাকে নিশি। এখন বেলা ছুটো, বড়বাবু ব্যস্ত আছেন। আর একটু পরে ভিড় কমলেই দরখাস্তখানা পেশ করবে। ছুটি তো হয়েই আছে, শুধু নিয়মরক্ষা। কাল আর আপিস করা হবে না। যাবার আগে একবার মা কালীর ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে। কাল ভোরে উঠে প্রথমেই যেতে হবে সেলুনে। তারপর স্নান করে সোজা মায়ের বাড়ি। সেখান থেকে ফিরে খেয়ে-দেয়ে এক ঘুম। ঘুম থেকে উঠে বাঁধা-ছাদা করে সন্ধ্যা লাগতেই আবার রাত্রের খাওয়া খেয়ে রওনা হওয়া। বাবুদের সকলের সঙ্গে আজই দেখা-সাক্ষাৎ সেরে রাখতে হবে। কাল আর সময় হবে না। কেনাকাটার আর কিছু বাকী থাকলো কিনা মনে মনে সে হিসেবই করছিল নিশি, এমন সময় ওর নামে জরুরী এক 'তার' আসে। 'তার'! শুনে তো বুক শুকিয়ে ওঠে নিশির। কি সংবাদ আছে! তাড়াতাড়ি সই করে নিয়ে দত্তবাবুর হাতে দেয়। দত্তবাবু পড়তে থাকেন :

"অয়ার রুপিস্ ফিফটি, লেটার ফলোস্"······

অশ্বিনী

স্বপ্ন দেখছিল নিশি—মুষড়ে পড়ে।

সংবাদটা হরিহরের কানেও পৌঁছোয়। এক মাসের টাকা অগ্রিম নিয়ে বেতন বাবদ ষাট টাকা পেয়েছে নিশি। মামার পরামর্শ মতো টেলিগ্রাম মনি-অর্ডার করে পঞ্চাশ টাকাই পাঠিয়ে দেয়। টেলিগ্রাম আর মনি-অর্ডার খরচা বাবদ আরো চার টাকা খরচ হয়ে যায়। হাতে থাকে মাত্র ছ'টাকা। দীর্ঘ দিনের জমানো পঞ্চাশ টাকা টুকিটাকি জিনিষের পেছনে অনেক আগেই খরচ হয়ে গেছে। ছ'টাকায় যে গাড়ি ভাড়ার খরচাও কুলোবে না। তা ছাড়া

দাদার চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত রওনাই বা হবে কেমন করে!...দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে নিশির। বাবুরা জল চাইলে কালির বোতল নিয়ে হাজির হয়। বড়বাবু কলিং বেল টিপে টিপে ক্ষেপে ওঠেন। সময়মতো হাজির না হওয়ায় এক টাকা জরিমানা করেন উনি। চাকরি জীবনে এই ওর প্রথম অপরাধ।

আপিস কখন ছুটি হয়ে গেছে ভ্রূক্ষেপ নেই। হরিহরের তাড়ায় কোন রকমে হাতের কাজ শেষ করে ওপরে উঠে আসে। চাপরাশ খুলে রেখে হাতে মুখে জল দিয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে পড়ে। ভাবতে ভাবতে লালদীঘির সবুজ ঘাসের ওপরে এসে বসে। সমস্ত দীঘিটাই যেন পাঁইপাঁই করে ঘুরছে ওর চোখের ওপর। দাদা "তার" করেছেন, নিশ্চয় খুব বিপদ! ময়নার কোন অসুখ করেনি তো? বৌদিও তো অনেক দিন থেকে ভুগছেন! কে জানে, কি ঘটেছে! আর কিছু খরচ করে যদি টেলিগ্রামেই মোটামুটি খবরটা জানিয়ে দিতেন দাদা।...মনের উত্তাপে কোথাও ভাল লাগে না নিশির। দুশ্চিন্তা মাথায় করে আবার বাসায়ই ফিরে আসে। হরিহর কিষেনচাঁদ বাবুর দারোয়ান চোবেজীর মজলিসে গেছে! ফাগুয়া শুরু হয়েছে, এ ক'দিন ওখানেই আসর বসবে। ঘরে আলো না জ্বেলে বালিশে মাথা গুঁজে চুপচাপ পড়ে থাকে নিশি। দু'দিন দু'রাত্রি চোখে ঘুম নেই। তৃতীয় দিনের দিন বিকেলের ডাকে আসে অশ্বিনীর চিঠি। বেশ বড় বড় হরপে লেখা:

চরকুটনগর

১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

কল্যাণবরেষু

ভাই নিশি, সংসারের ঠেকায় দুই তিন কিস্তিতে রসিক ঘোষের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা কর্জ করিয়াছিলাম। সুদে আসলে উহা নাকি মোট একশত টাকা হইয়াছিল। ঘোষ মহাশয় মুখে আমাকে বিশেষ কিছু না বলিয়া তলায় তলায় এক তরফা ডিক্রি করিয়া বাড়ি ঘর ক্রোক করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক খোসামোদের পর হাতে পায়ে ধরিয়া খরচ বাবদ নগদ পনর টাকা দেওয়ায় এক মাসের সময় পাইয়াছি। পঞ্চাশ টাকা সাত দিনের মধ্যেই দিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া তাই তোমাকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। হাতে একটিও পয়সা নাই। সামনের হাটে চাউল কিনিতে হইবে। বিশেষ আর

কি। ভগবৎ কৃপায় সকলেই আমরা শারীরিক কুশলে আছি। মামাকে প্রণাম জানাইও ও তুমি আমার স্নেহাশীষ নিয়ো। ইতি—

আশীর্বাদক

শ্রীঅশ্বিনীকুমার মণ্ডল বৈরাগী

চিঠি পড়তে পড়তে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে নিশির। পঞ্চাশ টাকা পাঠাতেই তো এক মাসের বেতন আগাম নেওয়া হয়ে গেছে। বাকী পঞ্চাশ টাকা কোত্থেকে আসবে? তা ছাড়া এক্ষুনি আরো দশ পাঁচ টাকা না পাঠালে সকলে মিলে উপোস করে মরবে। হায় কপাল, ঋণের পাপ কি আর জন্মেও ঘাড় থেকে নামবে না!···ছুটি নেবার আর গরজ থাকে না নিশির। দত্ত বাবুকে দিয়ে যে দরখাস্তখানা লিখিয়ে রেখেছিল, কুচিকুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে তা উড়িয়ে দেয়। হাওয়ায় বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে চলে কুচিগুলো। দেখে দেখে দু'চোখ জলে ভরে ওঠে নিশির। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আপিস আজ ছুটি। নয়তো এক্ষুনি ও ছুটতো বড়বাবুর হাত-পা জড়িয়ে ধরতে। ছুটির মাস কাজ করলে আর এক মাসের মাইনে যদি বেশী দেন ওকে উনি।···মনের স্বপ্ন দিয়ে ছ'মাস ধরে যে জিনিষগুলো কনেছিল, এক এক করে তার সবগুলোই পেটরা খুলে বার করতে থাকে। এগুলো বেচেও যদি নগদ কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কে আর কিনছে গুচ্ছের টুকিটাকি জিনিষ। খুব চেষ্টা করলে হয়তো দু'পাঁচ টাকা পাওয়া যায়। দোকানীরা তো শাঁকের করাত। যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে। তাতে আবার বেশীর ভাগ জিনিষই ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা। হয়তো মাটির দরেও কেউ নিতে চাইবে না।··হতাশায় সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে নিশির।

হরিহর আজো চোবেজীর মজলিসে গিয়েই জমেছে। হয়তো রাত্রে আর ফিরবেই না। হোলি উৎসব—সারা রাতই গান-বাজনা চলার কথা। খানা-পিনাও ওখানেই করবে। নিশি একা বাসায়। ছোট ছোট দুটি কুঠরি। একটাতে রান্না খাওয়া হয় আর একটাতে মামা ভাগনে শোয়। জল কলও ওপরেই আছে। ছাদের আলসেতে দাঁড়ালে সুন্দর গঙ্গা দেখা যায়। ঘরের ভেতরে আর ভাল লাগে না নিশির। মনের আবেগে বাইরে এসে দাঁড়ায়। আলসেতে ভর করে সোজা গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে হিল্লোলিত গঙ্গা। দু'ধারের কল-কারখানাগুলো সবই আজ বন্ধ। হোলির ছুটি ভোগ করছে

মজুররা। এতক্ষণ হয়তো সকলেই হোলি উৎসবে মেতেছে। নিশির বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে পড়ে সেদিনের সেই হোলির কথা। নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের। ময়না আর ওকে নিয়ে চরের বন্ধু-বান্ধবরা মাতোয়ারা। আবীর কুমকুমে সারা গা লালে লাল। সকাল থেকে সন্ধ্যা একটানা খুশীর হাওয়া। রাতে আকাশে চাঁদ ওঠে—পূর্ণিমার চাঁদ। চরজুড়ে রূপোলী জ্যোৎস্নার ঝলমলানি। মলয় হিল্লোলে কেঁপে কেঁপে উঠছে ঘন কাশ বন। একক ঘরে শুধু ময়না আর ও…ভাবতে ভাবতে অজ্ঞাতেই দু'চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে নিশির।

মাথার ওপরে এসে পড়ে চাঁদ! চোখ পুঁছে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে নিশি আকাশের দিকে—চাঁদের চোখে চোখ রেখে! ওকি, ওখানে ও বুড়ি বটের ছায়ায় কে দাঁড়িয়ে! কে! আমার ময়না না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ময়নাই তো? এমন ডাগরটি হয়েছো তুমি বউ!…নিশি আর দাঁড়াতে পারে না। ঝাঁ করে ঘরে এসে পেটরা খুলে বাঁশিটা বার করে। আবার ফিরে আসে খোলা ছাদের এক পাশে। চেয়ে থাকে চাঁদের দিকে মুখ তুলে। তারপর গভীর আবেগের সঙ্গে একটানা বাজাতে থাকে:

রাধে তোর তরে কদম তলে বসে থাকি।
পরান আমার কাঁদে রাধে বিপিনে একাকী॥